বাংলাদেশের সংবিধান
না সমাজতান্ত্রিক
না গণতান্ত্রিক
মাওয়ের চীন
আরো জঘন্য

শাহ্ আলম

প্রকাশনায়:
ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম
বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২
চাঁদপুর, বাংলাদেশ ।

ই-মেইল:
icwfreedom@gmail.com
icwfreedom@yahoo.com
ওয়েব সাইট:
www.icwfreedom.org

মোবা: ০১৬-৭৫২১৬৪৮৬,০১৭২-০০৮৫৮৫৩,
০১৭১-৭৮৯৫৮৫৭, এবং ০১৮১-৯০৭৬৩৫৭.

প্রকাশকাল:
এপ্রিল-২০১০।

মুদ্রণে-
দি চিত্রা প্রিন্টার্স
২০, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

১২০ টাকা ।

পুর্বাভাষ

সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় ৪ মুলনীতির অন্যতম নীতি গণ্যে প্রণীত হয়েছিল বাংলাদেশের সংবিধান। প্রণেতাদের সমর্থনে এখনো কেউ কেই বলেন এটি নাকি দুনিয়ার সেরা সংবিধান। কিন্তু আসলেই কি তাই? প্রকৃতই কি বাংলাদেশের সংবিধান উকৃষ্ট ও শ্রেষ্ট অথবা উৎকৃষ্ট না হোক অন্তত গণতান্ত্রিক , অথবা নিদেনপক্ষে সংবিধান হিসাবে গণ্য হওয়ার আদৌ যোগ্য? এটি কি মৌলিক না নকল? অথবা, জাল-জালিয়াতিসহ বৈরীতা ও অকার্যকরতার কেবলই এক কাগুজী দলিল বিশেষমাত্র। দাবী করা হয় সংবিধান প্রণীত হয়েছে সাম্যবাদ লাভে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে। কিন্তু সমাজতন্ত্র কি রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ? অথবা রাষ্ট্র কি সাম্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার নাকি রাষ্ট্রের বিলুপ্তিতেই সাম্যের সুচনা ?

পরলৌকিকতার ধ্যান-ধারণা হতে রাষ্ট্রকে মুক্ত করে ইহলৌকিতার নীতিতে আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে পুঁজিবাদ। তবে পুঁজিবাদের বিশ্ব দখলের পর বা সমগ্র দুনিয়াকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অবদ্ধ করে পুঁজিবাদের ছাঁচে জগতকে গড়ে তোলার পর আদৌ রাষ্ট্র আর স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকতে পেরেছে নাকি, রাষ্ট্রের চুড়ান্ত অবস্থা নিশ্চিত করে বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের বৈশ্বিক সমাজ তথা সমাজতন্ত্রের বস্তুগত ভিত্তি ক্রমাগত প্রসারিত করে কেবল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ-ক্ষুন্ন ও বিনিষ্টই করেনি বরং রাষ্ট্রের কার্যকরতাই অকার্যকর গণ্যে ও নিশ্চিতিতে রাষ্ট্রের অনাবশ্যকতা ও ক্ষতিকরতা নিশ্চিত করে ইহলৌকিকতার রাষ্ট্রকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই নেওয়ার যাবতীয় বিহীত করেছে ?

উল্লেখ্য,পুঁজিবাদের রক্ষক ও পাহারাদার রাষ্ট্র পুঁজিবাদ কর্তৃক অনুরূপ অন্তিম অবস্থায় উপনীত হওয়ার পরই পুঁজিবাদী সমাজের বিনাশ ও সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিষয়ক নীতিমালা বা সংবিধান অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ইস্তাহার রচিত হওয়াসহ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং তা কার্যকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথম আন্তর্জাতিক।

অত:পর, ১৮৪৮ সালে প্রণীত কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বা সমাজতন্ত্রের সংবিধান অমান্য বা অস্বীকার করে কেউ যেমন কমিউনিষ্ট হতে পারে না তেমন বিশ্ব দখলকারী বা বিশ্বে আধিপত্য ও প্রভুত্বকারী পুঁজিবাদের ভুয়া জাতীয় চরিত্র অন্বেষণ বা অবাস্তব হওয়া সত্ত্বে স্থানীয় বা জাতীয় পরিসরে পুঁজির বিকাশ সাধন বা পুঁজির ক্ষমতা-এখতিয়ার বিষয়ে ভুয়া ও ভ্রান্ত এবং বিকৃত বক্তব্য উপস্থাপন সহ তথাকথিত দেশপ্রেমিক বা পীড়িত বুর্জোয়াদের জাতীয় পুঁজি বিকাশের স্বার্থে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়ে তোলার আজগুবি বক্তব্য স্বার্থান্ধতা ও প্রতারণা ছাড়া উপস্থাপন করার সুযোগহীনতায়ও স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন বা পুঁজিবাদের দখলীকৃত বিশ্বে পুঁজিবাদী দখলী স্বত্ব বজায় ও বহাল রেখে বা বিশ্বে পুঁজিবাদী প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখে কেবলই দুনিয়ার যেকোন অংশ বিশেষে পুঁজিবাদেরই জঞ্জাল রাষ্ট্র বিশেষ স্থাপন করে অনুরূপ রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র হিসাবে জাহির করা রুশী কমিউনিস্টের আবরণে মরণাপন্ন পুঁজিবাদের সংরক্ষক ও মৃতবৎ রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষক লেনিনদের মতো ভন্ড কমিউনিষ্টদের ভন্ডামি হলেও সমাজতন্ত্রের জন্য অনুরূপ রাষ্ট্র প্রকৃতই এবং কার্যতই ভয়ানক ক্ষতিকর ও মারাত্মক প্রতিবন্ধক।

তৎসত্ত্বে, কাঁঠালের আমসত্বের মতোই বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গণ্যে ও তদমূলে দাবী করা হয় যে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়েছে জন ক্ষমতার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে। কিন্তু প্রণীত সংবিধান দ্বারা প্রজাতান্ত্রিক ক্ষমতার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক সংগঠন বা তদানুরূপ জনকর্তৃত্বের রাষ্ট্র ব্যবস্থা আদৌ প্রবর্তন করা হলো ? না কি যে, সাবেকী তথা মধ্যযুগীয় ও গোলামী আমলের শোষণ-পীড়ন ও নির্যাতনের নিমিত্তে সৃষ্ট ও স্থাপিত রাষ্ট্রিক কাঠামো ও ব্যবস্থার নগ্ন হামলা-আক্রমনের কবল হতে মুক্তি প্রত্যাশায় ১৯৭১ সালে "মুক্তিযুদ্ধ" সংঘটিত হয়েছিল বিধায় মুক্তি যুদ্ধের শত্রু সেই গোলামি আমলের গণপীড়নকারী পুরানো রাষ্ট্রিক কাঠামোই বহাল ও বলবত করা হলো?

অথবা সেক্যিলারিজম বা ইহলৌকিকতা সহ সাংবিধানিক রাষ্ট্রিক মুলনীতি কার্যকরণে সংবিধানের নির্দেশনা মতো প্রচলিত-সাবেকী আইন তথা পার্থিব সার্বভৌমত্বের আদেশ নয় এমন অপার্থিব আইন অর্থাৎ মনু সংহিতা সহ বিভিন্ন অপার্থিব আইন বিশেষত উত্তরাধিকার ইত্যকার বিষয়ে পার্সোনাল ল' যা-কেবলমাত্র সেক্যিলারিজমের হেতুবাদেই অচল বা বাতিলযোগ্য আইন হিসাবে গণ্য বিধায় সেই সকল অচল বা বাতিলযোগ্য আইন-কানুন সমুহ রদ-রহিত ও বতিল বা তদমর্মে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণীত হয়েছে কি ? অথবা গণতান্ত্রিক বা স্বাধীন দেশের উপযোগী বিচার বিভাগ ও বিচারিক কার্যবিধি নতুনভাবে গঠিত ও প্রণীত হলো না কি পরাধীন আমলের অগণতান্ত্রিক - অসভ্য ও গোলামী প্রথা, রীতি-নীতি, এতিহ্য ও বিচারিক কার্যবিধিসহ সাবেক প্রভুদের প্রভুত্ব নিশ্চিতিতে প্রভুদের প্রতিষ্ঠিত মানবিক অমর্যাদার বিচার বিভাগ ইত্যাদি বহাল তবিয়্যতে বহাল রাখা হলো? অথবা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানুষকে অমর্যাদাকারী এবং সামাজিক অবিচারকারী যাবতীয় রাষ্ট্রিয় বিভাগ-বাহিনী বিশেষত গোলামি আমলের সেনা-পুলিশ ও আমলাতন্ত্র বিলীন ও বিলুপ্ত করা হলো না কেন?

তদপুরি, ভারতীয় সংবিধানের বেশকিছু অংশ হুবুহু নকলীকরণ ইত্যাদি দ্বারা প্রণীত আদি সংবিধান আদৌ কার্যকরী না কি, আদিমুলেই নানান জোড়াতালি দিয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের অকার্যকর সংবিধান দ্বারা গঠিত কার্যত ভংগুর পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাম-ঠিকুজি পাল্টিয়ে প্রকারান্তরে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মতোই একটি রাষ্ট্র পুন:প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে একটি সংবিধান প্রবর্তন হলো "স্বাধীন" বাংলাদেশে?

অত:পর, সাংবিধানিক ঘোষণা ও নির্দেশনা মতো বাংলাদেশে শ্রেণী বৈষম্যসহ সকল প্রকার বৈষম্য দুরীভূত ও বিলুপ্ত না হয়ে বিপরীতে ভেদ-বৈষম্য বৃদ্ধি পেল মারাত্মকভাবে তাও বা কেন? অথবা, তদ্রুপ অংগীকার করা সত্ত্বেও সাংবিধানিক নির্দেশনা মতো ব্যবধান না কমে গ্রাম-শহরের দুরত্ব বৃদ্ধি হলো কেন? অথবা বাংলাদেশের সংবিধানের নির্দেশনা ও রাষ্ট্রিক নীতি অনুযায়ী সকলেই একই মানের শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে এখনো বহু মানুষ নিরক্ষর রহাসহ গোলামী আমলের কেরানী-দালাল, জুচ্চোর-প্রতারক বানানোর শিক্ষা কার্যক্রমের সহিত নানান ধরণের অশিক্ষা ও কুশিক্ষার ভান্ডার হিসাবে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠলো কেন? সকলের শিক্ষা-চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব-কর্তব্য হলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সেরূপ বিহীত করছে না কেন ? সংবিধানমূলে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব মর্মে

জনগণের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণাদি নিশ্চিতকরণে পরিকল্পিত অর্থনীতি বাস্তবায়ন এবং তদমর্মে জাতীয়করণকৃত জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ না করে বিজাতীয়করণ-বেসরকারীকরণ করার প্রক্রিয়ায় ধ্বংস ও বিনিষ্টকরণ এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করা হলো কেন? "মুক্তিযুদ্ধে" নিহত-আহত ও তামাম ক্ষয়ক্ষতিসহ যাবতীয় বিষয়াদি শনাক্ত-চিহ্নিত ও নির্ণিত হলো না কেন? মুক্তিযুদ্ধারা উপযুক্ত মর্যাদা ও শত্রপক্ষ উপযুক্তে দন্ডে দন্ডিত হলো না কেন? সমাজের নিম্নতম একক বা ইউনিট পরিবার নয় ব্যক্তি গণ্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সকল বিষয় স্বাধীন জনমতামতের ভিত্তিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া তথা রাষ্ট্র কাঠামোর সকল স্তরে জনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অর্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হয়ে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো কেন? এককথায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অংগীকার- "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য - মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার" নিশ্চিত হলো না কেন? অথবা, বহু ক্ষেত্রে গোলামি আমলের তুলনায় অনেক বেশীমাত্রায় অসাম্য-অমর্যাদা, অনাচার ও অবিচার বৃদ্ধি পেল কেন ?

বাংলাদেশের জন্ম অংগীকার মুলে আদৌ সংবিধান প্রণীত ও তদমর্মে আইন-আদালত ইত্যাদি স্থিরীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলো নাকি, সাংবিধানিক হেতুবাদেই সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলোর পারস্পারিক অসামঞ্জস্যতা-বৈরীতা ও সাংঘর্ষিকতায় আইন-আদলতের ক্ষেত্রে জট-মহাজট বা মহাসংকট সৃষ্টি হয়ে কার্যত মুক্তিযুদ্ধের মুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন নিহত হল আতুড়ঘরেই ? অথবা বাংলাদেশের সংবিধান মূলেই ভিন্ন নামে কার্যত সাবেকী অর্থনীতিই প্রতিষ্ঠা করার হল এবং রাজনীতিও পুরানো বলেই পরবর্তীতে নানান অসাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে গণতন্ত্রের স্বপ্ন সম্বলিত বাংলাদেশের কপিনে শেষ পেরেক ঠুকে মুক্তিযুদ্ধের অংগীকার ও মুক্তিকামী মানুষের স্বপ্নকে কবরস্ত করা হলো?

অত:পর, সাম্য প্রত্যাশীতো বটেই উক্তরূপ প্রশ্নের জবাব নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের প্রত্যেকেই বিশেষত রাজনৈতিক কর্মীর এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধান না করার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হতে মুক্ত হওয়ার সুযোগ নাই।

অমন দায়বোধে অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বিষয়াদি অত্র নিবন্ধে বিবৃত হয়েছে । তবে, সাম্য প্রত্যাশী হয়েও কেবলই লেনিনবাদের চক্রান্তে রাষ্টনৈতিক স্বেচ্ছা কর্মী হিসাবে আমার অতীতের ভ্রান্ত কর্ম তৎপরতার সহিত এই পুস্তকে বর্ণিত বক্তব্য- বিষয়াবলীর মধ্যেকার বিরোধ- বৈরীতা ও অসামঞ্জস্যতায় সৃষ্ট বিরতিহীন যন্ত্রণা-বেদনায় নিত্যই আমার নিজের নিকট আমি নিজেই লজ্জিত-দু:খিত ও অনুতপ্ত।

কারণ- " মার্কসবাদী-লেনিনবাদী " রাজনীতিক ও রাজনৈতিক পন্ডিত ব্যক্তিগণের সাহিত্যের সহিত পরিচিত হয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় লেনিনীয় বিপ্লব সাধন ও তদনিমিত্তে লেনিনীয় বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য -উদ্দেশ্য গণ্যে মস্কো বিরোধী চীনপন্থি খ্যাত একটি গোপন "কমিউনিষ্ট পার্টিতে" যোগদান করি ছাত্র জীবনে। কিন্তু লেনিনবাদের বৈশিষ্ট ধন্য পার্টির পদ-পদবী সমেত ব্যক্তিগত

ক্ষমতা-আধিপত্য ও কর্তৃত্বলোভী চরিত্রের হেতুবাদে বাংলাদেশের ষ্ট্যালিন-মাওপন্থীদের স্বভাবজাত নোংরামির ফসল- কমিউনিষ্ট পার্টি নামীয় সংগঠনের বহুধা ভাগ-বিভক্তির ফলশ্রুতিতে নেতৃত্বের আকালের হেতুবাদে অপরিণত বয়সেই জাতিয় রাজনীতির কেন্দ্রীয় স্তরে অবতীর্ণ হয়েছি বলেই ১৯৮৪ সালে বংগভবনে অনুষ্ঠিত জাতিয় সংলাপে ১৫ দলীয় জোটের প্রতিনিধি হিসাবে অংশ গ্রহণ করি। এবং ১৫ দলীয় জোটের প্রথমে ১১দফা , পরবর্তীতে ৮ ও ৫ দলের ৫ দফা এবং ৭ দফা ভিত্তিক ৭ দলীয় জোটের সমন্বয়ে গঠিত ১৯৯০ সালে ৩ জোটের কেন্দ্রীয় লিঁয়াজো কমিটি কর্তৃক প্রণীত "৩ জোটের রূপরেখা" প্রণয়নে সক্রিয়ভাবে অংশ করি।

উল্লেখিত সবক'টি দাবীনামায় - অবৈধ সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও চতুর্থ সংশোধনীর পুর্ব পর্যন্ত -১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল করার বিষয়টি ১ নম্বর দাবী হিসাবে চিহ্নিত ছিল। আমাদের উত্থাপিত দাবীনামার প্রতি বাংলাদেশের শ্রমজীবীরাসহ মুক্তিকামী মানুষজনও আস্থা-বিশ্বাস স্থাপন করে হরতাল-অবরোধ , সভা-মিছিল করে সামরিক শাসন ভংগ করার দায়ে- কারো কারো জীবন বলি হয়েছে ,বহুজন বহুভাবে নির্যাতিত হয়েছে এবং নানানজন নানান দন্ডে দন্ডিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহুজন।

অথচ, পুঁজিবাদের চরিত্রদোষে দুষ্ট -দুর্বৃত্ত অধিপতি শ্রেণীর স্বার্থে দাবীনামাতো নয়ই এমনকি বিচারপতির ক্ষমতা-এখতিয়ার বা রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিষয়ে ১৯৭২ সালের বা ৪র্থ সংশোধনীর পুর্ব সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ইত্যাদির সামান্যতম তোয়াক্কা না করে ৩ জোটের মুল মুল খেলোয়াড়দের অপ্রকাশ্য সমঝোতা অনুযায়ী - সামরিক শাসনের ধারাবাহিকতায় সামরিক শাসনের কর্তৃত্ব বলেই নিয়োগকৃত প্রধান বিচারপতিকে সামরিক শাসকের অধীনে প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ ও তৎপরবর্তীতে অবৈধ সামরিক শাসনের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের মাধ্যমে শূন্য পদে উক্ত উপরাষ্ট্রপতিরই রাষ্টপতির দায়িত্বভার গ্রহণ অর্থাৎ সামরিক শাসনের সুবিধাভোগী স্বয়ং প্রধান বিচারপতি কর্তৃক অবিচারিকভাবে নির্বাহী বিভাগের প্রধান নির্বাহী তথা রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাহী দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন করার মাধ্যমে ইতো:মধ্যকার সামরিক শাসনের ধারাবাহিকতা যেমন রক্ষা করেছেন তেমন প্রধান বিচারপতির পদ হতে পদত্যাগ না করেই অনুরূপ নির্বাহী দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যেমন বিচার বিভাগের বিচারিক কর্মের সহিত নির্বাহী বিভাগের নির্বাহী কর্মের তফাৎ ঘুচিয়ে ফেলে নির্বাহী ও বিচার বিভাগের স্ব স্ব বিভাগীয় বা আলাদা আলাদা সত্ত্বাকে বিলীন করতে সহায়তা করেছেন তেমন অসাংবিধানিক বা সংবিধান বিরোধী সামরিক আইনকে ব্যবহারিক বৈধতা ও কার্যকরতা প্রদান করে তারই ধারাবাহিকতায় উক্ত অসাংবিধানিক রাষ্ট্রপতির অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন এবং সংবিধান বা সামরিক আইন বর্হিভূত উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনোত্তর আবারো প্রধান বিচারপতি হিসাবে সুপ্রিম কোর্টে ফেরৎ যাওয়ার জন্য উল্লেখিত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বকে প্রকারান্তরে বিচারিক কর্ম স্বীকৃতিতে- কার্যত সামরিক আইনের ধারাবাহিকতার ফসল -জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১১ তম সংশোধনীর মাধ্যমে ইতো:পূর্বে দাবীকৃত অবৈধ সামরিক শাসনের বৈধতা প্রদান করায় পুর্বতম ৫ম হতে সমসাময়িক

১০ম সংশোধনী পর্যন্ত সবক'টি সংশোধনী বহাল , অটুট ও অক্ষুন্ন রাখায় উপরন্ত সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের দাবীমতো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত ৪র্থ সংশোধনী পূর্ব -১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহাল না করে বরং অবৈধ সামরিক শাসনকে বৈধতা প্রদানই কেবল নয় বরং ৩ জোটের ঘোষণা অনুযায়ী অবৈধ সামরিক শসনের সকল অবৈধ ফরমান, হুকুম-নির্দেশ ইত্যকার জঞ্জালগুলোকে যথারীতি অপসারণ বা রদ-রহিত ও বাতিল করা নয় বরঞ্চ উল্লেখিত বিধানাবলী ও হুকুম-নির্দেশাদিকে সংবিধানের অংশ হিসাবে গণ্য ও স্বীকৃতিতে- এমনকি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও যে সকল আইন-বিধি বা নির্বাহী বিভাগের হুকুম-নির্দেশ সংবিধানের অংশ ও অংগ হওয়ার যেমন সুযোগ নাই তেমন সংবিধান সুপ্রিম আইন হওয়ার কারণেই সংবিধানের নির্দেশনা ইত্যাদি আইন হলেও এবং দেশের অপরাপর সকল আইন সংবিধানের কর্তৃত্বাধীনে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার শর্তেই সংবিধানের সহিত সাংঘর্ষিক ও সামঞ্জস্যহীন আইন অচল ও বাতিল গণ্য বিধায় নিবাহী বিভাগের হুকুম-নির্দেশতো নয়ই এমনকি সংসদ কর্তৃক প্রণীত সকল আইন কোনক্রমেই সাংবিধানিক আইন নয় বিধায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শত্রু এবং অসাংবিধানিক বা সংবিধান বিরোধী বা সংবিধান স্থগিতের নামে সংবিধান অকার্যকর ও অমান্য ও অচলকারী সামরিক শাসনের স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্বের সকল হুকুম-নির্দেশ ও ফরমান সহ সকল কার্যাবলীর বৈধতা প্রদান ও উপরোক্ত সকল হুকুম-নির্দেশ বা বিধি বিধানকে সংবিধানের তফসিলভুক্ত করণের মাধ্যমে সামরিক আইন ও শাসনকে কেবল বৈধতা প্রদানই নয় উপরন্ত সাংবিধানিক আইন হিসাবে গণ্য করায় কার্যত বাংলাদেশের সংবিধানকে পূর্বপার এক সাংঘর্ষিক-সামঞ্জস্যহীন বিধি-বিধান বা অনুরূপ স্ববিরোধীতা ও সাংঘর্ষিকতায় পূর্বাপার অনুচ্ছেদ সমূহের পরস্পরকে অচল ও বাতিল বা অকার্যকর করার ফরমান-অনুচ্ছেদ ও বিধানাবলী দ্বারা কার্যত বাংলাদেশের সংবিধানকে অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন এবং অকার্যকর জগাখিচুড়ির কাগুজে বস্তুতে পরিণত করার মাধ্যমে আইনের দৃষ্টিতেও বাংলাদেশকে এক আজগুবি রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে আলোচ্য সংবিধানমূলে একটি কার্যকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ব্যর্থতাকেই যেমন নিশ্চিত করেছে তেমন মরণাপন্ন পুঁজিবাদের আওতায় মৃতবৎ রাষ্ট্রের অন্তিম দশার অন্তিমতাও প্রতিপন্ন করেছে; উপরন্ত ৩ জোটের দাবীনামার প্রতি আস্থাশীল ও সমর্থনকারী এবং তদার্থে সরল বিশ্বাসের আন্দোলনকারী সমেত বাংলাদেশের জনগণের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে হেতু তথাকথিত গণতন্ত্র বা ৪র্থ সংশোধনী পূর্ব ১৯৭২ সালের সংবিধান যেমন পুনর্বহাল করা হয়নি তেমন ইতিহাসের অমোঘ রায়- রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র রক্ষায় অক্ষম-অযোগ্য বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্র ও ধর্মমতোই উল্লেখিত দাবীনামা ও আন্দোলনের মাধ্যমে সম্পাদিত রাজনৈতিক দল ও জনগণের মধ্যেকার চুক্তি যথারীতি অবলীলায় ভংগ করা হয়েছে।

অত:পর, সুবিধাভোগী না হলেও, উল্লেখিত চুক্তি ভংগের দায় হতে আমি মুক্ত নই।উপরন্ত, জানা-বুঝাটা অতি আবশ্যক হলেও পূর্ণাংগভাবে না জেনে ১৯৭২ সালের সংবিধান পুনর্বহালের দাবীতে প্রণীত দাবীনামার ভিত্তিতে আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত করার জন্য দেশব্যাপী সভা-সমাবেশে বক্তৃতা করাসহ দাবীনামা প্রণেতাদের এক জন হিসাবে আরো যা যা করণীয় ছিল তা তা-ই করেছিলাম।অথবা, সমাজতন্ত্রের দাবীদার রাশিয়া-চীন ইত্যাদির সংবিধানসহ বাংলাদেশের সংবিধান পরিপূর্ণভাবে না জেনেই বর্ণিত কার্যাদি করেছিলাম ,তাওতো কম দোষণীয় নয়। কেবলই রাজনৈতিক সাহিত্য বা

পার্টি বিশেষের বিবৃতি-বিবরণী পড়েছিলাম, কিন্তু সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নে তথা প্রতিটি মানুষের সার্বজনীন মুক্তি নিশ্চিতকরণে -খোদ রাষ্ট্রসহ রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাবলীর বিলোপ-বিনাশ সুনিশ্চিতকরণের নিমিত্তে মৌলিক ব্যবস্থাপত্র মর্মে ঐ সকল সংবিধান এবং কথিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রচলিত আইন-কানুন বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান বা উপযুক্ত খোঁজ খবর নেওয়ার উপযুক্ত তাগিদ বোধ না করা বৈ কেবলই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নামে বিমোহিত হয়েছিলাম। যদিচ, মার্কস কর্তৃক স্বীকৃত বক্তব্য -'অর্থনীতি ভিত্তিভূমি , আইন ও রাজনীতি উপরিকাঠামো' বলেই রাজনৈতিক সাহিত্যের সহিত আইন অধ্যায়ন অতীব প্রয়োজনীয় হলেও এমনকি রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি প্রয়োগে আইন ও সংবিধানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠ বৈ তদমর্মে খুব বেশী অনুসন্ধান বিশেষত বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন কানুন পড়িনি।

উল্লেখ্য- ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বিট্রিশের কুইন ইলিজাবেথ-২, ছিল পাকিস্তানেরও কুইন। ফলে, কলোনিয়াল কুইনের কোর্টসহ পরাধীন আমলের যাবতীয় আইন-বিধি, প্রথা ইত্যাদি সমেত রাষ্ট্রিক কাঠামো প্রায় অটুট ও অক্ষুন্ন থাকল পাকিস্তানে। কেবলমাত্র ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল জিন্নাহ প্রমুখ। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের অকার্যকর সংবিধান বা সেনাতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের ফরমায়েশে প্রণীত ১৯৬২ সালের সংবিধান মুলে পাকিস্তান "ইসলামিক প্রজাতন্ত্র" ঘোষিত হলেও সাবেকী সকল বিভাগ-অর্গাণসহ কার্যত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার সকল রাষ্টিক বিধি-বিধান জারী ও বহাল ছিল পাকিস্তানে। "গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ" ঘোষণা পুর্বক "ধর্মনিরপেক্ষতা" "গণতন্ত্র" এবং মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ করা হতে মুক্তকরণে মুজিবীয় "সমাজতন্ত্র" রাষ্ট্রিক নীতি হিসাবে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১,৭, ৮,১০,১২ ও ১৩-এ বিবৃত করা হয়েছে। অত:পর, উল্লেখিত নীতিমালার সহিত সাংঘর্ষিক সকল আইন বিবি-বিধান বাতিল মর্মে অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৬ দ্বারা নিশ্চিত করা হল।

কিন্তু, অনুচ্ছেদ-৪৮ হতে পরবর্তী অনুচ্ছেদ সমুহ দ্বারা ব্রিটিশ কিংস কোর্টসহ প্রায় সকল রাষ্ট্রিক অর্গান এমনকি ১৬ ডিসেম্বর-১৯৭১ সাল পর্যন্ত দখলদার খুনি পাকিস্তানীদের যাবতীয় দুস্কর্মের সহায়তাকারী ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি , প্রাদেশিক সরকারের সচিবসহ পুলিশ কর্তা বা

পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত কর্মকর্তগণ প্রায় সকলেই বিনা বিচারে ও বিনা অনুতাপে স্বপদে স্ব-স্ব বিভাগীয় বিধি-বিধানসমেত ও তদানুরূপ সুযোগ-সুবিধাসহ বহাল ছিল এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ১ম ও ৪র্থ তফসিল দ্বারা সাবেকী কতিপয় বিষয় ব্যতীত প্রায় সকল আইন-কানুন সমেত বিট্রিশ কুইনস কোর্টসহ কলোনিয়াল রাষ্ট্রিক কাঠামো পুনর্বহাল করার হেতুবাদে "সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ" এর অংগীকার বা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রসহ রাষ্ট্রিক নীতিমালা অস্বীকৃত ও অকার্যকর হল বলেই আতুঁড়ঘরেই মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের মৃত্যু হল। এবং কার্যত কতিপয় বিষয় রদবদল করা সহ গুটিকতেক সুন্দর নীতিমালা বর্ণিত হলেও প্রকৃতপক্ষে পরলৌকিকতার ধ্বজাধারী অথচ ইহজাগতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত তবে ইতিহাসের বিধান মতোই অকার্যকর পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক কাঠামোর যাবতীয় অংগ-পতংগ বা সরকারী বিভাগ ইত্যকার প্রতিষ্ঠান-দপ্তর ইত্যাদি অটুট-অক্ষুন্ন রাখার যাবতীয় বিহীতাদি সম্পাদন করা হয়েছে হেতু এটি মূলত পাকিস্তান ও ভারত এই উভয় রাষ্ট্রের সংবিধান এর জগাখিছুড়ি সমেত বাংলাদেশী সংস্করণ হিসাবে প্রতিস্থাপিত হল।

ফলে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধকারী এবং পাকিস্তানী দখলদারদের সহযোগীরা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করাসহ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অধিকার ও সুযোগ পেল। রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত অনুরূপ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের অংশ হিসাবে পরবর্তীতে সংবিধানের অনেকগুলো সংশোধনী এ যাবৎ গৃহীত হলো অসাংবিধানিকভাবে। বিশেষত, পাকিস্তানী সংবিধানের অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা দুরীকরণে ৫ম সংশোধনী দ্বারা "ধর্মনিরপেক্ষতা"-কে বিলোপ ও " সমাজতন্ত্র"-কে নির্বাসন-বর্জন ও খারিজ করার মাধ্যমে পাকিস্তানী সমেত সাবেকী ও গোলামি আমলকে পুর্ণাংগরূপে পুনর্বহাল করা হল।

বলে রাখা প্রয়োজন, যে কোন বস্তু-বিষয় গঠিত হওয়ার সূত্র এবং পরিচালন বিধানাবলীকে সংবিধান বলা যায়। সংবিধান -লিখিত না অলিখিত, সেটি খুব একটা ধর্তব্য বিষয় নয়। এইছ -২. ও. সমান পানি, এটি পানির সূত্র বা সংবিধান। কেউ এটি জানুক বা না জানুক বা যবে বা যখন বিজ্ঞানীগণ এ সূত্র আবিস্কার করতে পারেনি তখনও কিন্তু অন্যকোন ফর্মূলায় পানি গঠিত হয়নি এবং এর রকমফের হলে বা যতকিঞ্চিত পরিবর্তন হলে সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে তখনো এবং এখনো এবং কখনো পানি নয় , উৎপাদিত হয় বা হবে অন্য কিছু, বাস্প-বরফ ইত্যাদি বা আরো অন্য কিছু ,

এটিও সংবিধান। প্রাণের ক্ষেত্রেও তাই। এ্যাক্স + এ্যাক্স অথবা এ্যাক্স+ ওয়াই ক্রোমোজম মিলিত হলে – যৌগের ভিন্নতা অুনয়ায়ী ভিন্ন ধরণের অংগ বিশিষ্ট প্রাণী জন্মগ্রহণ করে। এটিও সংবিধান। বস্তুর সর্ব নিম্ন একক এটম বহন করে বা গঠিত বটে ইলেক্ট্রোন ও প্রোটন দ্বারা বলেই এটমের অভ্যান্ত রিক সম্পর্ক হচ্ছে দ্বন্দ্বমুলক অর্থাৎ বৈপরীত্যের ঐক্যই হচ্ছে বস্তু হেতু বস্তুর দ্বন্দ্বের হেতুবাদে বস্তু গতিশীল, পরিবর্তনশীল ও পরস্পর সম্পর্কিত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলেই ইলেক্ট্রোমেগনেটিকিজমের সম্পর্কাধীন তাবৎ বস্তুনিচয়ের সমষ্টি – ধরত্রি, চন্দ্র, সূর্য ও সূর্যের অন্যান্য গ্রহ–উপগ্রহ সমেত গঠিত সৌরজগত এবং অগুণতি নক্ষত্রপুঞ্জের সমষ্টি মহাবিশ্ব বা প্রকৃতিও অনুরূপ সম্পর্কের অধীন হেতু নক্ষত্র–গ্রহ–উপগ্রহকুলের পারস্পারিক সুসম্পর্ক বা সমন্বয়পূর্ণ আচরণ প্রকৃতির ভারসাম্যতার মৌলিক শর্ত । প্রকৃতিতে সমন্বয়হীনতা বা সুসম্পর্কের ব্যত্যয় ঘটলে–ঘটালে প্রলয় বা মহাপ্রলয় অনিবার্য, হতে পারে তা–সুনামী বা আরো কত কি। এটিও সংবিধান ।

সুতরাং–প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত জীবকুল সমেত পরিবেশ–প্রতিবেশ সকল কিছুই এইরূপ সংবিধানের অধীন। প্রকৃতির উপাচার মানুষের নানান কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদির জন্য গঠিত নানানমুখী সংগঠন যথা পরিবার–রাষ্ট্র ও পেশাজীবী সংগঠন সমেত সমাজ বিশেষ, এবং সকল ধরণের সংগঠন অনুরূপ সংবিধানমূলে গঠিত। যুগপৎ অসভ্যতা ও সভ্যতার যুগপৎ বিরোধ ও উন্নয়ন তথা উৎপাদন উপকরণ–শক্তির ক্রমোন্নয়নে পুরানো উৎপাদন সম্পর্কের সহিত নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণ ও শক্তির বৈরীতা হেতু বস্তুতান্ত্রিক নিয়মে মানুষের সমাজ–সংগঠন এর ধরন–প্রকৃতি ও কাঠামোবিন্যাস ইত্যাদির পরিবর্তন হয়ে নতুন ধরনের উৎপাদন শক্তির অনুকুলে ও আরো উন্নততর বিকাশের উপযোগী উৎপাদন সম্পর্ক তথা নতুন ধরনের সামাজিক–রাষ্ট্রিক সংগঠন গঠিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিক নিয়মেই পুরনোটি বিলীন ও বিলুপ্ত হবে, এটিও সংবিধান।

মাটির ঘর বা গ্রাম্যকুঠির হতে মহাকাশযান বা মহাকাশ ষ্টেশন নির্মাণ ও সংরক্ষণেও সংবিধান অপরিহার্য্য। বস্তুবিশেষের ভিন্নতা ও প্রকৃতি সুস্পষ্টকরণে ঐসবের কাঠামো বিন্যাসপত্র বা সংবিধানের নামাকরণ ভিন্ন ভিন্ন হয় যেমন, বিল্ডিং –কন্সট্রাকশন ইত্যাদির ডিজাইন, পিসি–টিভি ইত্যাদির ক্যাটালগ, কোম্পানী ইত্যাদির এগ্রিমেন্ট বা এম. ও.ইউ। আগুন–

পানি ও লোহা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সংবিধানহীনতা নাই এবং কোন বস্তুর সংবিধান বা কাঠামো বিন্যাস লংঘিত-বিঘ্নিত হওয়ার অবকাশ নাই। যদি, হয় তবে পুরানো বস্তুটি আর অটুট-অক্ষুন্ন বা অপরিবর্তিত থাকে না, এটিও সংবিধান।

কাজেই, বৈজ্ঞানিক উপকরণাদিতে একটি যোগ(+) বা বিয়োগ(−) চিহ্ন রদ-বদল হলে যন্ত্রটি বিকল-ধ্বংস ও অকেজো হতে পারে। সুতরাং, সংবিধান - সং, সাজার কোন বিধান নয় অথবা রাষ্ট্র -সমাজ ও সংগঠনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের অভিলাশ চরিতার্থকরণের ইচ্ছাপত্র বা উইল নয় । কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

অত:পর, লেনিননবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েতের অনুগমণে কল্পিত বা তথাকথিত "মুজিববাদ" যা, এখন খোদ আওয়ামী লীগই মান্য-গ্রাহ্য করে না, তা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার পরিপন্থী "জুরুরী আইনের" বিধান সম্বলিত অসাংবিধানিক ২য় সংশোধনী ও পরবর্তীতে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে "জাতীয় সংসদ" নিজেই আত্মহত্যা করে ও স্বয়ং কবরস্ত হয়। জনগণের ভোটাধিকারে "রাষ্ট্রপতি " নির্বাচিত হবে মর্মে ৪র্থ সংশোধনীতে বর্ণিত থাকলেও কার্যত জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়ার ভয়ে- শব্দ ও আইনের করাপ্ট ভার্শান জনিত দোষে দুষ্ট ৪র্থ সংশোধনী মুলেই জনগণের ভোট ছাড়াই আইনানুগভাবে নির্বাচিত অর্থে রাষ্ট্রপতি পদে স্বয়ং পদোন্নত সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পার্সোনাল কাল্ট সৃষ্টি করার মাধ্যমে 'এক নেতার এক দেশ' হিসাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে এক ব্যক্তির মালিকানাধীন তালুকী সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছিল ।

ভুয়া সমাজতন্ত্রী লেনিনের মতোই সমাজতন্ত্রের ছুতায় সৃষ্ট রাষ্ট্রায়ত্তখাতকে রাষ্ট্রিক ক্ষমতামূলে লুট-পাট করে বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ব্যবহার করার মাধ্যমে অর্জিত-লব্ধ সম্পত্তির বৈধতা প্রদান করাসহ অনুরূপ সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা নিশ্চিতকরণে সামরিক শাসনের আওয়ায় ও কর্তৃত্বে বাংলাদেশের সংবিধান হতে কতিপয় রাষ্ট্রিক নীতি বিলোপ ও বিলীন করে নানান সংশোধনী অসাংবিধানিকভাবে গৃহীত হয়েছে পরবর্তীকালে ।

তবু ওরা ভুলাতে চায় যে ,ওরা পুঁজিবাদী নয় বরং সমাজতন্ত্রী । অথচ, "বস্তুর দ্বান্দিক তত্ত্ব" দ্বারা ইতিহাসকে অনুন্ধান ও বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে

উৎপাদন উপকরণ ও শক্তির বিকাশ এবং উৎপাদন সম্পর্ক ইত্যাদি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ, পরীবিক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে "পুঁজির " গঠন-কাঠামো বিন্যাস মূলেই প্রাপ্ত "উদ্বৃত্ত-মূল্য" তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত সত্য ও তথ্য ইত্যাদি দ্বারা যেমন পুঁজিবাদের তেমন রাষ্ট্র ও শ্রেণীর উদ্ভব- বিকাশ এবং শ্রেণী ও রাষ্ট্রের বিনাশ ও বিলোপের মাধ্যমে শ্রেণী মুক্তির সূত্রায়নকারী মার্কস-এ্যাংগেলস কর্তৃক রচিত কমিউনিষ্ট ইস্তাহার যথার্থভাবে নিশ্চিত করেছিল-"বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ, দুইই সমান অনিবার্য।" এবং " ' শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি শ্রমিক শ্রেণীরই নিজস্ব কাজ হতে হবে,'---।" এটিও সংবিধান বটে এবং সমাজতন্ত্রের।

কাজেই, শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির কাজ সম্পাদনের পরিবর্তে 'মহান লেনিন' বা মাওসেতং বা শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ যদি সমাজতন্ত্রের নামে নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা পুরানো রাষ্ট্র ভেংগে টুকরো টুকরো করে টুকরো বিশেষের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তবে তা সমাজতন্ত্রের সংবিধানের লংঘন হেতু অনুরূপ কার্যাদি সমাজতন্ত্র ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি শত্রুতা বৈ অন্য কিছু গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। তবে, কমিউনিষ্ট সংবিধান অমান্যের পরিধি যত বাড়বে ততোই মরণাপন্ন পুঁজিবাদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করাসহ কমিউনিষ্ট আন্দোলনের বিপর্যয় ঘটবে ও বিকাশ রুদ্ধ হবে , এটিও অনিবার্য এবং দ্বান্দ্বিক নিয়ম এবং সংবিধান বটে কমিউনিজমের।

কমিউনিষ্ট সংবিধান অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের শেষাংশে বর্ণিত আছে-
"শৃংখল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নাই। জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ।"
অত:পর, জগৎ জয়ী শ্রমিকগণ কমিউনিষ্ট ইস্তাহার সমেত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে এবং অনুরূপ বিজ্ঞানের আলোকে পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছিল; উপরন্ত প্যারীর শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা করেছিল প্যারী কমিউন।

ফলশ্রুতিতে, দিশাহারা ও উন্মাদ হয়েছিল পুঁজিবাদীরা। তাঁরা এও নিশ্চিত হয়েছিল যে, পুঁজিবাদী সমাজের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা মরণাপন্ন পুঁজিবাদ ও মৃতবৎ রাষ্ট্রকে রক্ষা করা অসম্ভব বা পুঁজিবাদের নামে পুঁজিবাদ রক্ষা করা আর সম্ভব নয় বলেই বেচারা পুঁজিবাদ আশ্রয় নিয়েছিল ২য় আন্তর্জাতিকের সোশ্যাল ডেমোক্রেসীর পান্ডাদের গৃহে। তবে যেহেতু পুঁজিবাদকে পৃথিবী ছাড়া করবে

শ্রমিকশ্রেণী সেহেতু শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করা না গেলে এবং সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা- অপব্যবহার এবং তদার্থে স্বৈরতান্ত্রিক বা সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষকে সমাজতন্ত্র হিসাবে চালু করা না গেলে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী যে ঐতিহাসিক নিয়মেই পুঁজিবাদকে কবরস্ত করে সাম্যবাদের ভিত্তি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেই।

তাইতো সংকটাপন্ন পুঁজিবাদের রক্ষক হিসাবে লেনিন সোশ্যাল ডেমোক্রেসির মোড়ল বনে নিজেকে কেবলই মার্কসবাদী বা খাঁটি রুশি কমিউনিষ্ট গণ্যে বুর্জোয়া বিপ্লবে বুর্জোয়াশ্রেণীর অক্ষমতা-অযোগ্যতা নিরুপণ করে তথাকথিত অসম্পন্ন বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীকেই অনুরূপ বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পাদনসহ বুর্জোয়া মুক্তির দায়-দায়িত্ব গ্রহণের সূত্রায়ণে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও সেনাশক্তিমূলে সম্রাট জারের খন্ড-বিখন্ডিত সাম্রাজ্যের রুশীয় অংশের কর্তৃত্ব লাভ করে । লেনিন তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেই সমাজতন্ত্র হিসাবে জাহির করেছিল। লেনিন-ষ্ট্যালিনদের সহযোগিতায় লেনিনবাদী-ষ্ট্যালিনপন্থী মাওসেতুং চীনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আবরণে কার্যত বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে ও বিশ্ব পুঁজিবাদের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিক অব চীন।

শেখ মুজিব বা শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ কখনো সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিষ্ট বলে দাবীও করেনি। তাঁরা বরাবর পুঁজিবাদী এমনকি পুঁজিবাদের দুই বিশ্ব পুলিশ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার বিরোধ-বিবাদেও কখনো লেনিনবাদের সোভিয়েত পক্ষভুক্ত হয়নি। পুঁজি ও পুঁজিবাদের ঘোরতর বিবাদে অন্তিম দশায় উপনীত পাকিস্তান অটুট রাখা না গেলেও পুঁজিপতিশ্রেণী সমেত পুঁজিবাদ রক্ষায় অকার্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সংরক্ষণে এহেন পুঁজিবাদী আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব রাতারাতি বনে গেল সমাজতন্ত্রী এবং লেনিনীয় রাষ্ট্রের মতোই মুজিববাদী বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণে জোড়াতালি দিয়ে তৈরী করেছিল বাংলাদেশের সংবিধান। ফলে-যা হওয়ার তাই হলো।

অনুরূপ রাজনৈতিক চালাকি ও চাতুরালী দ্বারা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি যেমন ছড়ানো গেল তেমন বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণীকে বিশ্বপুঁজিবাদের বৈশ্বিক শৃংখলে নতুন করে আবদ্ধ ও বন্দী করা গেল বলেই যেমন পাকিস্তানে তেমন বাংলাদেশেও পুঁজিপতিশ্রেণী কেবলই বহাল তবিয়্যতে বহালই নয় বরঞ্চ মহাদাফটে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ-শাসন করছে। ফলে- শ্রমিকশ্রেণী কিঞ্চিতমাত্রায় সুবিধা হাসিলে সমানে দেশান্তরী হচ্ছে। কিন্তু মাওয়ের চীনের শ্রমিকরা ইচ্ছা করলেও আর্থিক সমস্যাসহ নানান প্রতিবন্ধকতায় বিদেশেও পাড়ি জমাতে পারে না। তবে মাওয়ের কমিউনিষ্ট পার্টির মোড়ল-মাতুব্বর বা লেনিন-ষ্ট্যালিন বা দেংশিয়াংদের চীনা চেলা-চামুন্ডারা বিদেশী পুঁজি ও পুঁজিপতিশ্রেণীকে জামাই আদরে তোয়াজ করে ডেকে এনে পুঁজিবাদের সংরক্ষণ সহ অলংঘনীয় ব্যক্তিমালিকানার সুরক্ষায় যাবতীয় বিহীতাদি সম্পাদনে যাবতীয় স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থার করতে সক্ষম হয়েছে বলেই চীনের শ্রমিকরা যেমন পাকিস্তান-বাংলাদেশের শ্রমিক অপেক্ষা অধিকর দু:খ-দৈন্যতায় দিনাতিপাত করছে তেমন লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট মাওয়ের চীন এখন বিশ্ব পুঁজিবাদের স্বর্গভূমি।

কাজেই, পুঁজিবাদী শেখ মুজিব সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে আলোচ্য সংবিধান প্রণয়ন করলেও এটি যেমন না গণতান্ত্রিক তেমন না সমাজতান্ত্রিক। কিন্তু আগাগোড়া কমিউনিষ্ট দাবীদার এবং লেনিনবাদী মাওসেতুং সমাজতন্ত্রের নামে তদীয় সংবিধান দ্বারা যে চীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তা যে আরো জঘন্য তা নিশ্চিত হয়েছে অত্র নিবন্ধে। তবে আমাদের অন্যান্য পুস্তকে আলোচিত হয়েছে বলেই খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ও প্রসংগিকভাবে চীনের সংবিধান আলোচিত হয়েছে ।

পুঁজিবাদীরা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারছে না বলেই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত ও বিভ্রান্ত করে যতোই টিকে থাকার চেষ্টা-অপচেষ্টা করছে ততোই তাঁরা কথিত গণতান্ত্রিক চরিত্র বিসর্জন দিয়ে কেবলই স্বৈরতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহ নিজেরাই স্বৈরতন্ত্রের কবলে পিষ্ঠ হচ্ছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রেহাই পাওয়ার সুযোগ নাই মরণাপন্ন পুঁজিবাদের বলেই সমাজতন্ত্রই মানবজাতির ভবিতব্য ।
কাজেই,সমজতন্ত্রের বিজ্ঞানপন্থীরা অর্থাৎ কমিউনিষ্ট ইস্তাহারকে যারা কমিউনিজমের সংবিধান বলে মানেন ও জানেন তারা যতোদ্রুত কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সমস্যা-সংকট ও সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের হারিয়ে যাওয়ার হেতুবাদ তথা লেনিন-মাওদের রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের তত্ত্ব-সূত্র বা তদানুরূপ বোধ-বুদ্ধি মতো ও কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের নিরিখে ও মানদন্ডে নিজেদের অতীতের বোকামি, ভুল-ভ্রান্তি দুরীভূত ও নিরসনের মাধ্যমে দুনিয়ার মজুরকে এক করার কাজে বৈশ্বিক পরিসরে ঐক্যবদ্ধ ও জোটবদ্ধ হতে সক্ষম হবে, ঠিক ততোধিক দ্রুতগতিতে পৃথিবী হতে বিদায় নিবে বহুবিদ স্ববিরোধীতায় নি:শেষিত এমনকি হালে ছোট ছোট আঘাতেও মারাত্মকভাবে ক্ষত-বিক্ষত তথা মৃতপ্রায় তবে জঘন্য পুঁজিবাদ সমেত মৃতবৎ রাষ্ট্র।

শেষত, সমাজের মুক্তির শর্তে স্বীয় মুক্তি হাসিলে কেবলমাত্র কমিউনিষ্ট ইস্তাহার বা সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরিখে আলোচ্য নিবন্ধের প্রকৃত ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি বা অপূর্ণতা বা শব্দগত বিভ্রাট যাতে আমি নিজেই কমবেশ আক্রান্ত বা সমস্যাগ্রস্ত বিশেষত জগত ও জীবন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিনির্মাণ বা অনুরূপ সূত্রাদি আবিস্কৃত হওয়ার পূর্বে একদিকে যেমন অজ্ঞাতা প্রসুত অন্যদিকে তেমন পরজীবীতা বা রাজনৈতিক স্বার্থান্ধতায় প্রণীত শব্দ যেমন বৈজ্ঞানিক নয় বলেই যথার্থ ও সঠিক নয় অথচ, সমাজতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে বা দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের অনুপস্থিতি অথবা বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি বিধায় বিজ্ঞান সম্মত শব্দ উদ্ভুত-নির্মিত ও চালু হয়নি হেতু বিদ্যমান ভুল বা অশুদ্ধ ও অবৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহারে বাধ্য হয়েছি বলেই অনুরূপ ভুল-ভ্রান্ত বা অশুদ্ধ বিষয়াদি মোচনে বা নিরসনে ও দুরীকরণে- আন্তরিকগণের বৈজ্ঞানিক পরামর্শ সাদরে আমন্ত্রিত।

শাহ্ আলম
ঢাকা, ২৫ জানুয়ারী, ২০১০।

বাংলাদেশের সংবিধান
না সমাজতান্ত্রিক
না গণতান্ত্রিক
মাওয়ের চীন–আরো জঘন্য

"সমাজতন্ত্র"সহ মোট ৪ টি মুলনীতি ভিত্তিক একটি রাষ্ট্র গঠনে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও একটি প্রস্তাবনাসহ ১১ টি ভাগে ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল সম্বলিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরে প্রবর্তিত ও বলবত হয়েছে উক্ত সংবিধানের অনুচ্ছেদ–১৫৩(১) অনুসারে। সাধারণভাবে লেনিনীয় ও মুজিবীয় সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী ব্যক্তি–গোষ্ঠীতো বটেই এনকি বহু অ–সমাজতন্ত্রী সমেত নামজাদা আইনজীবী–পেশাজীবী এবং খ্যাতি–পরিচিতির জন্য গর্বিত বুদ্ধিজীবী গয়রহ প্রায়শই বলে থাকেন উক্ত সংবিধান দুনিয়ার সেরা বা শ্রেষ্ঠ সংবিধান। তাঁদের মতে খুব কম সংখ্যক সংবিধান আছে যার শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে কোন অংশেই এটি নিকৃষ্ট হতে পারে। রাজনীতি ও সমাজের মাথা গণ্য লোকজনদের এমনতরো মুখরোচক বক্তব্য–বিবরণে বিভ্রান্ত বটে অনেক মান্য গণ্য হোমরা–চোমরা।

রাষ্ট্র বিশেষকে কার্যকর রাখতে হলে রাষ্ট্র গঠনকারী দলিল অর্থাৎ সংবিধান স্থগিত হওয়ার কোন সুযোগ নাই। বিশ্বব্যাংক–আই.এম.এফ সহ বহু সংগঠনের চুক্তিপত্রে বা সংবিধানে বিলোপের বিধান থাকলেও স্থগিতের বিধান নাই। বুর্জোয়া আমেরিকার ১৭৮৭ সালের সংবিধান ৩১ বার সংশোধিত হলেও আজতক একবার ও স্থগিত হয়নি , কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান ইতোমধ্যে অনুন্য ২ বার স্থগিত হয়েছে অর্থাৎ সংবিধানকে অস্বীকার–অমান্য ও অকার্যকর এবং সাংবিধানিক আইন ভংগ করা হয়েছে ।

তাছাড়া– প্রথম সংশোধনী দ্বারা যেমন জনগণের ক্ষমতার নিশ্চিতিতে সংবিধানে নিশ্চয়তাকৃত মৌলিক অধিকার বিশেষ সহ কতিপয় অনুচ্ছেদ অকার্যকর করে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও চরিত্র পরিবর্তন করা হয়েছে তেমন প্রজাতান্ত্রিক ক্ষমতা ও সাংবিধানিক সুপ্রিমেসী নিশ্চিয়তাকৃত অনুচ্ছেদ–১ ও ৭ বিরোধী বা অসামঞ্জস আইন বা আইনাংশকে বাতিল গণ্য করায় এবং ৩য় ভাগের মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ ২৬ এর "না" দ্বারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে মৌলিক অধিকার বিরোধী অর্থাৎ অত্র সংবিধান বিরোধী আইন প্রনয়ণে অক্ষম ও অযোগ্য করা হলেও দলবাজির জোরে উল্লেখিত অনুচ্ছেদ–১ ও ৭ পরিপন্থী এবং অনুচ্ছেদ–২৬ এর বাধ্যতামুলক " না" অস্বীকার–অমান্য ও অকার্যকর করে মৌলিক অধিকার বিরোধী আইন প্রণয়ণে রাষ্ট্রকে সীমাবদ্ধ করিবে না মর্মে " জরুরী বিধানাবলী" শিরোনামে গৃহীত দ্বিতীয় সংশোধনী দ্বারা প্রকৃতার্থেই সংবিধানকে গুরুত্বহীন কাগুজে বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে বিধায় প্রধান নির্বাহীর নিরংকুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতা নিশ্চিত করে খোদ রাষ্ট্রটিকে এক ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা বা রাজনৈতিক অভিলাশ পুরণের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে। এবং চতুর্থ সংশোধনী দ্বারা মুলত বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে নির্বাহী প্রধানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুল্য গণ্য করা হয়েছে। এবং এ যাবৎ মোট

১৪ টি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে যা দ্বারা ১৯৭২ সালের সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্বতো দুরের বিষয় সংবিধানটিকেই খুঁজে পাওয়া দুস্কর অর্থাৎ পুর্বাপর পরস্পর বিরোধী অনুচ্ছেদই কেবল সংযুক্ত করা নয় বরং নির্বাহী আদেশ সহ যে সকল বিষয় কস্মিনকালেও সংবিধানের অংশ হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়, সেই সকল বিষয় এখন বাংলাদেশের সংবিধানের অংশ বিধায় সুচনায়- "সমাজতান্ত্রিক" ও "পরিকল্পিত অর্থনীতির" বাংলাদেশ এখন মুক্তবাজারী হেতু পরস্পর বিরোধী পরিকল্পিত অর্থনীতি ও মুক্তবাজার অর্থনীতির তাৎপর্যহীন উপস্থিতিতে এখন আর এটি সংবিধান হিসাবে গণ্য হওয়ারও যোগ্য নয়। অর্থাৎ বিদ্যমান সংবিধানে ৮ এবং ১৩ ও ১৫ অনুচ্ছেদমুলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি বা নীতিমালা হচ্ছে- "সমাজতন্ত্র" এবং রাষ্ট্রীয়খাতের প্রাধান্য ও আইন দ্বারা সীমিত ব্যক্তিমালিকানা ৩য়শ্রেণীভুক্ত। অথচ,৫ম, ৭ম, ১১ তম ও ১২ তম সংশোধনীর কর্তৃত্বমুলে রাষ্ট্রীয়খাতের বিলোপ ও ব্যক্তিখাতের অপ্রতিহত একাধিপত্যসমেত অসীম ব্যক্তিমালিকানার মুক্তবাজার অর্থনীতি বাংলাদেশে কার্যকর।

অত:পর, সকল সংশোধনীও নয়, কেবলমাত্র প্রথম,দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংশোধনী এবং পর পর দুইবার স্থগিত হওয়ার কারণেই নিশ্চিত হয় যে, আলোচ্য সংবিধান যেমন কার্যকর থাকেনি তেমন অত্র সংবিধান মতো বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পরিচালিত হয়নি। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিসহ যে সকল সাংবিধানিক কর্তৃত্ব বা পদাধিকারী শপথমুলে অত্র সংবিধান "রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান" করতে দায়বদ্ধ তাঁরাও তদার্থে সাংবিধানিক শপথ ভংগের দায়ে পারজুয়ারী গণ্য না হওয়ার সুযোগ বা যুক্তি নাই বিধায় যেমন খোদ রাষ্ট্র সহ সাংবিধানিক নীতিমালা ও নির্দেশনা অটুট-অক্ষুন্ন থাকেনি তেমন সংবিধান লংঘন ও ভংগ করে যাঁরা সংবিধান স্থগিত করেছে তাঁরা সহ পারজুয়ারীরা মিলে মিশে অত্র সংবিধানমুলে নয় বরং নিজেদের শ্রেণী-গোষ্ঠী ও কোটারী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক দল বা সেনা কর্তৃত্বের দখলাধীন একটি সংস্থায় পরিণত করে কেবলই সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলে ব্যবহার করে শ্রমিকশ্রেণীতো বটেই বাংলাদেশের জনগণকে জোরজবরদস্তি বা স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্বের অধীনস্ত করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে যেমন অবলীলায় নসাৎ করেছে তেমন বিশ্ব দখলকারী পুঁজিবাদের আওতায় স্থানীয়ভাবে বা জাতীয় পরিসরে বা স্থান বিশেষে গঠিত রাষ্ট্র যে বহু পুর্বেই অন্তিম দশায় উপনীত হয়েছে বিধায় মৃতবৎ রাষ্ট্রকে রক্ষায় যতোই নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হোক বা ভংগুর রাষ্ট্রের ভাংগা অংশে পুরানো রাষ্ট্র চুমকাম করে টিকিয়ে রাখার অপচেষ্টা করা হোক তা যে সফল হওয়ার নয় , উপরন্ত বিপন্ন পুঁজিবাদের বিশ্ব সংরক্ষক এবং মৃতবৎ রাষ্ট্রের রক্ষক তথা বিশ্ব প্রভু বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের জামানায় রাষ্ট্র বিশেষের এমন ভংগুর অবস্থাই যে অনিবার্য তাও প্রমাণিত হয় বলে তদমর্মে ইতিহাসের নিয়ম তথা অন্তিম দশায় উপনীত রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পরিণতি বিষয়ে কার্ল মার্কসের বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত হয়েছে।

এছাড়াও হাল আমলে দেশী-বিদেশী বহুজনকে প্রকাশ্যে বলতে শুনা যাচ্ছে বাংলাদেশ একটি কার্যকর রাষ্ট্র হয়ে উঠেনি। আবার ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশ পর পর ৫ বার বিশ্ব সেরা দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত হওয়া বা ২০০৬ সালে দেশব্যাপী বোমা হামলা ইত্যকার বিষয়াদি নাকি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অকার্যকর

প্রমাণেরই ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের অংশ বিশেষ। ফলে- উল্লেখিত মতামত ও ঘটনাবলী দ্বারাও এটি অন্তত সাধারণ্যে নিশ্চিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের সংবিধান ক্রিয়াশীল থাকেনি বা উক্ত সংবিধান মতো একটি কার্যকর রাষ্ট্র যথার্থভাবে গড়ে উঠেনি। তৎসত্ত্বেও, বাংলাদেশের সংবিধান সেরা বা শ্রেষ্ঠ ? না- এমন দাবী ধোপে টিকে না।

অত:পর,রাষ্ট্রীয় মূলনীতি "সমাজতন্ত্র "ভিত্তিক " সাম্যবাদী" সমাজ লাভে সমাজতান্ত্রিক নীতি ভিত্তিক একটি রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনকারী দলিল অর্থাৎ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-১৯৭২ এর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সম্পর্কে কমিউনিষ্ট বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীসহ সংবিধান বোদ্ধা ও বিশেষজ্ঞগণই কেবল নয় বরং জগত-জীবন ও জাগতিক ক্রিয়াদি সমেত সংগঠন সম্পর্কে সাধারণ ধারণার যে কোন ব্যক্তিই বলতে পারেন যে, উক্ত সংবিধান-

ক) বহুবিদ সীমাবদ্ধতা ও অসমঞ্জস্যতা এবং অনুচ্ছেদগুলোর পারস্পারিক সাংঘর্ষিকতা ও বৈরীতা বিশেষত-

(১) রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে অনুচ্ছেদ-১০ এ বিবৃত এই: " মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতষ্ঠা করা হইবে।" অথচ, উক্ত নীতি বাস্তবায়নে খোদ রাষ্ট্রই যে, স্বয়ং প্রধান প্রতিবন্ধক তা বেমালুম ভুলানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে। অথবা,রাষ্ট্র যতোক্ষণ থাকবে ততোক্ষণ রাষ্ট্রীয় নির্বাহী যেমন থাকবে তেমন রাষ্ট্রিয় ব্যয়েই রাষ্ট্রজীবীদের পরিপোষণ করতে ট্যাক্স বা করের নামে শ্রমিকশ্রেণীর নিকট হতে উক্ত ব্যয়ের অর্থ আদায়-উসুল করতে হবে বিধায় কেবলমাত্র রাষ্ট্রের নিমিত্তেই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাত করতে হবে অর্থাৎ কেবলমাত্র খোদ রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হিসাবে অবস্থিত থাকার রাষ্ট্রিক কারণেই শ্রমিকশ্রেণী মজুরির অপরিশোধিত অংশ রাষ্ট্রকে প্রদান করার মাধ্যমে মুল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নকারী শ্রমিকশ্রেণী শোষিত হবে হেতু মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষিত হইবে। উপরন্ত, শোষণ মুক্তির শর্ত পুরণে ভোগ-ব্যবহারের উদ্দেশ্য বৈ মুনাফা বা অপর কোন উদ্দেশ্যে উৎপাদন নয় বলেই উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নের খোদ পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা সমেত উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ-সুবিধাদি বিনাশ সাধনে তথা বেচা-কেনার অবলোপে উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিমালিকানা বা মনোপলি বিলোপে সামাজিক বা সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমেত রাষ্ট্র বিলোপ অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও তদ্রুপ বিধি ব্যবস্থা না করেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের শোষণমূলক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকেই রাজনৈতিক কলা-কৌশল ও চাতুরালীতে শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজলাভের রাষ্ট্রিক মূলনীতি হিসাবে ঘোষণা করে কার্যত মরণাপন্ন পুঁজিবাদ ও মৃতবৎ রাষ্ট্রকে রক্ষা ও সংরক্ষায় এবং রাজনীতিজীবীদের পরজীবীতার খায়েশ পূরণের হীন উদ্দেশ্যে সকল প্রকার মূল্য উৎপন্নকারী শ্রমিকশ্রেণীকে ধোঁকা দিতেই সকল ধরণের দমন-পীড়নের মাধ্যমে শোষণ-বঞ্চনার রক্ষক রাষ্ট্রকেই প্রতারণামূলে বলা হচ্ছে শোষণমুক্তির মূল হাতিয়ার যেমন'টি,বলেছিলেন এবং করেছিলেন বিশ্ব ভন্ড মি: লেনিন ।

ঠিক যেমন- জিওসেন্ট্রিজমের অসারতা-ভ্রান্তি ও ভুয়ামি প্রমাণে কোপার্নিকাসদের প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কিত সোলার সিষ্টেম সম্পর্কে এখনো ভুল-বাল বুঝানোর ভীষণ অপচেষ্টা করছে সোলার সিষ্টেমের সুযোগ-সুবিধা সমেত তদমূলে আবিস্কৃত প্রযুক্তি

ব্যবহারকারী ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া বিশেষের মালিক-অধিপতি গয়রহ তাঁদের নিজেদের মুনাফা হাসিলের স্বার্থান্ধতা কার্যত অবৈজ্ঞানিক পুঁজিপতি শ্রেণীরই হীনতম স্বার্থে।

অথচ, প্রতিদিনই প্রত্যেকেই দেখছে-প্রত্যক্ষ করছে- সূর্য যেমন ঘুরছে তেমন পৃথিবীও ঘুরছে বা ডিল বিশেষ উপরে ছুঁড়ে মারলে নীচে এসে পড়ে বা গাছের ফল মাটির দিকেই পড়ে, অথবা বাতাসের গতিবেগ অনুযায়ীই গাছেরও ডাল-পাতা নড়ে বা বাতাস হতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিয়েই বেঁচে থাকে জীব এবং এসকল নৈমত্তিক বিষয়াদির দৃশ্য দেখে আসছে মানবজাতি হাজার হাজার বছর ধরে।

কিন্তু ,কোপার্নিকাস-ব্রুণোরা জিওসেন্ট্রিজমের অসারতা সুনিশ্চিতি বা নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, বা এন্টনিওর অক্সিজেন আবিস্কার বা আলবার্ট আইনাষ্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিস্কারের পূর্বে দৈনন্দিন দৃশ্যমান অথচ, জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও জীবনের উৎপত্তি বা উৎস ভূমি ও আঁধার - পৃথিবী ঘুরাসহ এসব বিষয়ে মাত্র ৪০০ বছর পূর্বেও মানবজাতি ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আবার এখন এসব বিষয়ে জানা সত্ত্বেও কেবলমাত্র শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভিশাপে তদ্বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য জানা-বুঝা সহ তদার্থে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের সুযোগ বঞ্চিত এমনকি বর্ণপরিচয়হীন বিশাল সংখ্যক মানুষ যেমন উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে জানে না তেমন ব্যবহার্য বা ভোগ্য বিষয় তথা জীবন-জগত সম্পর্কে প্রথাগত ধ্যান-ধারণা বা কুসংস্কার বশত এবং পুঁজিবাদী মিডিয়ার পুঁজিবাদী স্বার্থে ব্যক্তিবিশেষকে মহান জ্ঞানী বা বিশেষ প্রাধিকারভুক্ত গোত্র বা বংশের কারণে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ অধিকারী মর্মে বিশেষ প্রতিভার অধিকারী জন্মগত শর্তেই তৈরী হয় বলে উৎপাদন বা সৃষ্টিতে বা মূল্য উৎপন্নের মতোই জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও শ্রমের ভূমিকাকে অস্বীকার করে জানা-বুঝার বিষয়াদিকে কেবলই বিশেষ প্রতিভার বিশেষ বিশেষ জ্ঞানীদের মৌরশী স্বত্বের হেতুবাদে অনুরূপ বিশেষ বিশেষ প্রতিভার ব্যক্তিবর্গকে কেবলই প্রভু বা প্রভু তুল্য গণ্যে শ্রমিককে কেবলই অনুরূপ পরজীবী প্রভু বা প্রভুগোত্রীয়দের ভরণ-পোষণ দান সহ তাঁদের স্বার্থে ও হুকুমে নিজের জীবনপাত করা সহ সদা-সর্বদা তথাকথিত জ্ঞানীদের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রদর্শনের-দাসানুদাসের দাসতান্ত্রিক দর্শন-নীতি ও রাজনীতি প্রচার করার কারণে - প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সনদধারী বহুজনও এতদ্বিষয়ক তথ্য-তত্ত্ব বা জ্ঞান সম্পর্কে কেবল অজ্ঞই নয় মূঢ়ও বটে এবং বিজ্ঞানী পদবীর ভন্ডতো আছেই ।

তবে এটি তো ঠিক যে, প্রায় ২ লাখ বছর বয়সী মানব জাতি মাত্র ৪০০ বছর পূর্বে অর্থাৎ হাজার হাজার বছর যাবত জগত ও জীবন বিষয়ে অতীব মৌলিক হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতো না । আর এখনো যারা জানেনা তার জন্য দায়ী ও দোষী বটে বিশেষ বিশেষ প্রতিভার বিশেষ মেধাবী বা জন্মসূত্রে মেধাবী বা ক্ষণজন্মা মহা পুরষ বা মহান শিক্ষক বা প্রভুগোত্রীয় বা তাঁদের দোষর মুলত-কার্যত স্বার্থান্ধ-ভন্ড, প্রতারক-বিশ্বাসঘাতক ও প্রবঞ্চক গয়রহ পরজীবী গোষ্ঠীই। উল্লেখিত বিষয়গুলোর কার্যকারণ সম্পর্কে কি ও কেন দ্বারা প্রশ্ন করে জাগতিক বিষয়ে প্রাপ্ত-জ্ঞাত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে তার উত্তর পাওয়া কোপার্নিকাস বা আইনাষ্টাইনরা দৈনন্দিন আর দশজন যা যা দেখছে তা-ই দেখেছে তবে গভীরভাবে এবং শ্রম নির্ভরতা ও শ্রমশীলতার মাধ্যমে

বস্তুনিচয়ের অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় পরীক্ষণ এবং শ্রমক্লান্তিতে আক্রান্ত হয়েও নিরীক্ষা বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তুলনাকরণের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়গুলোর বৈজ্ঞানিক-তাত্ত্বিক সত্যতা-যথার্থতা ও সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন।

অনুরূপ, বুর্জোয়া অর্থনীতি বিশেষত শোষণের মুল সূত্র " উদ্বৃত্ত-মুল্য" বিষয় সহ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রায় সমগ্র জীবন গভীর অনুসন্ধান-পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মার্কস যেমন পুঁজি গঠনের গোপন রহস্য-"উদ্বৃত্ত-মুল্য" তত্ত্ব ও মানব জাতির ইতিহাস বিকাশের নিয়ম- "শ্রেণী সংগ্রামের" তত্ত্ব উদ্ভাবন-আবিস্কার করেছিলেন তেমন এ্যাংগেলস সহ সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশ সাধন তথা তাঁরা দুজনেই সম্মিলিত ভাবে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সূত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কার্যকরণে সচেষ্ট ছিলেন। স্মরণযোগ্য-তাঁদের পুর্বেও বহুজন সমাজতন্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন এবং প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্র বিষযে তাঁদের পুর্বেকার সকল মতই ছিল ইউটোপীয় বা কাল্পনিক। কেবলমাত্র তাঁরা দু'জনেই সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বা সমাজতন্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

কাজেই, মার্কস-এ্যাংগেলসকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র আলোচনা বা বিনির্মাণ করা অসম্ভব। আবার সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে বিভ্রান্ত ও বিপথে চালিত করতে হলেও মার্কসদের নাম ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই এবং অনুরূপ করাটাই পরজীবীদের জন্য শ্রেয়তর। একারণে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কারের পর সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে " মার্কসবাদ"এর বন্দনীভুক্ত করে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী সহ সকল সমাজতন্ত্রীকে প্রতারিত করার জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে সমাজতন্ত্রের শত্রুরা ।

আবার এ্যাংগেলসের জীবৎদশায় জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচৈতন্য ও সাংগঠনিক অবস্থা সহ ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থান-অবস্থার নিরিখে " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" পুস্তকের ২০ এপ্রিল-১৮৯২ সালে লিখিত ভূমিকার প্রায় শেষাংশে ফে.এ্যাংগেলস লিখেছেন- " কিন্তু ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিজয় শুধু ইংলন্ডের ওপরেই নির্ভরশীল নয়। সে বিজয় অর্জিত হতে পারে অন্তত ইংলন্ড ফ্রান্স ও জার্মানির সহযোগে। শেষোক্ত দুটি দেশেই শ্রমিক আন্দোলন ইংলন্ডের চেয়ে বেশ এগিয়ে। জার্মানিতে এমনকি তার সাফল্যের দিন এখন হিসাবের মধ্যে ধরা যায়। গত পঁচিশ বছরে সেখানে তার যে অগ্রগতি ঘটেছে সেটা অতুলনীয়। ক্রমবর্ধমান গতিতে সে এগুচ্ছে। জার্মান মধ্য শ্রেণী যদি রাজনৈতিক দক্ষতা, শৃংখলা, সাহস, উদ্যোগ, অধ্যবসায়ে শোচনীয় অযোগ্যতা জাহির করতে থাকে, তবে শ্রমিকশ্রেণী এই সবকটি যোগ্যতারই প্রভূত প্রমাণ দিয়েছে। চারশ' বছর আগে ইউরোপীয় মধ্য শ্রেণীর প্রথম উৎসারের সুত্রপাত ঘটিয়েছিল জার্মানি; আবস্থা এখন যা, তাতে ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের প্রথম মহান বিজয়ের মঞ্চও হবে জার্মানি, এ কি সম্ভাব্যতার বাইরে? " অর্থাৎ জার্মানীর মতো একটি দেশ বা রাষ্ট্র নয় বা রাষ্ট্রীয় গন্ডীতেও নয় বরং ফ্রান্স-ইংলন্ড ও জার্মানিতেই পুঁজিবাদের সহিত সৃষ্ট বৈরীতায় শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় নিশ্চিত করতে জার্মানীর শ্রমিকশ্রেণী সংগঠনগত অবস্থার কারণে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে পারে বলে অনুরূপ মতামত প্রকাশ করেছিলেন এ্যাংগেলস ।

ফলে- জার্মানীর বুর্জোয়াশ্রেণী যারা নিজেরাই শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন-অবস্থা বিষয়ে অনুরূপ অভিজ্ঞার অধিকারী আবার বিপুল পরিমান কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালনে বা পণ্যের বাজারজাতকরণে ইত:পূর্বে বিশ্ব আধিপত্যকারী ইংলন্ডের নিকট হতে মারাত্মক বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে সংকটাপন্ন হয়ে ছিল । সেই জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীই তাদের এতদসংক্রান্ত সমস্যা হতে রেহাই পেতে অর্থাৎ ইংলন্ডের কবল হতে দুনিয়ার অংশ বিশেষ নিজ বলয়ভুক্তকরণ ও শ্রমিকশ্রেণীকে শ্রেণীবোধ হতে জাতীয়বোধে নিমজ্জিতকরণের জন্য ভাড়া করেছিল মার্কস-এ্যাংগেলসের নাম যুক্ত ও তাঁদের উদ্ঘাটিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতি প্রতিষ্ঠায় সৃষ্ট ২য় আন্তর্জাতিকের নেতা কাউৎস্কি গংদের। ফলশ্রুতিতে-১৮৯৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ২য় আন্তর্জাতিকের সম্মেলনে- গৃহীত সিদ্ধান্ত তথা পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই-সংগ্রাম করা অর্থাৎ পুঁজিবাদীদের কোন অংশ বিশেষের পক্ষে-বিপক্ষে নয় বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিনাশে সামগ্রীকভাবে এবং সর্বত্র ও সর্বসময়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসদের উদ্ঘাটিত ও নির্ণিত "শ্রেণী সংগ্রামের কলা-কৌশল" সংক্রান্ত সূত্র অস্বীকার ও অকার্যকরণে; এবং, বিশ্ব বিস্তৃত বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন-বিনাশে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠনের অপরিহার্যতায় মার্কস-এ্যাংগেলসদের সূত্রায়িত ও তত্ত্বায়িত আন্তর্জাতিকতাবাদ নিশ্চিতিতে - "দুনিয়ার মজুর এক হও" সংক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক মৌলনীতি-শর্ত কার্যকরণে গঠিত কমিউনিষ্ট লীগ ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির (প্রথম) রুলসের ভিত্তিতে ২য় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়েছে বলে তদসংক্রান্ত ১ম আন্তর্জাতিকের ১৮৬৪ সালের জেনারেল রুলসই ২য় আন্তর্জাতিকের রুলস হিসাবে বহাল রাখা সত্ত্বেও, আন্ত র্জাতিকতাবাদকে পদদলিতকরণে ও প্রকৃতার্থে কমিউনিষ্ট লীগ ও ১ম আন্তর্জাতিকের নীতিমালা ও রুলসের অকার্যকরতা নিশ্চিতিতে, বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি বিরোধী ভুয়া জাতীয় পুঁজি ও পীড়িত বুর্জোয়াশ্রেণীর নিপীড়িত জাতির ভুয়া মুক্তির ভুয়া তত্ত্ব অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর সংক্ষুব্ধ ও বিক্ষুব্ধ অংশের স্বার্থ সংরক্ষায় পীড়ক বুর্জোয়া জাতির বিরোধীতার কৌশলে বা মেকি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার ছল-চাতুরীতে বা আবরণে মুলত অধিকতর পুঁজিওয়ালাদের বিরুদ্ধে স্বল্প পুঁজি বা প্রতিপক্ষ বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বপক্ষে অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর আন্ত:কোন্দল ও কলহে ছোটতরফের অংশীদার হতে কার্যত পুঁজিবাদের স্বপক্ষেই জন লক-জেফারসন্সদের তথাকথিত "জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" বিষয়ক নীতি যা-কমিউনিষ্ট লীগের ১ ও ২ নং ধারা এবং আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য ও করণীয় বিষয়ে আন্তর্জাতিকের রুলসের -প্রস্তাবনা ও ১ নং ধারার পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক বিধায় উল্লেখিত আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার, সন্দেহাতীতভাবে বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর বিপক্ষে ও বিরুদ্ধে বলে মার্কস-এ্যাংগেলসদের উদ্ঘাটিত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। তবু, "মার্কসবাদের" খোলসে-আবরণীতে 'জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার' বিষয়ক বুর্জোয়া ভন্ডামির নীতিকেই ২য় আন্তর্জাতিকের নীতি হিসাবে প্রতারণামুলে গ্রহণ করে ২য় আন্তর্জাতিকের কাউৎস্কি কোম্পানী ।

ন্যাশনাল এসোসিয়েশনে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকা সমেত তদমর্মে কমিউনিষ্ট লীগের সদস্যপদের শর্ত ভংগ এবং আন্তর্জাতিকের ব্যাপ্তি-পরিসর ও কর্মালাকা এবং কার্যাবলী বা করণীয় অস্বীকার করার হেতুবাদে আন্তর্জাতিকের সদস্যগণ রূপান্তরিত হয় কেবলই নিজ নিজ দেশের কমিটি অর্থাৎ জাতীয় রাজনৈতিক দলের সদস্যে ।

সুতরাং-২য় আন্তর্জাতিকের অনুরূপ প্রতারণা-বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানির পরিণতিতে-জার্মান সহ দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী উল্লেখিত আত্মঘাতি ও রাষ্ট্রকেন্দ্রীক রাজনীতির কানাগলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। আবার কেন্দ্রীভূত পুঁজির সঞ্চালন জনিত বিরোধকে পুঁজির আন্তবিরোধ না বলে বরং জাতিগত বিরোধ-বৈরীতা হিসাবে বাজারজাত করা হয়েছে। ফলে - জাতিভুক্ত শ্রমিকরা কৃত্রিম জাতি ও ভুয়া জাতিগত বিরোধের প্রকৃত অংশীদার হয়ে নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই যুদ্ধ-লড়াই করেছে ইউরোপসহ যুদ্ধ আক্রান্ত অন্যান্য দেশে। উপনিবেশের শ্রমিকরা উপনিবেশিক পুঁজিপতিদের সহিত সেখানকার শ্রমিকশ্রেণীকে সমানভাবে দোষী ও হিংসা-ঘৃণা করলেও নিজদেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হত। অথচ, শ্রমিকশ্রেণী মাত্রই শোষিত-নিপীড়িত হয় পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক বলেই দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর শত্রু বটে পুঁজিপতিশ্রেণী তা হোক দেশী বা বিদেশী ।

উপর্যপুরি, শ্রমিকশ্রেণীর প্রত্যেককেই লড়াই করতে হবে নিজ নিজ দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে যা আকারে জাতিয় হলেও প্রকারে ও প্রকৃতিতে আন্তর্জাতিক বলেই দুনিয়ার মজুর প্রত্যেকে প্রত্যেকের মিত্র এবং দেশ-জাতির গন্ডীমুক্ত একথাও কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের উল্লেখিত ফতোয়া মতো ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রভাবাধীন বা সংগঠনভুক্ত শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় শ্রেণী চরিত্র ও শ্রেণীচৈতন্য হারিয়ে পরিণত হল কেবলই নিজ নিজ রাষ্ট্র ও নিজ নিজ জাতির অংশ বিশেষে। ফলে- বুর্জোয়াশ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর বৈরীতা-বিরোধীতার পরিবর্তে বুর্জোয়াশ্রেণীর আন্ত:বৈরীতা-বিরোধীতায় অংগীভূত হল ইউরোপ সহ বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী। অত:পর, মার্কসদের বৈজ্ঞানিক সূত্রায়ন মতো শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ভরকেন্দ্র বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাসগতভাবে তখনকার জন্য উপযুক্ত স্থান পশ্চিম ইউরোপ আর শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের মূলকেন্দ্র হতে পারেনি। তাতে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য-সংহতি নষ্ট - ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মারাত্মকভাবে । অনুরূপ প্রতারণামূলক রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বিলুপ্ত হয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে কাউৎস্কিদের যোগ্য শিষ্য লেনিন " মার্কসবাদ-লেনিনবাদের" ফতোয়ায় জাতি ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতির ব্যাপক চর্চা সাধনে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠনের নামে গড়ে তোলেন ৩য় আন্তর্জাতিক। যদিও, ষ্ট্যালিন ১৯৩৬ সালে লীগ অব ন্যাশন্সে যোগ দেওয়ার আগেই কার্যত ৩য় আন্তর্জাতিককে অকার্যকর ও শেষত ১৯৪২ সালে বিলুপ্ত করেছিলেন । তবু, লেনিনবাদীরা সমাজতন্ত্র বলতে বুঝত ও বুঝাত- লেনিনীয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিশেষকেই। তদমর্মে উপনিবেশগুলোতে নয়া বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্নকরণ বা তদ্রুপ রাষ্ট্রই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শর্ত বলে তত্ত্বায়ন করেছিল লেনিনবাদী-মাও পন্থীরা।

অথচ, পুর্বোল্লেখিত পুস্তকের প্রথম প্যারাতেই এ্যাংগেলস লিখেছেন- " একদিকে আজকের সমাজের ভেতরে মালিক ও অ-মালিক, পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-বৈর, এবং অন্যদিকে উৎপাদনের মধ্যকার নৈরাজ্য -মূলত এরই স্বীকৃতির প্রত্যক্ষ পরিণতি হল আধুনিক সমাজতন্ত্র।" অর্থাৎ পণ্য উৎপন্নের, মজুরি শ্রমের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্য গ্রহণ-ভোগী ও উদ্বৃত্ত- মূল্য উৎপন্নকারী যথাক্রমে পুঁজিপতি বনাম শ্রমিকশ্রেণীর

লড়াই-সংগ্রামের পরিণতিতে পরজীবী ও রাষ্ট্রাশ্রিত বুর্জোয়াশ্রেণী পরাজিত ও পরাভূত হবে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টিকারী শ্রমিকশ্রেণীর নিকট। পরিণতিতে- পণ্য উৎপন্নের নৈরাজ্যিক ব্যবস্থার স্থলে ভোগ্য ও ব্যবহার্য্য বস্তু সামগ্রী উৎপাদনে সমাজের সকলের শ্রমের মাধ্যমে এবং দৈনিক স্বল্পতম সময়ে অনুরূপ আবশ্যকীয় বস্তু উৎপন্নে সক্ষম জনসমষ্টির সকলের সম্মিলিত প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সমাজের সকলের অংশ গ্রহণে সুপরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। অত:পর, শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক সংগঠনের সহিত মূল ও মৌলিক বিরোধ বটে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও আত্মসাৎ বা অপহরণের বিরাজমান ব্যক্তিমালিকানা ও ব্যক্তিমালিকানার রক্ষক রাষ্ট্র সহ তদমর্মে নিয়োজিত সকল সংগঠনের।

সুতরাং- পণ্য উৎপন্ন তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ বা অপরের শ্রম অপহরণের সুযোগ রহিত ও বিলুপ্তির নামই সমাজতান্ত্রিক সমাজ। কাজেই,ইংলন্ড, ফ্রান্স , যুক্তরাষ্ট্র বা জার্মানীর মতো পুঁজিবাদী দেশ ব্যতীত অপরাপর দেশে বিশেষত বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনস্ত হওয়া সত্ত্বেও রাশিয়ার মতো প্রতিক্রিয়াশীল দেশ যেখানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সামন্ততন্ত্রের নিগড় ভেংগে প্রাধান্য লাভ করে কেবলই পুঁজিপতিশ্রেণীর কর্তৃত্বাধীন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি বা তদমূলে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীও প্রাধান্য বিস্তারকারী অবস্থায় উপনীত হয়নি অথবা চীনের মতো তথাকথিত-আধা সামন্ততন্ত্র,আধা উপনিবেশ বা ল্যান্ড লর্ড-ওয়ার লর্ডের কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র বা ভারত ইত্যাদির মতো উপনিবেশ ইত্যকার দেশ সমূহে পুঁজিবাদের বিস্তার সাধিত হলেও বিশ্ব পুঁজিবাদেরই বিকাশের শর্তে সমগ্র বিশ্বকে পুঁজিবাদের ধাঁচে গড়তে আবশ্যকীয় উপাদন অর্থাৎ দুনিয়ার সর্বত্র পুঁজি-পণ্যের সঞ্চালন-সরবরাহে প্রয়োজনীয় কাঠামো ও কাঠামোর পাহারাদার ব্যক্তি তথা পুঁজিবাদী পণ্য উৎপন্ন ও পণ্য বাজারজাতকরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমেত অনুরূপ কাঠামোর ছোট-বড় মালিক অর্থাৎ পুঁজি ও পুঁজিপতিশ্রেণী সৃষ্টি ও পত্তন করলেও উপনিবেশগুলোতে নব্য সৃষ্ট পুঁজিপতিশ্রেণী অর্থাৎ স্থানীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর যেমন আধিক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি বা পুঁজিবাদ বিশ্বকে জয় করে অসংখ্য উপনিবেশ স্থাপন করলেও উপনিবশেগুলোর শ্রমিকশ্রেণীও তেমন সমাজতন্ত্র পত্তনের মতো অভিজ্ঞতা যেমন, অর্জন করেনি তেমন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এ্যাংগেলস বিবৃত পুঁজিবাদী সংকটে মালিক ও মজুরি দাস তথা পুঁজিপতিশ্রেণী-শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তীব্র বিরোধ বা প্রকট বৈরীতামূলক সম্পর্কে তখনো উপনীত হয়নি বলে পুঁজির জন্ম-বিকাশ ও পরিণতির আধিক্যতা ও উপযুক্ততা হেতু কেবলমাত্র পশ্চিম ইউরোপীয় ৩ টি পুঁজিবাদী দেশ অর্থাৎ ইংলন্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী বা কিঞ্চিত পরিমানে তদানুরূপ উপযুক্ততায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অপরাপর দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতো বস্তুগত অবস্থা বা বাস্তব ভিত্তিই তৈরী হয়নি। সেই যথার্থ সুত্রায়নে এখনো প্রধানত আই.এম.এফের ৫ লারজেষ্ট সদস্য রাষ্ট্র এবং কার্যত জি-৮ এবং প্রকারান্তরে ও পর্যায়ক্রমে জি-২০ই সমাজতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত বা আপেক্ষিকভাবে উপযুক্ত ভিত্তিভূমি।

আবার পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করা বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোও শ্রমিকশ্রেণীর কর্ম নয়, কর্তব্যও নয়। এটি ঐতিহাসিকভাবেই পুঁজি বা পুঁজিপতিশ্রেণীর ক্রিয়া। তবে, ফ্রান্স-জার্মানীতে শ্রমিকশ্রেণী সামন্তবাদ উৎখাতে পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল বটে। কিন্তু, পুঁজিপতিশ্রেণী ক্ষমতাসীন হয়েই প্রথমেই একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তার করেছিল শ্রমিকশ্রেণীর উপরই। ফলে- বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর

প্রধান শত্রু হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীকে দমন-শায়েস্তার বিধি-বিধানই প্রথমেই জারী করেছিল ১৭৮৯ সালের ফ্রান্সের বিপ্লবী বুর্জোয়া সরকার। কাজেই পুঁজি ও শ্রমের প্রত্যক্ষ -তীব্র বিরোধ এবং প্রকট বৈরতাপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হয়নি এমন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন যুক্তি বা কারণতো নাই-ই, এনকি উন্নত যে কোন দেশে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেও এককভাবে যেমন সেরূপ ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না তেমন কেবলমাত্র ঐ রাষ্ট্রটির পরাজিত বুর্জোয়াশ্রেণীই এককভাবে বিজয়ী শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না।

অনুরূপ যুদ্ধ করে অপরাপর দেশের বুর্জোয়ারাও এবং তদমর্মে প্যারী কমিউনই উপযুক্ত প্রমাণ বলেই প্যারী কমিউনের তিক্ত ও দু:খজনক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মার্কসরা আবারো তাঁদের এতদ্বিষয়ক তত্ত্বের সত্যতা ও যথার্থতা সুনিশ্চিত হওয়ায় সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম যে কোন রাজনৈতিক সংগ্রাম নয় বা রাষ্ট্র গঠনের যুদ্ধ নয় বরং রাষ্ট্র বিনাশে কেবলমাত্র ব্যক্তিমালিকানার বৈশ্বিক পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্যের সাধারণ মালিকানার বৈশ্বিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রাম বিধায় সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন সমাজের ভিত্তি তথা সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম কেবলই বৈশ্বিক পরিসরের বৈশ্বিক সংগ্রাম বলেই ফ্রান্স বা জার্মানী যেখানেই সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম বিজয়ী হোক তাকে রক্ষার মুল শর্ত শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি এবং অনুরূপ ঐক্য-সংহতি রক্ষণ ও সংরক্ষণে বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর তাদার্থে যোগ্য ও উপযুক্ত বৈশ্বিক সংগঠন।

একইভাবে, পুঁজিপতিশ্রেণীও পুঁজিবাদ রক্ষায় বৈশ্বিকভাবে লড়াই করবে তাদেরই কবর খনক শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে। সুতরাং- বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিশ্বযুদ্ধ ছাড়া এবং অনুরূপ বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হওয়া ব্যতীত সমাজতন্ত্র যেমন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় তেমন কোন নির্দিষ্ট দেশ-রাষ্ট্রের গন্ডীতে সমাজতন্ত্র চালু বা কার্যকর করার সুযোগ নাই হেতু বৈশ্বিক পরিসর ব্যতীত কোন একক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ-অবকাশ নাই। তাইতো- লেনিন তাঁর একক কর্তৃত্বাধীন এক কিম্ভুতকিমাকার তথা দুনিয়ার সর্বনিকৃষ্ট দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সমজতন্ত্রের সাথে প্রতারণা করে সমাজতন্ত্রকেই তাঁর লিখিত বইপুস্তকে অসভ্যের মতো জঘন্যভাবে " রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ" হিসাবে আখ্যায়িত ও চিহ্নিত করেছিলেন । অথচ, কোনো দল বা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা মতো নয় বরং, পুঁজি ও শ্রমের অমিমাংসিত বিরোধ-বৈরীতার পরিণতি স্বরূপ অর্থাৎ পুঁজিবাদের পতন-বিনাশ ঘটিয়ে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পরিণতি বৈ আর কিছুই নয়। সমাজতন্ত্র বিষয়ে অন্তত, মার্কস-এ্যাংগেলস তাই প্রমাণ করেছিলেন।

সমাজতন্ত্র বিষয়ে উল্লেখিত পুস্তক, রচনাবলীর ১৩২ পাতায় বর্ণিত হয়েছে- " সে সময় থেকে কোন বিশেষ প্রবুদ্ধ মস্তিকের আকস্মিক আবিস্কার হয়ে সমাজতন্ত্র আর রইল না, তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর ভিতরকার সংগ্রামের আবিশ্যিক ফল।" অথচ, লেনিনবাদীরা দাবী করেন লেনিনের মতো বিশাল প্রতিভার অমর কীর্তি হচ্ছে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের রুশ সমাজতন্ত্র। এমনকি- ডিভাইন রাইটহোল্ডার বা অনুরূপ রাইটহোল্ডার রাজা-বাদশাগণের সমর্থক ও সুবিধাভোগীগণ

যেমন সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমের ভূমিকাকে অস্বীকার করে বা হিব্রু বাইবেলীয় ধারণায় শ্রমকে অভিশপ্ত আদমের দন্ড গণ্যে নিজেরা অনুরূপ শ্রমের দায়মুক্ত থাকতে অর্থাৎ নিজেদের পরজীবীতার তামাম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতে কেবলই ঐশ্বরিক ক্ষমতা-প্রতিভার জয়কীর্তন করে থাকে ঠিক তেমন বা হুবুহু সেই রকম ভাবেই ষ্ট্যালিন যেমন লেনিনকে মহান প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে নিজেকে লেনিনের যোগ্য শিষ্য হিসাবে দাবী করে কার্যত নিজেকেও লেনিনের মতোই বিশেষ প্রতিভার অধিকারী হিসাবে স্বয়ং ফতোয়া দিয়েছেন তেমন মাও, হোচিমিন, টিটু, হোক্সা ও কিম ইল সুং ইত্যকার তাবৎ লেনিনবাদীরা লেনিনসহ নিজ নিজ পার্সোনাল কাল্ট সৃষ্টিতে তাঁদের ঈশারা-ইংগিত ও সম্মতিতে যে সকল অসভ্য-বর্বর ও জঘন্য গুণাবলীর শব্দরাজি বা বিশেষণ তাদের নামের আগে-পরে যুক্ত করিয়েছিল এবং লেনিনবাদী পার্টি মোড়লরা করে থাকে তাতে লেনিন-ষ্ট্যালিন, মাও-হোচিমন প্রমুখ লেনিনবাদী সর্দাররা যেমন মানুষ নয় কেবলই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দেবতারূপ গণ্য হয়েছেন তেমন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নামে "শ্রমের" ভূমিকাকে প্রতারণামূলে অস্বীকার ও অকার্যকর করেছেন। তাইতো লেনিন ও লেনিনবাদীরা প্রতিভাবান বটে কিন্তু শ্রমিক বা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষীয় নয় বলে বস্তুবাদী হিসাবে দাবী করলেও কার্যত তাঁরা কেবলই স্বার্থান্ধ ভাববাদী হেতু নয় তাঁরা মোটেই ঐতিহাসিক বস্তবাদী বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী।

সেজন্যই -লেনিনসহ লেনিনবাদীরাই নিজেদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে পুঁজিপতিশ্রেণী বা শ্রমিকশ্রেণীর বৈরীতা-বিরোধীতার পরিণতি স্বরূপ "সমাজতন্ত্র" নয় বরং তাঁদেরই উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পিত-কৃত্রিম সমাজতন্ত্রের বানোয়াটি তত্ত্ব ইত্যাদি বিনির্মাণ করেছিলেন । অত:পর, লেনিন ও লেনিনবাদীরা -পুঁজি ও শ্রমের বিরোধ বা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে আড়াল বা গোপন করে কেবলই "পীড়ক জাতি" কর্তৃক "পীড়িত জাতির" আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার হরণ বা সামন্তবাদ কর্তৃক কৃষক পীড়ন তথা পুঁজির পীড়ন ইত্যকার পীড়নমূলক বিষয় হতে পীড়িত "বুর্জোয়ার মুক্তি" অর্থাৎ পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও পুঁজিপতিশ্রেণীর আন্ত বিরোধ বা ভাগ-বিভাগের বৈরীতা-বিরোধীতার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট রাষ্টকে "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" হিসাবে অভিহিত করে শ্রমিকশ্রেণীকে একদিকে যেমন অনুরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করেছে অন্যদিকে অনুরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব মূলে ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ফতোয়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত " কমিউনিষ্ট" নামের স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রিয় বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক অধিকতর মাত্রায়-হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সর্বাধিক সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে লেনিনদের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের রাষ্টের শ্রমিকশ্রেণীকেই সর্বাধিক মাত্রায় শোষণের মানবিক যন্ত্রে পরিণত করেছে। সর্বাধিক হারে শ্রমশোষণে সর্বকালের নিকৃষ্ট অনুরূপ বর্বর রাষ্ট্র বিশেষ বিনির্মাণে লেনিনের বানোয়াটি এবং তজ্জনিত কারণে হালে প্রায় বিলুপ্ত লেনিনবাদকে ষ্ট্যালিনসহ তাবৎ লেনিনবাদীরা বলছেন মহান লেনিনের মহান আবিস্কার!

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতারা যেহেতু লেনিনবাদী নন বা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির দাবীদার নন, তবে লেনিনবাদের প্রথম রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সোভিয়েত মিত্র ভারত এবং নানান দেশীয় লেনিনবাদীদের সহযোগিতা-সমর্থনপুষ্ট তাই - "লেনিনবাদের" অন্ধ অনুকরণ ও নকলীকরণে বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ নং

অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতিকে দলীয়ভাবে আখ্যায়িত করতেন " মুজিববাদ" হিসাবে । যদিচ, ৮ নং অনুচ্ছেদ শুরুই করা হয়েছে " জাতীয়তাবাদ" দ্বারা যা' সমাজতন্ত্রের সহিত বৈরী সম্পর্ক বৈ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

এখন অবশ্য ঐ দলটি যেমন সমাজতন্ত্র বলে না তেমন মুজিববাদও উচ্চারণ করে না। লেনিনের দলের নেতা-কর্মী বা লেনিনের সৃষ্ট চেকা/কে.জি.বি-ই যেমন ব্যক্তিপুঁজির সঞ্চয় ও সঞ্চালন নিশ্চিতকরণে পর্যায় ও যথাক্রমে- লেনিনের নিউ ইকোনোমিক পলিসি, ১৯৩৬ সালের সংবিধান দ্বারা উত্তরাধিকার সমেত পার্সোনাল প্রপার্টির স্বীকৃতি-অনুমোদন এবং ১৯৭৭ সালের সংবিধান দ্বারা প্রাইভেট প্রপার্টির সংরক্ষণ ও হেফাজতকরণে সোভিয়েটের "কমিউনিষ্ট পার্টি " ছাড়াও ব্যক্তিগত ভাবে বা গণসংগঠনগতভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা- কর্তৃত্বে সকল জনগণের আসীন হওয়ার জন্য সকল প্রজাগণের অবাধ সুযোগের আবরণে কার্যত পুঁজিওয়ালাদেরকে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত পুঁজির বিত্তবান মালিক অর্থাৎ সোভিয়েট রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট পুঁজিপতিগোষ্ঠীকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান এবং শেষত সোভিয়েত রাষ্ট্র ভেংগে টুকরো টুকরো করে জাতি রাষ্ট্রের অজুহাতে কার্যত পুঁজির অর্থাৎ প্রাইভেট ওনারশীপের উপযোগী ও সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে লেনিনের রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের আওতায় ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় খাতকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর ও নিষ্ক্রিয়করণের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যেকের পরিবার ও উত্তরাধিকারসহ সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা নিশ্চিতকরণে ১৯৯৩ সালে সংবিধান প্রণয়ন করেছে রুশ ফেডারেশন। সোভিয়েতের অপরাপর রাষ্ট্রগুলোও অনুরূপ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসাবে এখন গণ্য ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত।

অত:পর, লেনিনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের " সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্র পাতা-লতায় ও ফুল-ফলে পরিপূর্ণ ও বিকশিত হয়ে স্রেফ "পুঁজিবাদী" রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদ শব্দের ব্যবহারিক স্থানের যৎকিঞ্চিত হেরফের হয়েছে মাত্র অর্থাৎ লেনিনের "রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ" এর "পুঁজিবাদ" শব্দটি এখন " রাষ্ট্রের" পরে বসার পরিবর্তে রাষ্ট্রের পূর্বে স্থান করে নিয়েছে অথবা কৃত্রিম-বানোয়াটি সমাজতান্ত্রিক " রাষ্ট্র"শব্দটি'র একদা বিশেষণ "পুঁজিবাদ" শব্দটি এখন কেবলই বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে লেনিনের বিশেষণ পদবাচক "পুঁজি" কেবলই বিশেষ্য পদে পরিণত হয়েছে। বিশেষ্য ও বিশেষণ যদিচ ভাষার ব্যাকরণিক রীতি-নীতি তবু ঐ সকল শব্দসমূহ অর্থনীতি ও রাজনীতিরও যেমন অর্থবোধক তেমন গুরুত্ব প্রকাশক বটে।

রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে কথিত সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে বাংলাদেশে গঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রিয়খাত। সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা রাষ্ট্রীয়খাতকে প্রধান গণ্যে সমবায় ও ব্যক্তিমালিকানাকে অপ্রধান খাত গণ্য করা হয়েছিল। রাষ্ট্রিক ক্ষমতাসীন কর্তারা লুট-পাট করেছিল সমানে। অত:পর, ১৯৭৩ সালের শিল্পনীতি দ্বারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সীমা ২৫ লাখ টাকা নির্ধারণ করা হলেও ১৯৭৫ সালেই পুঁজির সিংলিং ৩ কোটি টাকায় পুন: নির্ধারতি হয়েছিল। সামরিক ক্ষমতাবলে জিয়ার সামরিক সরকার বিশ্বব্যাংক - আই.এম.এফের শর্তে একদিকে যেমন বেসরকারীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করে তেমন পুঁজির

সিংলিং বা সর্বোচ্চ সীমা না রেখে প্রাইভেট খাতের বিকাশ সহায়ক নীতি গ্রহণ করে এবং বিশ্বব্যাংকের শর্তাধীনে ১৯৮৩ সালের নয়া শিল্পনীতি দ্বারা আরেক সামরিক সরকার ব্যাপক বেসরকারীকরণ নীতি কার্যকর করে। গণতান্ত্রিক সরকারের আবরণে ১৯৯১ সালের শিল্পনীতিতে লাভজনক বা অলাভজনক সকল রাষ্ট্রয়াত্ত প্রতিষ্ঠান বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

শেষত –বাংলাদেশে রাষ্ট্রয়াত্তখাত প্রতিষ্ঠাকারী আওয়ামী লীগ–বেসরকারীকরণ আইন–২০০০ ও বেসরকারীকরণ নীতিমালা–২০০১ জারি করার মাধ্যমে উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ মুক্তকরণে অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক–আই.এম.এফের ব্যবস্থিত ও শর্তাধীন " মুক্তবাজার অর্থনীতি" প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রয়াত্তখাতভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান–বেসরকারীকরণে ইত:পুর্বেকার প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডকে " কমিশনে" উন্নীত করে রাষ্ট্রীয়খাত মুক্ত প্রাইভেটখাত তথা ব্যক্তিমালিকানাকেই প্রধান ও অপ্রহিতহত খাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার যাবতীয় বিহীতাদি সম্পন্ন করছে। একই সংগে " মুজিবাদের" দলটিও তার আদর্শ হিসাবে একদা ঘোষিত " সমাজতন্ত্র"কে দলীয় নীতি–আদর্শ হতে মুছে দিয়েছে। লেনিনবাদ প্রতিষ্ঠায় লেনিনের দল যেমন রাশিয়ায় একদলীয় স্বৈরতন্ত্র কার্যত লেনিনতন্ত্র কায়েম ও লেনিনীয় রাষ্ট্র রক্ষায় চেকা/কেজিবি সৃষ্টি করেছিল তেমন মুজিববাদ প্রতিষ্ঠায় মুজিবীয় রাষ্ট্র রক্ষায় বাংলাদেশে " জাতীয় রক্ষী বাহিনী" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং স্বীয় সৃষ্ট রাষ্ট্রিক সংবিধানের অসাংবিধানিক চতুর্থ সংশোধনীর দ্বারা এক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র ও এক ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন " বাকশাল" তথা একদলীয় স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছিল। রাশিয়ায় যেমন এখন বহুদলীয় গণতন্ত্র বাংলাদেশেও এখন বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু আছে। তবে, লেনিনবাদী বলশেভিক পার্টি রাশিয়ায় আবারো লেনিনবাদ ও লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায়। কিন্তু বাংলাদেশে মুজিববাদের পার্টি কেবলই অবাধ বাণিজ্যের মুক্তবাজার অর্থনীতি কার্যকরণে ব্যক্তি মুজিবের কাল্ট ব্যবহার করছে।

রাষ্ট্র ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে উল্লেখিত পুস্তকের শেষ প্যারায় এ্যাংগেলস লিখেছেন–"প্রলেতারীয় বিপ্লব– বিরোধ সমুহের সমাধান। সামাজিক ক্ষমতা দখল করে প্রলেতারিয়েত তার দ্বারা বুর্জোয়ার হাত থেকে স্খলিত সমাজীকৃত উৎপাদন–উপায়গুলিকে পরিণত করে সাধারণ সম্পত্তিতে । এ কাজের ফলে উৎপাদনের উপায়গুলি এতদিন যে পুঁজিরূপ চরিত্র ধারণ করেছিল তা থেকে প্রলেতারিয়েত তাদের মুক্ত করে তাদের সমাজীকৃত চরিত্রটার পরিপূর্ণ কাজ করে যাবার স্বাধীনতা এনে দেয়। পূর্ব নির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনায় সমাজীকৃত উৎপাদন এখন সম্ভব হয় । উৎপাদনের বিকাশের ফলে তখন থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব কাল–ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক উৎপাদন থেকে যে পরিমাণে নৈরাজ্য অন্তর্ধান করতে থাকে সেই পরিমাণে মরে যেতে থাকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। মানুষ অবশেষে নিজেরাই সমাজ–সংগঠনের প্রভু হবার সংগে সংগে যুগপৎ হয়ে দাঁড়ায় প্রকৃতির প্রভু– মুক্ত।

সার্বজনীন মুক্তির এই কর্মই হল আধুনিক প্রলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক ব্রত। ঐতিহাসিক অবস্থাটি পুরোপুরি বোঝা, এবং সে কারণে এই কর্মের চরিত্র প্রণিধান করা, যেমন স্মরণীয় কীর্তি প্রলেতারিয়েতের সাধন করার কথা তার অবস্থা ও তাৎপর্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানদান করা আজকের নিপীড়িত প্রলেতারিয়েত শ্রেণীকে, এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক যে প্রকাশ সেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কর্তব্য।"

অর্থাৎ সার্বজনীন মুক্তির প্রতিবন্ধক রাষ্ট্র যেমন শ্রমিকশ্রেণীর তেমন সমাজতন্ত্রের শত্রু । সুতরাং- সমাজতন্ত্রীদের কর্তব্য- রাষ্ট্র বিলোপে সদা সক্রিয় ও সচেষ্ট থাকা এবং তদসংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিষয়াদি গোপন না করা ।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণের মাধ্যমেই শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ এবং অনুরূপ শোষণের প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত-মূল্য হাসিলে পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্ববৃহৎ যন্ত্র বা হাতিয়ার হচ্ছে 'রাষ্ট্র' । কাজেই, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতে রাষ্ট্র বুর্জোয়াশ্রেণীকে সর্বাত্মক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে বলে রাষ্ট্রকে পরিচালনা ও রক্ষার জন্য প্রচুর ব্যয় করে থাকে বুর্জোয়াশ্রেণী । সেনা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারী ইত্যকার রাষ্ট্রিক অংগ-উপাদান রক্ষায় রাষ্ট্র যে অর্থ ব্যয় করে থাকে তা কর হিসাবে জনগণ থেকে আদায়-উসুল করা হলেও কার্যত ও প্রকৃতই উল্লেখিত কর আসে মজুরি দাস শ্রমিকশ্রেণীর শ্রম শোষণ করার মাধ্যমেই অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুল্যের অংশ বিশেষই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিতরা আত্মসাৎ করে থাকে। কাজেই, রাষ্ট্রিক সকল কর্মকর্তার সকল ব্যয়ভার উদ্বৃত্ত-মূল্য হতেই ব্যয়িত হয় ।সুতরাং-মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের অবসান করে "সাম্যবাদী সমাজ" প্রতিষ্ঠা করতে হলে সর্বাগ্রে রাষ্ট্রকেই বিলুপ্ত করা আবশ্যক । কিন্তু, রাষ্ট্র বিলোপ বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা নয় বা সেই রকম কোন বিহীতাদির ব্যবস্থা না করে অনুচ্ছেদ ১০ এ বিবৃত এতদসংক্রান্ত বক্তব্যকে কেবল অস্বীকার-অকার্যকরই নয়,বরং উল্লেখিত সংবিধান দ্বারা কার্যত উপহাস করা হয়েছে সমাজতন্ত্র - সাম্যবাদকে। অত:পর, সমাজতন্ত্রের সহিত প্রতারণামূলে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতিবন্ধক একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণে উল্লেখিত সংবিধান প্রণীত হয়েছে হেতু বাংলাদেশের সংবিধান সমাজতান্ত্রিক সংবিধান নয়।

কাজেই, বর্ণিত সংবিধানকে সমাজতান্ত্রিক সংবিধান গণ্যে কোন ধরণের আলোচনা-সমালোচনা করার অবকাশ নাই। তৎসত্ত্বেও, অত্র সংবিধানে যেহেতু বহুবার সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য আমাদের আলোচনায় " সমাজতন্ত্র" শব্দ অনিচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া- অত্র সংবিধানে এমনকি একটি আধুনিক ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবেও যেসকল মৌল নীতিমালা যেমন , উপনিবেশিক রাষ্ট্রিক কাঠামোর পরিবর্তে নতুন রাষ্ট্রিক কাঠামো বা উপনিবেশিক আইন বা কার্যবিধি বা দন্ডনীতি ইত্যাদি একদম বাতিল-রহিত করে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী নতুন নতুন আইন-কার্যবিধি বা তদানুরূপ দন্ডনীতি ইত্যকার বিষয়ে প্রকৃতই এবং কার্যতই পূর্বাপার সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি বর্ণিত হয়নি। এমনকি, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিরোধীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ সহ "মুক্তিযুদ্ধকালীন" সময়ে লুণ্ঠিত সম্পদ ইত্যাদি উদ্ধার না করার কারণে লুণ্ঠনকারী কর্তৃক ঐসকল লুণ্ঠিত সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ যেমন অটুট রাখা হয়েছে তেমন, উল্লেখিত বিষয়াদি-

(ক) অনুচ্ছেদ-৮, রাষ্ট্রীয় মুলনীতি যা, নিজেই পারস্পারিক বৈরীতা হেতু কার্যত অকার্যকর,সে সকল নীতিরও কোন কোনটির বিশেষত সমাজতন্ত্র প্রকৃতার্থে যা লেনিনীয় সমাজতন্ত্র তার সহিত বৈরী ও পরিপন্থী;

(খ)অনুচ্ছেদ-১৩, রাষ্ট্রীয়খাতের আধিপত্য সুনিশ্চিতকরণে- ৩য় শ্রেণীভুক্ত ও সীমিত ব্যক্তিমালিকানার নির্দেশনার সহিত সাংঘর্ষিক; এবং

(গ) অনুচ্ছেদ-১৫, জনগণের বেঁচে থাকার মৌলিক উপকরণ সমূহের নিশ্চয়তা বিধান ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে " পরিকল্পিত অর্থনীতি " বিনাশী হালের "মুক্তবাজার অর্থনীতির", বীজ- ব্যক্তিগত "সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার " এবং জাতীয়করণ/সামাজীকীকরণের হেতুবাদেও রাষ্ট্রের নিকট হতে সম্পত্তির " ক্ষতিপূরণ" পাওয়ার সুযোগ ও অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য ও স্বীকৃতি প্রদান বিষয়ক অনুচ্ছেদ- ৪২, এর মাধ্যমে কার্যত অনুচ্ছেদ-১৫ এ বর্ণিত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার বিপরীতে অবাধ প্রতিযোগিতার পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ নিশ্চিত করা হয়েছে বলেই জন্মলগ্নে কোটিপতি শূন্য এবং সর্বোচ্চ বিনিয়োগ সীমা ২৫ লাখ টাকা নির্ধারিত হলেও হালে কোটিপতির সংখ্যা যেমন ২০ হাজারের অধিক তেমন দারিদ্র ও বেকারের সংখ্যা অবিশ্বাস্য হারে বর্ধিত হওয়ায় উক্তরূপ বিষয়াদি অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ -২৫,২১, ২০, ১৯, ১৭,১৫, ১৩ এবং অনুচ্ছেদ-৪৭,৩২,২৭ ও ২৬ এবং অনুচ্ছেদ-৭ এর নির্দেশনার সহিত সাংঘর্ষিক বলে কার্যত বুর্জোয়াবোধের জাতিরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ-বিপন্ন, ক্ষুন্ন ও বিঘ্নকারী বিশ্ব ব্যাংক-আই.এম.এফের " ডি-ভ্যালুয়েশন"," বিজাতীয়করণ", "বেসরকারীকরণ" ও "মুক্তবাজার অর্থনীতি" বাস্তবায়নের শর্তযুক্ত ঋণের গহবরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত বলে ১৯৭৩ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ অনুন্য ১ হাজার গুণ বেশী অর্থাৎ বার্ষিক ৯ হাজার কোটি টাকার সুদ পরিশোধ সমেত মোট ১৮,৫১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দায় বহন এবং বিশ্বময় পুঁজির শোষণ-শাসন ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সৃষ্টিতে পুঁজিবাদী মোড়লদের চক্রান্তমূলক গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর দান এবং ই.পি.জেড ইত্যাদির আওতায় প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদি দ্বারা বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের অবাধ চারণ ভুমি হিসাবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হচ্ছে বলেই স্বঘোষিত বিশ্ব মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশসহ ভিন দেশী বহু রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুতগণ ভুয়া ভিয়েনা কনভেনশনের ৪১ অনুচ্ছেদকে কার্যতই ভুয়া প্রমাণ করে কনভেনশন পরিপন্থী আচার-আচরণ করাসহ বিদেশী চাকুরিজীবী অনেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরাসরি হস্ত ক্ষেপ করাসহ প্রকাশ্যে নজরদারী-খবরদারী করছে ।

ফলে- অতীতে চালু অর্থাৎ নগর রাষ্ট্র এথেন্সে, পিতৃ অধিকার ও একপতিপত্নীত্বের প্রথম ফল হিসাবে দেনাদার পিতা কর্তৃক পুত্র-কন্যা দেনার বিনিময়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিদেশে বিক্রির প্রথার ঠিক উল্টো হিসাবে বাংলাদেশের শ্রমজীবীরা নিজের টাকার বিনিময়ে বিদেশী পুঁজিওয়ালার দাস হিসাবে নিজেকে সোপর্দ করার ঘৃণ্য প্রথার অধীনস্ত হয়েছে । স্বদেশে উপযুক্ত কর্মলাভে ব্যর্থ হয়ে উপযুক্ত কর্মলাভে ও পুঁজিবাদী ধারণাবশত বিত্তবাসনা পুরণে পারিবারিক সহায় সম্পদ বিক্রি ও ধার-দেনা করে লাখ লাখ টাকা আগাম খরচ করে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশ তথা মধ্যপ্রচ্যের বাদশা-আমির সহ দুনিয়ার পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থে ও শর্তে অর্থাৎ পুঁজিওয়ালার নিষ্ঠুর শোষণের খোরাক বনে বা পুঁজির সস্তা কাঁচামাল হিসাবে বা কেবলই বায়োলজিক্যালী টিকে থাকার লড়াইয়ে শামিল হতে চাওয়া বাংলাদেশের এক বিশাল জনগোষ্ঠী বিদেশবাসী হয়ে প্রায় আদ্দিকালের দাস সুলভ জীবন গ্রহণ করতে গিয়েও পুঁজিবাদের বিভিন্ন চক্রের দ্বারা প্রায়ই প্রতারিত হচ্ছে বলে সাগরে ডুবে মরাসহ অবৈধ অভিবাসীর যন্ত্রণাদায়ক জীবন যাপন করছে " সমাজতান্ত্রিক" বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি শ্রমজীবী। অত:পর,সস্তা

শ্রমিক উৎপাদন ও সস্তা মজুরির জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশ । বাংলাদেশের অনুরূপ পরিচিতি নিশ্চিতিতে পিছিয়ে থাকে না পরস্পর বিবাদে লিপ্ত দলীয় প্রধান ও সরকার প্রধানগণ। অত:পর, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কর্তাব্যক্তিরা পরিণত হয়েছে আধুনিক দাস ব্যবসার সুপারভাইজারে। তবে, উল্লেখিত দাসদের প্রেরিত অর্থে দেশের অর্থনীতিকে যেমন সচল বলে দাবী করা হয় তেমন দাস বা দাসগোত্রীয় দেশবাসীর অবস্থা যাহাই হোক না কেন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বিশেষকে সাজানো হয় বিত্তবান নবদম্পতির ফুলশয্যার মতোই।

অনুরূপ, কমিউনিষ্ট পার্টি হিসাবে "দুনিয়ার মজুর এক হও" ধ্বনিকে কার্যকরণের বিপরীতে সাচ্চা "দেশপ্রেমিক" চীনা কমিউনিষ্টরা পুঁজি-পণ্যের বাজারের তাগিদে রাষ্ট্রিক সুসম্পর্কের অজুহাতে মুলত চীনের রাষ্ট্রিক স্বার্থ সংরক্ষণে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রের মতো নিলর্জভাবে না হলেও এ্যাকশনভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে সামরিক স্বৈরাচার পাকিস্তানী খুনি জেনারেলকে নানানভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা করার মাধ্যমে গণহত্যাকারী পাকিস্তান ও তাঁদের মুরুব্বি যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র-চকান্ত্রের অংশীদার হিসাবে গণহত্যার বিরোধীতাকারী মানুষের সহিত যেমন বেঈমানী-বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তেমন " পীড়িত পুঁজিপতির" স্বার্থ রক্ষা বা " বুর্জোয়া মুক্তির" সংগ্রামে সর্বাত্মক সমর্থন-সহযোগিতা করার লেনিনীয় নীতি- ফতোয়ারও বরখেলাপ করেছিল লেনিনবাদী মাওসেতুং সহ চীনা কমিউনিষ্টরা ।

অনুরূপ গণহত্যার সহযোগি বা খুনি ষ্ট্যালিনের অনুরাগী বলেই ষ্ট্যালিনের খুন-খারাবির ঘৃণ্য পন্থা অনুসরণ করে একদা সহযোগী লিউ সাউচি অর্থাৎ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিতে মাও বিরোধী নেতা-কর্মীদের হত্যা-খুন ও ব্যাপকভাবে দমন-পীড়ন করার জন্য স্বসৃষ্ট রাষ্ট্রকে অকার্যকর করে কথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ছুতায় সমগ্র চীনে এক ভয়ানক নারকীয় ও নৈরাজ্যিক অবস্থা চালু করে শেষত নিজ কর্তৃত্ব নিশ্চিতিতে আবারো সাংবিধানিক রাষ্ট্র গঠন করার তাগিদে এবং চেয়ারম্যান মাওবিরোধীরা আবারো ক্ষমতাশালী হতে পারে এমন আশংকায় মাও বিরোধী বা দেং পন্থীদের ঝাড়ে-বংশে দমন- নির্মুলকরণে মাওবাদীদের ভাষায় - 'পুঁজিবাদের পুন:প্রতিষ্ঠার আশংকায় এবং অনুরূপ বিপদ প্রতিহতকরণে' ১৯৭৫ সালে সি.পি.সি নেতা চিন চাং চিয়াও কর্তৃক প্রদত্ত সংবিধান সংশোধনী রিপোর্টে - "সোভিয়েট শোধনবাদী বিশ্বাসঘাতক চক্রের সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র নয়", বরং বুর্জোয়া শ্রেণী ও বুর্জোয়া পন্থীকে "দমন" করার উপযুক্ত "মেশিন" অর্থাৎ বিদ্যমান বুর্জোয়া পন্থী বা অনুরূপ পন্থার অনুগামিদের সমাজ হতে নির্মুল-দূরীভূতকরণে উপযুক্ত হাতিয়ার হিসাবে চীনা রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার অংগীকারের মাধ্যমে অতীতের ঘৃণ্য শাসক শ্রেণীর মতো বিপরীত শ্রেণী/পক্ষকে "দমন"-পীড়ন করার উপযুক্ত "মেশিন" হিসাবে "প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র" রূপ কথিত "প্রলেতারীয় রাষ্ট্র" বিনির্মাণের নিমিত্তে-ইত:পূর্বে কার্যকর চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক নির্দেশিত- প্রণীত চীনের ১৯৫৪ সালের সংবিধানটি পুনর্লিখনের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে গৃহীত সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৫ দ্বারা অপ্রধান ব্যক্তিমালিকানাকে অনুল্লেখিত রেখে "প্রধানত দুই ধরণের মালিকানা" তথা "সমগ্র জনগণের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা" ও "শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক সম্মিলিত মালিকানা" নির্দিষ্টকরণ এবং উল্লেখিত সমাজতান্ত্রিক মালিকানা অর্থাৎ লেনিনীয় " রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ"-কে অনুচ্ছেদ-৮ দ্বারা "অলংঘনীয়" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

চীনের সমগ্র মালিকানা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা অর্থাৎ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত "প্রজাতান্ত্রিক" রাষ্টের নিয়ন্ত্রক কর্তৃত্ব বিশেষসহ খোদ পার্টিতে কর্তৃত্বকারী কমিউনিষ্ট "প্রজাগণ" নিজ নিজ কর্তৃত্ব চিরস্থায়ীকরণে ব্যক্তিগত কর্তৃত্বমুলক অর্থাৎ "বুর্জোয়া" রাজনৈতিক মুল্যবোধে দলীয় পদ-পদবী সহ অন্যান্য কর্তৃত্বমুলক-সাংগঠনিক বা রাষ্ট্রিক বা উৎপাদন ও সেবাখাতের প্রতিষ্ঠান সমুহের কর্তৃত্বমুলক পদ-পদবীতে পদোন্নতি সহ স্বীয় মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ীকরণে যেমন ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও খুনা-খুনি ইত্যাদি করেছে তেমন অপ্রধান খাতের ব্যক্তিমালিকানার সুবাদে " প্রজাতন্ত্রের" অশ্রমিক প্রজাগণ নিজ নিজ মালিকানা বৃদ্ধি ও বিকাশের পক্ষে পদ-পদবী সমেত অনুরূপ "বুর্জোয়া" বোধের কর্তৃত্বকারী "কমিউনিষ্ট" নেতৃত্বের সহিত আঁতাত, যুক্ত ও জোটবদ্ধ হয়ে প্রথাগত বুর্জোয়াদের মতোই অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে প্রকাশ্যে-গোপনে সম্পত্তির মালিক বনে "দমনকারী"- "মেশিন" রূপ প্রজাতান্ত্রিক চীনা রাষ্ট্র দ্বারা কার্যত "দমন" পীড়ন করে বা উপযুক্ত পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত করে দাসানুদাসের জীবন-যাপন করতে বাধ্য করছে চীনের শ্রমিকশ্রেণীকে ।

অথচ, সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের মত পুর্নলিখনের কোন বিধান পূর্বাপর চীনের সংবিধানে না থাকলেও পুনরপি পুর্নলিখিত ও পূর্বেকার ধারাবাহিকতায় অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের রাষ্ট্রিক সুবিধায় উল্লেখিত রূপ ঘুষ-দুর্নীতি, চুরি-জুচ্চোরী ইত্যকার দুস্কর্মের মাধ্যমে অর্জিত ব্যক্তিগত পুঁজির সঞ্চয়-সঞ্চালন নিশ্চিতকরণে- ১৯৮২ সালে পরিগৃহীত ও ২০০৪ সাল পর্যন্ত সংশোধিত চীনের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩ দ্বারা ইতো:পূর্বেকার "অলংঘনীয়" "শ্রমিকশ্রেণীর সম্মিলিত সমাজতান্ত্রিক" বা " জনগণের জনগণতান্ত্রিক মালিকানা" নয় বরং সম্পদশালী চীনা প্রজা বা "নাগরিকগণের" ব্যক্তিমালিকানাকে "অলংঘনীয়" স্বীকৃতিতে ও অনুরূপ লংঘন অযোগ্য অধিকার তথা ব্যক্তিমালিকানাকে সুরক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

একই কারণে- হান রাজ বংশ বা তৎপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ডাইনেষ্টী যুগের জুরিস্প্রুডেন্স বা সিভিল ল' ভিত্তিক বংশলতিকা বা "উত্তরাধিকার" প্রথা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রিক দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক নীতি ও ব্যবস্থার পশ্চাৎগমন করে ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষা সহ সন্তান লালন-পালন করার দায়িত্ব পিতা-মাতাকে অর্পন এবং অনুরূপভাবে পিতা-মাতাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা বয়ো:প্রাপ্ত সন্তানের কর্তব্য হিসাবে চীনা সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৪৯ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

অত:পর, উক্ত অনুচ্ছেদ সম্বলিত সংবিধান গ্রহণের মাধ্যমে ফ্রে. এ্যাংগেলস কর্তৃক লিখিত " পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" গ্রন্থ, রচনা সংকলনের ২৩১ নং পাতায় বর্ণিত "উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সংগে সংগেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলি আর সমাজের অর্থনীতির একক থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালী পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে । শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা হয়ে উঠবে সামাজিক ব্যাপার, বিবাহ বন্ধনের মারফৎ অথবা তার বাইরে, শিশু যেভাবেই জন্মাক না কেন, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নেবে।" রূপ সমাজতান্ত্রিক নীতিগুচ্ছকে অস্বীকার করা হয়েছে। আবার, 'কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহারের' ১০ নং কর্মসূচী মতো বিনা খরচে সরকারীভাবে

সকল শিশুর শিক্ষা দান এবং ৩ নং কর্মসূচী মতো "সবরকম উত্তরাধিকার বিলোপ" এর নীতির কেবলমাত্র বরখেলাপ নয়, বরং জুচ্চোরি-জালিয়াতি ও প্রতারণা করা হয়েছে কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের সংগে। অত:পর, শিশুদের ভরণ-পোষণ , শিক্ষা-দীক্ষা এবং পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব ইত্যকার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনে অতীতের মতোই রক্তসম্পর্কিত ব্যক্তিগণকে দায়বদ্ধ করার মাধ্যমে চীনের জনগণকে কেবলই উত্তরাধিকারের গোলাম ও পরিবার বা রক্তের শৃংখলে শৃংখলিত থাকতে বাধ্যকরণের মাধ্যমে চীনের মানুষ জনের হিউম্যান বিয়িংয়ের বা ম্যানকাইন্ডের অংশ হিসাবে গড়ে উঠা বা বিকশিত হওয়ার পথে চীনের প্রাচীরের মতোই প্রাচীর সৃষ্টি করা হয়েছে।

অত:পর, সামন্তবাদী-পুঁজিবাদী উত্তরাধিকার রক্ষা করাসহ উল্লেখিত অনুচ্ছেদ সমূহ দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে প্রায় অলংঘনীয় করা হয়েছে। সুতরাং, মাওয়ের "সমাজতান্ত্রিক" চীনে এখন অগুণতি মিলিয়নিয়ার ও বহু বিলিয়নিয়ারের সহিত অসংখ্য মজুরি দাস -বেকার ও অনেক ভিখারি পারস্পারিক বৈপরিত্য ও বিরোধীতাসহ যুগপৎ অবস্থান করছে। ফলে- বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত ২০০৮ সালের অলিম্পিক গেইমসের বিস্ময়কর জৌলস ও চোখ ধাঁধানো চাকচিক্যের ব্যয়বাহুল্যের বহুতল বিপনীর পাশাপাশি বিশাল গ্রামীণ চীনের দুর্গম অঞ্চলের আধুনিক যোগাযোগহীন, বিদ্যুৎ হীন, প্রকৃতি নির্ভর জীর্ণ-শীর্ণ,বসবাসের অযোগ্য বসত বাড়ী সমেত স্কুলভবন এবং ততোধিক নোংরা-ভাংগাচুরা আসবাবসহ দ্রারিদ্রতার আফ্রিকান প্রতিচ্ছবি রূপ পুষ্টিহীন শিক্ষক-ছাত্রের নিকট মহামূল্যবান সম্পদ তথা লেখার চক বিশেষ সংরক্ষণের স্বযত্ন প্রয়াশের জীবন্ত চিত্র ও নাজুক সংবাদের উৎকৃষ্ট নজির বটে চীনেরই বিখ্যাত ছবি-" নট ওয়ান লেস"।

অথবা, চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির দীর্ঘ লংমার্চ, যুদ্ধ সহ ১৯৪৯ সালে মাওদের ক্ষমতা দখলে স্বক্রিয় অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানে যোগ্য ও উপযুক্ত হলেও মাওয়ের মালিকানাধীন চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক নির্মিত উল্লেখিত দমনমূলক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে -উৎপাদনশীলতায় "অযোগ্য-অদক্ষ ও অমনোযোগী বা অসৎ" শ্রমিকশ্রেণীর দায়ে ফি-বছর লোকসান দেওয়া একদা "অলংঘনীয়" রাষ্ট্রিক সম্পত্তি বিশ্ব ব্যাংক-আই. এম. এফ বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শর্তে ও দেশী-বিদেশী পুঁজিওয়ালাদের স্বার্থে-উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ বা বিরাষ্ট্রীয়করণের ফতোয়ায় দেদারছে বন্ধ,বিক্রি, লিজ ও হস্তান্তর হচ্ছে।

তথাকথিত সভ্যতার স্মারক হিসাবে চিহ্নিত আদিম গণতন্ত্রের রাষ্ট্র- এথেন্সের সভ্যতা ও সমৃদ্ধির অংগ ও উপাদান -পরিবার বহির্ভূত "হেটায়ের" অর্থাৎ মুক্ত নারীর গণিকাবৃত্তিসহ পরজীবীতার চিরাচরিত নিয়ম-নীতি মতো,পুঁজির অনুসংগ ও সহগ সাধারণ সম্পদের স্বার্থপর লুণ্ঠন, জঘন্য লালসা,হীনলোভ, পাশবিক কামনাবৃত্তি , চৌর্যবৃত্তি, হত্যা-খুন ও ধর্ষণ এবং প্রতারণা-জালিয়াতি, প্রবঞ্চণা ও বেঈমানিসহ সকল প্রকার অনিয়ম-দুর্নীতি ও অনাচার সমেত বহু অনাচারকারী -দুর্বৃত্ত মহাদাপটে চীনে বসবাস করছে বলে উত্তরাধিকার সমেত সম্পত্তিবানদের স্বার্থ রক্ষক- চৈনিক রাষ্ট্র এবং ধনবান অধিশ্বর সহ কমিউনিষ্ট নামের 'রাজ-রাজ্যেশ্বরের চীনা পার্টি রাজের' প্রতি বিক্ষুব্ধ শ্রমজীবী জনগণকে দমন-পীড়ন এবং প্রতিপক্ষ ও পরাজিত পক্ষকে নির্মূল ও নিশ্চিহ্নিকরণে সম্রাট হাম্মুরাবীর পন্থা অর্থাৎ নাকের বদলে নাক ও চোখের বদলে চোখ বা "শত্রুর শেষ

রাখতে নাই" রূপ চানক্য দন্ডনীতি অনুসরণ এবং বহু ধরনের সনাতনী দন্ড সহ ব্যাপক মাত্রায় মৃত্যুদন্ড প্রদান ও কার্যকরণে, ২০০৬ সালেও দুনিয়ার সেরা রাষ্ট্র হিসাবে চীন গণ্য হয়েছে বলেই কারো কারো মতে রেড ক্যাপিটালিষ্ট চীন হতে রাষ্ট্রিকভাবে শিশু-রুগ্ন ও বৃদ্ধের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালন সহ জনকল্যাণের নিরিখে হালের ইউরোপীয় দেশ গুলো এখন অনেক বেশী মাত্রায় সমাজতান্ত্রিক।

পুঁজিবাদী আমেরিকার সংবিধানে ব্যক্তিমালিকানাকে " অলংঘনীয়" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি বিধায় চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি নামক সংগঠন কর্তৃক শাসিত-নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত চীন, পুঁজির স্বার্থ রক্ষা ও সংরক্ষণে পুঁজিবাদী আমেরিকা হতে অধিকতর ক্ষমতাবান ও যোগ্য ঘোষিত হয়েছে হেতু ভারতীয় পুঁজিওয়ালারা চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি ও তুলনামুলক কম মজুরীর উৎপাদন ব্যবস্থার ভূয়শী প্রশংসা করতে কার্পণ্য করছে না বা ক্ষুদে বাংলাদেশের পুঁজিপতিরাও হালে চীনে বসতি গাড়ছে । আবার সমাজতন্ত্রের নামাবলী পরিহিত বাংলাদেশও দুনিয়ার পুঁজিওয়ালাদের অবাধ চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। অত:পর, ব্যক্তিমালিকানার সুবাদে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ ও আমদানীতে বা পুঁজির স্বেচ্ছাগমনে অধিকতর উৎসাহ সৃষ্টিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি-দলীয় সরকার ও প্রধান ধারার রাজনৈতিক দল সমুহের পুঁজিবাদের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য স্বপ্রমাণে চীনের মতোই বাংলাদেশের সংবিধান ও দলীয় নীতি হতে "সমাজতন্ত্র" ছাঁটাই- বিলীন ও বর্জন করা সহ গৃহীত ব্যবস্থাদি দ্বারা দেশী-বিদেশী পুঁজির নিরঙ্কুশ স্বার্থ ও আধিক্য-কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণে বিজাতীয়করণ ও বেসরকারিকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্তখাত তথা রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের স্থলে মুক্তবাজারী বা প্রাইভেট খাতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পাকাপোক্ত বা ক্ষেত্রবিশেষ দেশীয় পুঁজি হতে বিদেশী পুঁজিকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩কে অমান্য ও লংঘন এবং অকার্যকর করে বিনিয়োগের সীমা সংক্রান্ত নীতি দুরীকরণসহ ইত:মধ্যে সংশোধিত শিল্প নীতি-১৯৭৫,নয়া শিল্প নীতি-১৯৮২, সংশোধিত শিল্প নীতি-১৯৯১, শিল্প নীতি-১৯৯৯, পাট নীতি-২০০২, শিল্পনীতি-২০০৫ সহ নানান সরকারী নীতি এবং বেসরকারীকরণ আইন-২০০০ ও বেসরকারীকরণ বিধিমালা-২০০১ বাংলাদেশে প্রণীত হয়েছে ।

তদপুরি,শ্রমজীবী জনগণকে ব্রিটিশ আমলের তুলনায় অধিকতর মাত্রায় শোষণের নিমিত্তে ব্রিটিশ কর্তৃক প্রণীত ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনে-নির্ধারিত মেয়াদে শ্রমিকের মজুরি ও সমুদয় পাওনাদি পরিশোধে ব্যর্থতা দন্ডযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হলেও তেমন দন্ডের দায় হতে মালিক -কর্তৃপক্ষকে অব্যাহতি প্রদানে "বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬" চালু করেছে।

লেনিনের সংবিধান যেমন হাম্মুরাবীর সংবিধানের তুলনায় জঘন্য তেমন লেনিনবাদী-ষ্ট্যালিনপন্থী মাওয়ের কর্তৃত্ব রক্ষায় ও কর্তৃত্বাধীনে প্রণীত ১৯৭৫ সালের গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের সংবিধান লেনিনীয় সংবিধানের ধারাবাহিকতার বিপরীতে যেতে পারে না বলেই একদিকে যেমন বাংলাদেশের অগণতান্ত্রিক সংবিধানের তুলনায়ও জঘন্য অন্যদিকে লেনিনের দাসতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো যে, সাধারণতন্ত্রের আবরণে দাসতান্ত্রিক চীনা রাষ্ট্র গঠন করার জন্যই ১৯৭৫সালেও চীনা সংবিধান প্রণীত হয়েছে তা প্রমাণে উল্লেখিত সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদ মাত্র আলোচনা করা হল-

(ক) বুর্জোয়ারা এমনকি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতারাও সুকৌশলে রাষ্ট্রকে সকলের মালিকানাধীন অর্থে সকলের সমসুযোগ বা সকলে আইনের দৃষ্টিতে সমান বলে কার্যত ব্যক্তিমালিকানার সুবাদে প্রকৃতই আধিপত্যকারী পুঁজিপতিশ্রেণীর কর্তৃত্ব ও আধিপত্যকে কাগজে-কলমে আড়াল ও গোপন করে পিপলস রিপাবলিক ষ্টেট হিসাবে সংবিধানে বর্ণানা করলেও চীনের সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদ এই: " The people's Republic of China is a socialist state of the dictatorship of the proletariat led by the working calss and based on the alliance of workers and peasants."

অত:পর, প্রারম্ভেই পরিস্কার থাকা ভাল যে, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের সুত্রানুসারে কৃষক নয় শ্রমিকশ্রেণীই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির কাজ তথা সাম্যবাদের ভিত্তি-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতান্ত্রিক নীতি বাস্তবায়ন করে বিধায় কৃষকদের মৈত্রীর ভিত্তিতে মাওয়ের চীনা রাষ্ট্র গঠিত হেতু কেবলমাত্র কৃষকের মৈত্রী উপরন্ত রাষ্ট গঠনকারী দলিল হিসাবেই অত্র সংবিধান সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংবিধান হতে পারে না বা তদমর্মে গণ্য ও বিবেচিত হতে পারে না বলে অত্র সংবিধানে যাহাই বর্ণিত আছে তাহাই যে, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক বা কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের সহিত সামঞ্জস্যহীন তা নতুন করে বলার আবশ্যকতা নাই। তবু, দু' কটি উপমা বা তুলনা হয়তো করা যেতেই পারে।

শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের রাষ্ট্র হলে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অপরাপর জনসমষ্টি নিশ্চয়ই অধীত শ্রেণী হিসাবে বৈয়াকরণিকভাবেই গণ্য নির্ণিত ও চিহ্নিত হয় বলেই বুর্জোয়া অর্থেও চীন, পিপলস রিপাবলিক ষ্টেট হতে পারে না। আবার রাষ্ট্রের ভিত্তিটা যদি হয় শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী জোট তা-হলেও কি শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য নিশ্চিত হয় না কি অধীত কৃষক তার আধিপত্যকারী শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হতে পারে? আইনাষ্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব কি ভুল? নাকি. মার্কসের অনাপেক্ষিক সুত্র ভুয়া? ইংলন্ডের বুর্জোয়াশ্রেণী কি নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতায় কৃষককে ভূমিহীন সর্বহারায় পরিণত করেছে তার নির্ভুল বয়ান পুঁজি গ্রন্থে মার্কস হাজির করেছেন। অথবা, পুঁজির তাড়ায় দিশেহারা আইরিশ চাষী প্লেগে মরা সহ যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যাওয়া বা ভারতের অর্ধবর্বর ভূমি ব্যবস্থাকে তছনছ করে ভূমিকে বাণিজ্যের উপকরণে পরিণত করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কি হারে মুনাফা অর্জন সহ দুর্ভিক্ষ-মহামারি সৃষ্টি করে ভারতে পুঁজিবাদের প্রসার ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে মার্কস-এ্যাংগেলস দু'জনেই প্রচুর তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণাদি যোগে বহু লেখা-লেখি করেছেন যা জনাব মাওয়ের না জানার কথা নয়। এবং জার্মানীতি কমিউনিষ্টদের কর্মসূচিতেও যেমন ভূ-স্বামিদের ভূমি বাজেয়াপ্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করতে মার্কসরা বলেনি তেমন পুঁজিবাদের কারণেই কৃষি হতে উৎখাত হওয়া বা ভূমি হারানো চাষীদের ভূমি পাওয়ার আকাংখা ও চাহিদার নিরিখে পুঁজিবাদের বিরোধীতাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে নিশ্চিত করা আছে।

অত:পর, পুঁজিবাদ যাকে উৎখাত করেছে বা পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় যার বিনাশ অনিবার্য এবং যাকে স্বপেশায় ফিরিয়ে আনার দাবী অবৈজ্ঞানিক এবং যা অসম্ভব অর্থাৎ সেই হারিয়ে যাওয়া বা মৃতপ্রায় কৃষককে পুনর্জীবীত করা কেবলই কি প্রতিক্রিয়াশীলতা না কি রাষ্ট্রিয় কর্তৃত্বমুলে বা দাসত্বের কঠিন-কঠোর নিগড়ে ভূমিতে চাষীকে আবদ্ধ ও বন্দী করে কৃষি অর্থনীতি হতে অধিকতর উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্ন ও অধিকতর হারে উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের কৌশলী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র মাত্র?

(খ) দাস বা সামন্ততন্ত্রে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ডিভাইন রাইট হোল্ডার, পুঁজিবাদে নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত। অথচ, অনুচ্ছেদ, ২ এ বলা হয়েছেঃ " The Communist party of China is the core of leadership of the whole Chines people. --------- ..... Marxism-Leninism –Mao Tse Tung Thought is the theoretical basis guiding the thinking of our nation."
অর্থাৎ নাগরিকগণ কর্তৃক অনিবাচিত মাওয়ের কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃত্ব চীনা রাষ্টকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে। আর চীনের শ্রমিকশ্রেণী নয় বরং চীনা ন্যাশন মাওয়ের চিন্তা দ্বারা গাইডেড হবে। তবে প্রকৃতার্থে শ্রমিকশ্রেণী স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বিশেষ প্রতিভার ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হওয়া শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থের পক্ষে যেমন শুভকর নয় তেমন শ্রমিকশ্রেণীর উপযুক্ত ও যোগ্য এবং শোভনীয় কর্ম নয়। উল্লেখ্য "পদোন্নত পিতা" এবং " মহান শিক্ষক" আব্রাহাম হিব্রু জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়া ও জাতিটিকে দুনিয়াময় বিস্তৃত করার পরলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা ডিভাইন রাইটহোল্ডার।

কিন্তু, চীনা কমিউনিষ্ট মাওতো জাগতিক তদুপরি তিনি লেনিনের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ঘোরতর সমর্থক, অত:পর, চীনের কোন জাতির তিনি গাইড ? উল্লেখ্য- চীনের প্রায় ৫৬ টি জাতির মধ্যে হান নদী তীরবর্তী হান ডাইনেষ্টোর হান জাতি যা, চীনের মোট জনসংখ্যার ৯১.৫৯% এবং যারা যেমন ড্রাগনের তেমন ডিভাইন ফারমার ও ট্রাইবাল চীপ -শেন্নেংজ এবং এম্পেরার ইয়ান এর বংশধর। আবার, উক্ত সংবিধানটির প্রিম্বেল সহ অনুচ্ছেদ ৪ এ বলা হয়েছে চীন হচ্ছে বহুজাতিক রাষ্ট্র। তা-হলে আজীবন চেয়ারম্যান মাও কি চীনের সকল জাতির গাইড তথা চীনা কমিউনিষ্ট ডাইনেষ্টীর ডিভাইন ফারমার বা অবতার? অনুচ্ছেদ ২ দ্বারা চীনের বহু জাতির কথা কিন্তু স্বীকার করা হয়নি । তবে, মাও যে, হান জাতির ডিভাইন ফারমার শেন্নেংজ এর একালের প্রতিরূপ তাতো নিশ্চিত করেছে তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কালে গৃহীত ও পরবর্তীতে পরিত্যাক্ত জাতীয় সংগীত-"দি ইষ্ট ইজ রেড"।

"গ্রেট সেইভার" মাওয়ের চিন্তা-চেতানা জানা ছিল - আনা লুইস ষ্ট্রংয়ের। মাওয়ের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে- আনা লিখেছিলেন- " The Thought of Mao Tse-tung" and " Dawn out of China" . তাতে-মাওয়ের চিন্তাধারা বিষয়ে আনা লিখেছেন- " to Change Marxism from European to An Asiatic form, in ways of which neither Marx nor Lenin could dream."

(Source- Wikipedia)

(গ) যেমন লেনিন তেমন তাঁর খাস সাগরেদ বলেই মাও চীনা জনগণের ক্ষমতা বিষয়ে অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদে-৩ এ লিখেছেন-" The organs through which the people exercise power are the peoples congresses at all levels, with workers, peasants and soldiers as their main body."

অর্থাৎ লেনিনের সংবিধান যা বর্বর হাম্মুরাবীর সংবিধানের চেয়ে জঘন্য লেনিনের সেই জঘন্যতম সংবিধানের নকলীকরণে শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু, লেনিনের সংবিধানে যেমন রাষ্ট্রকেই শ্রমিক-কৃষক ও সৈনিক সোভিয়েতের রাষ্ট্র বলা হয়েছে এক্ষেত্রে অর্থাৎ অত্র সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে সৈনিকদের মিত্রতা বা জোট ভিত্তিক রাষ্ট্র বলা হয়নি। অথচ, সৈনিকরা অস্ত্রধারী বলে নিরস্ত্র শ্রমিক-কৃষক নয় কার্যত সমরাস্ত্রের চিরাচতির ব্যাকরণ মতো অস্ত্রের বলেই চীনা রাষ্ট্রটি সৈনিকদেরই রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হয়েছে। বিশেষত অনুচ্ছেদ -১৫ দ্বারা যখন নিশ্চিত করা আছে যে, " The Chairman of the Central Committee of the Communist Pary of China commands the country's armed forces." উল্লেখ্য-পার্টি চেয়ারম্যানশীপের কর্তৃত্ববলে মাও সেতুং ১৯৪৩ হতে ১৯৭৬ সাল অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত চীনের " চেয়ারম্যান অব দ্যা সেন্ট্রাল মিলিটারী কমিশন" ছিলেন। অত:পর, মস্কো হতে লেনিনবাদের তালিমলাভকারী, চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠাকালীন মাওয়ের দোষর ও চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক ও সহ সভাপতি, হাউ টু বি এ গুড কমিউনিষ্ট পুস্তকের লেখক, রুশ-চীন বির্তকে মাও চিন্তাধারা ব্যাখ্যাকারী ও দৃঢ় সমর্থক তবে মাও কর্তৃক বুর্জোয়া রোডার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রাষ্ট্র ও দলীয় পদ হারানো এবং চীনা রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট লিউ সাউচি এবং কালো-ধলা না বেছে কেবলই ইঁদুর মারার বিড়াল সন্ধানী চীনা পার্টি সেক্রেটারী দেং গয়রহরা পাটির পিকিং কংগ্রেসে জয়লাভ করা সত্ত্বেও কংগ্রেসে পরাজিত ও পরিণতিতে চীনের রাষ্ট্রপতি পদ হারানো তবে সাংঘাতিক প্রতিহিংসা পরায়ন গ্রেট টিচার মাওয়ের গুন্ডা বাহিনীর নিকট কেন পরাজিত ও নিহত হয়েছিল বা মাওয়ের জীবৎকাল পর্যন্ত চীনা রাষ্ট্র কেন মাওয়ের অনুগত ছিল তাও বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অত:পর, প্যারী কমিউনের সাথে কোন মিল বা সামঞ্জস্য আছে কি ? তবে, বাংলাদেশের সংবিধানে এমন জঘন্য গণবিরোধী অনুচ্ছেদ নাই। এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দল বিশেষের প্রধান সেনা কমান্ডার নয়। এমনকি, জুলিয়াস সিজারের মেয়াদকাল পর্যন্ত রোমান রিপাবলিকেও সেনা ডিরেক্টর নির্বাচিত হত কেবলমাত্র ১ বছরের জন্য। রাজতান্ত্রিক সামন্ত্রতন্ত্রে সামন্তপতি যেমন পদাধিকারেই সেনাপতিও তেমন চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান কার্যত পার্টির ওনার বা হাসবেন্ড তথা পার্টিপতিই লেনিনবাদী চীনা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরও প্রকৃত পতি এবং সেনাপতিও ঠিক যেমনটা ছিলেন চীনা হান বা ক্যুইন সম্রাটগণ ।

বাস্তবে না হলেও সাংবিধানিক ভাবে বাংলাদেশের জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। অত:পর, আইন প্রণয়ণ ও নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব পালনে সরকার গঠনকারীগণ নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়াই বিধান। কিন্তু মাওয়ের রাষ্ট্রে গণপ্রতিনিধিগণের নির্বাচন বিষয়ে উক্ত অনুচ্ছেদ-৩ বর্ণিত এই: "Deputies to the peoples congress at all levels are elected through democratic consultation." অত:পর,চীনের রাষ্ট্রপতি বা পার্টি সেক্রেটারী বা চীনের ক্ষমতা দখলে মাওয়ের অন্যতম প্রধান কমান্ডার হওয়া সত্ত্বেও যখন তাদেরকে রেড গার্ডের পিটুনি খেয়ে বা বন্দী অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মরতে হয় বা শ্রম শিবিরে যেতে হয় বা মাওয়ের গুন্ডাবাহিনীর ভয়ে প্রবীন পার্টি নেতাদেরও আত্মহনন করতে হয় তখন আমৃত্যু সেনাপতি মাওয়ের চীনে প্রকাশ্যে অস্ত্রধারী বা পার্টি গুন্ডাদের সামনে পার্টি মোড়লদের ইচ্ছা/অনিচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলবে বা মতামত দিবে এমন গণতান্ত্রিক বা দু:সাহসিক ব্যক্তি/বীর চীনে নিজ মাথা সহ বেঁচে থাকার সুযোগ আছে কি ?

(ঘ) চীনা শ্রমিকশ্রেণী বা কৃষক বা মজুরদের মজুরি বিষয়ে বা তদ্রুপ নীতি বা মজুরি নির্ধারণে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা ইত্যকার বিষয়ে লেনিনের মতোই নিশ্চুপ থেকে চীনা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬ মোতাবেক রাষ্ট্রিয় মনোপলির আধিক্য সুনিশ্চিত করে লেনিনের ঘৃণ্য -বর্বর নীতি মতোই মাওয়ের চীনও অত্র সংবিধানের ৯ নং অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছে এই : " He who does not work, neither shall he eat." কিন্তু মাওয়ের মতো রাষ্ট্রজীবীরা যারা, কেবলই রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক কাজের ছুতায় এবং কোন প্রকার মুল্য উৎপন্ন না করে কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নকারী শ্রমিকশ্রেণীর উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাত করেই রাজকীয় জীবন যাপন করতো তাঁরা কিন্তু অত্র অনুচ্ছেদের আওতাভুক্ত নয়। একটি বিষয় আবারো উল্লেখ্য- উৎপাদন উপকরণের মনোপলি তা হোক ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রিক তা-যে, সমাজতন্ত্র নয় বরং শ্রমিকশ্রেণীর সকল দু:খ-দর্দশার কারণ এবং মনোপলির বিপরীতে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠাই যে কমিউনিষ্ট লীগ ও ১ম আন্তর্জাতিকের উদ্দেশ্য ছিল তাতো উদ্ধৃত হয়েছে মার্কসদের লেখনীতেই। তবু, সাধারণ মালিকানার ধারে কাছেও নয় কেবলই রাষ্ট্রিক মনোপলি কায়েম করেই লেনিন-ষ্ট্যালিন বা মাও এবং মাওবাদী-লেনিনবাদী মোড়লরা প্রতারণা-জালিয়াতি, বজ্জাতি - ভন্ডামি ও প্রবঞ্চনা বৈ আর অন্যকোন ভাবে মার্কসের নাম ব্যবহার সহ সমাজতন্ত্রের মুখোশ পড়তে পারে কি?

(ঙ) পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম ও বিকাশে সেক্সের প্রয়োজন হয়নি। মানব জাতির দীর্ঘ জীবনে ' জেন্ডার' শব্দ তৈরী হওয়ার সুযোগ ছিল না। দাস-প্রভুর সম্পর্ক এবং বিশেষত সম্পত্তির উত্তরাধিকার জনিত কারণে প্রভুগোত্রীয়রাই পরজীবীতার হীন স্বার্থে জেন্ডার শব্দের উদ্ভব ঘটিয়ে নারীকে আজন্ম পাপী ও "গেইট অব সিন"গণ্যে এবং গৃহবন্দী করে কেবলই স্বামির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে বাধ্য করে মুলত প্রভুর সম্পত্তি রক্ষায় প্রভুর উত্তরাধিকার নিশ্চিতিতে একপতি-পত্নি বিবাহ প্রথা চালু ও তা বহাল রাখার জন্য যাবতীয় কল্পকথা, আইন-নীতি ও বিধি-বিধান জারী ও কার্যকরী করে আসছে। অত:পর, শ্রেণী বিভাজন হতে উদ্ভুত জেন্ডার শ্রেণীহীনতায় মিলিয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। মার্কসরা বিশেষত এ্যাংগেলস প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সমেত প্রমাণ করেছেন বিবাহ কেবলই সম্পত্তি জনিত হেতুবাদে টিকে আছে যদিচ, বুর্জোয়া ব্যবস্থা বিবাহ ও পরিবার প্রথাকে ভেংগে তছনছ করে দিয়েছে। এবং সমাজতন্ত্রে শ্রেণী ও রাষ্ট্র যেমন ব্যক্তিমালিকানার সাথে লোপ পাবে তেমন শ্রেণী স্বার্থ রক্ষায় প্রতিষ্ঠিত পরিবার ও উত্তরাধিকার প্রথাও বিলোপ হবে। মানুষ হবে স্বাধীন ও মুক্ত অর্থাৎ প্রত্যেকেই মানুষ কেহই নয় জেন্ডার বৈরীতার নারী বা পুরষ ।

সুতরাং- শ্রেণী বিলুপ্তির শর্তে 'জেন্ডার' শব্দও ভাষা হতে যেমন বিলুপ্ত হবে তেমন শিশ্ন ও যোনির কল্পিত এবং ঘৃণ্য রাজনৈতিক সত্ত্বা বিলীন হবে এবং প্রকৃতই ও বস্তুতই -মানুষ শুধুই মানুষ হিসাবে পরিচিত হবে ।

পুঁজির স্বার্থে বুর্জোয়ারাও জেন্ডার বিনাশী নয়, তবে বিভ্রান্তি ছড়াতে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতারণামুলক চরিত্র জনিত কারণেই পুঁজিবাদও মেকি জেন্ডারের মেকি সাম্য বা জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি চায়। লেনিনও জেন্ডার বৈরীতা ও বৈষম্য অব্যাহত রেখেছিল। তবু লেনিন এবং লেনিনবাদীরা জেন্ডার ইক্যুটির মাধ্যমে নারী মুক্তি চায়। আসলে শ্রেণী মুক্তির

প্রশ্নটিকে তাঁরা কৌশলে আড়াল করে সাধারণ্যে গুলিয়ে ফেলে বা শ্রেণী মুক্তির শর্তেই যে, কেবল নারী মুক্তি নয় বরং বর্বর পুরুষ শব্দের বিলীন ঘটিয়ে ঘৃণ্য জেন্ডারের কবল হতে মানবমুক্তি নিশ্চিত করতে হবে তা নিদারুনভাবে ভুলিয়ে দিয়ে শ্রমশক্তি বিক্রেতা শ্রমিককেও কেবলই জেন্ডার ভিত্তিতে নারী-পুরষ গণ্য করে শ্রমিকের শ্রম শক্তি শোষণের বিষয়টি বিকৃত করে বুর্জোয়াদের মতোই জেন্ডারের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ-বিভাজন করার প্রতিক্রিয়াশীল ধারণায় কেবলমাত্র জেন্ডারের হেতুবাদে মানুষকে মানুষের অধীন বা মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব বজায় রাখতে নারীকে পুরুষের অধীন করার কারণে সৃষ্ট নারী-পুরষের বৈষম্য-বৈরীতা ও বিরোধীতাকে শ্রেণীগত সমস্যার ফসল হিসাবে চিহ্নিত না করে কেবলই অংগ বিশেষের জন্য দাসতন্ত্রে প্রভুরা যেমন ক্ষমতাধর বীর বনেছে তেমন বুর্জোয়ারাও শোষণ মুলক ব্যবস্থা বজায় রাখতে শোষণের মুল উৎস বা গোপন রহস্য তথা উদ্বৃত্ত-মুল্য তত্ত্ব জানা হতে শ্রমিকশ্রেণীকে বঞ্চিত রাখতে শিশ্নধারী শ্রমিককে যোনি ধারী শ্রমিকের শত্রু গণ্যে মুলত শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছে মর্মে লেনিন ও লেনিনবাদীরা পুঁজিবাদ রক্ষা ও সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত ও বিলম্বিতকরণে জেন্ডার ইক্যুটির দাবীতে পৃথকভাবে নারী মুক্তি বা নারীর ক্ষমতায়নের অজুহাতে নারীকে মানুষ নয়, কেবলই উদ্বৃত্ত-মুল্য উৎপন্নে যোনীধারী মানবিক যন্ত্র আর মান্যবর মাও নারীকে জনশক্তির মহান উৎস হিসাবে স্থির ও তদানুরূপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে মেকিভাবে বিভক্ত ও বিভাজিত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

যদিচ, শিশ্নধারী কি যোনিধারী শ্রমিক তারা কেউ কারো শ্রম শক্তির ক্রেতা নয় বা শ্রম শক্তি বিক্রেতা বৈ ক্রেতা হওয়ার সুযোগ থাকলে আর শ্রমিক হয় না বলেই শ্রম শোষণের প্রক্রিয়ায় শ্রমিকশ্রেণী যুক্ত-জড়িত নয় বা তদ্রুপ থাকার সুযোগ নাই।

কাজেই, পরস্পরের মধ্যে শ্রমশক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কহীন শ্রমিকশ্রেণী কেবলমাত্র শিশ্ন বা যোনির কারণে কেউ কারো শোষক নয় হেতু শত্রুও নয়। বুর্জোয়ারা পরজীবী যোনীধারীদের দেহ ক্রয় করে বলে আদি স্বভাবদোষেই শিশ্নধারীরা নিজেদেরকে যোনীধারীর একদিকে প্রভু অপর দিকে নিজের উত্তরাধিকারের মহান ভান্ডার হিসাবে যোনিধারীকে দাসী ও সম্ভোগ সামগ্রী এবং সম্পত্তি গণ্য করেও কেবলই শোষিত-প্রবঞ্চিত ও তদার্থে প্ররোচিত করণার্থে অনুরূপ দাসীবৃত্তির মহিমা কীর্তনে প্রসুতিকে পুঁজনীয় করে তোলে বলেই বুর্জোয়া ব্যবস্থা এক্ষেত্রেও মুলত ডাবল ষ্ট্যান্ডধারী হেতু বুর্জোয়ারাও বর্বরতো বটেই সাবেকী রাজাদের মতোই দ্বিচারী ও ভন্ডই । তবে, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া সমাজে বসবাস করে বলে বুর্জোয়াবোধে আক্রান্ত শ্রমিকও নারী-পুরুষের তথা জেন্ডারের বর্বর ও হীন মানসিকতা পোষণ করে না এমন নয়।

কিন্তু, জেন্ডারের অনুরূপ ঘৃণ্য বোধ নিরসন নয় বরং জিয়িয়ে রাখতেই লেনিনবাদীরা বুর্জোয়াদের মতোই নারী মুক্তির আওয়াজ তোলে; তবু তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির দিশারী ও কান্ডারী? তাছাড়া- শ্রমশক্তি ক্রেতা কেবলই শিশ্নদারী নয়, যোনিধারীও আছে । কাজেই, যোনিধারী পুঁজিপতি পুঁজিবাদী সমাজের নিয়মেই যেমন শিশ্নধারী শ্রমিককে তেমন যোনিধারী শ্রমিককেও শোষণ করা বৈ যোনিধারী শ্রমিককে যেমন রেয়াত বা

খাতির করে না তেমন শিশ্নধারী শ্রমিকদের সহিত অধিকমাত্রায় শত্রুতা করে না। বরং, অবৈজ্ঞানিক জেন্ডারবোধে যোনিধারীকে দুর্বল-অসহায় গণ্যে যেমন লেনিন পুরুষ অপেক্ষা কম ভূমি প্রদান করেছিলেন তেমন যোনিধারী শ্রমশক্তি বিক্রেতাকে শিশ্নধারী পুঁজিপতির মতোই কম মজুরি প্রদানে যোনিধারী পুঁজিপতিও খোদ লেনিনের পদাংক অনুসরণ করতেই সমধিক পছন্দ করে বিধায় পুঁজিপতির সহিত বিরোধটা শিশ্ন বা যোনির নয় হেতু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রমিকের বলেই পুঁজিবাদের সহিত সমাজতন্ত্রের বিরোধের হেতুবাদে জেন্ডার ইক্যুয়ালিটির তথাকথিত নারী মুক্তি নয় বরং অর্জিত হবে শ্রেণীমুক্তি তথা মানবমুক্তি বলেই বিলোপ হবে শ্রেণী বৈরীতা প্রসূত অসভ্য জেন্ডারবোধ।

উল্লেখ্য,সম্ভোগ-রমন, সন্তান জন্মানো ইত্যাদিতে ঘৃণ্য জেন্ডার বোধের শিশ্ন বা যোনি সাধারণভাবে শ্রমশক্তি বিক্রেতার সমস্যা নয় বরং যোনিধারী শ্রমিকদের কেবলই সাবেকী আমলের মতো কেবলই অসহায়-অবলা ও অরক্ষণীয়া ঠাওরিয়ে কম দামে শ্রমশক্তি ক্রয় করার ফন্দি-ফিকির করে থাকে নারী-পুরষ নির্বিশেষে সকল পুঁজিপতি অর্থাৎ অনুরূপ ধান্ধাবাজি-প্রতারণায় ওস্তাদ বটে পুঁজিপতিশ্রেণী। কাজেই যোনিধারী শ্রমশক্তি বিক্রেতা ঠকে বা প্রতারিত হয় শ্রম শক্তি ক্রেতা অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণীর দ্বারাই। অত:পর, যোনিধারী ব্যক্তি যখনই শ্রমশক্তি বিক্রি করতে যায় তখনই সে ঠকে এবং তাঁর উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করে কেবলমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণী। অত:পর, শিশ্নধারী শ্রমিকের মতোই যোনিধারী শ্রমিকও ঠকে-প্রতারিত হয় কেবলই বুর্জোয়াশ্রেণীর নিকট বলেই শিশ্ন বা যোনিধারী শ্রমিক নির্বিশেষে সকল শ্রমিকের শোষক কেবলই পুঁজিপতিশ্রেণী বলেই কেবলমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণীর বিনাশ অর্থাৎ শ্রমশক্তি ক্রয়-বিক্রি এবং পণ্য উৎপাদন ও পণ্য বিক্রির পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসানে তথা বেচা-কেনা মুক্ত সামাজিক ব্যবস্থার পত্তনের শর্তেই সম্পত্তি গণ্যে সম্ভোগ সামগ্রী রূপ স্ত্রী পরিচয়ের কলংক ঘুচিয়ে যেমন যোনিধারী তেমন সম্ভোগে ও সম্পত্তিতে স্বামীত্বের ও প্রভুত্বের অসভ্য-বর্বর পুরুষ পরিচয়ের বর্বরতা ও জঘন্যতা ঝাড়েবংশে বিসর্জন দিয়ে শিশ্নধারী পরিণত হবে মানুষে এবং তখনই সকলেই কেবলই মানুষ অর্থাৎ প্রত্যেকে স্বাধীন-মুক্ত মানুষ ।

শ্রমজীবী মানুষ পরজীবী বা পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধাভোগীদের মতো নারী-পুরুষের সমস্যাক্রান্ত নয় বা শ্রমিকশ্রেণীর বক্তিগত সম্পত্তি নাই হেতু উত্তরাধিকার সমস্যায়ও শ্রমিকশ্রেণী আক্রান্ত নয় অথবা, শ্রমিকশ্রেণীর কোন মানুষই সাবেকী মূল্যবোধের ব্যাধিতে খানিক আক্রান্ত হলেও শ্রমজীবীতার কারণেই বা প্রত্যেকেই নিজের শ্রমশক্তির বিক্রিত অর্থে জীবন-যাপন করে বলেই কেহই নয় কারো তেমনটা অধীন বা পরাধীন বা প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন হতে বুর্জোয়াদের আয়-রোজগারহীন পটের বিবির মতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নয় বা আবশ্যক হলে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয় । আবার বুর্জোয়ারাই নিজেদের স্ত্রীকে বেশ্যার অধম কেবলই যৌন দাসী গণ্যে অর্থ-বিত্তের প্রলোভনে বা নানান কূট কৌশলে প্ররোচিত করে পরস্পরের স্ত্রীকে ভোগ-ব্যবহার করেও কেবলই বেশরম যৌন লিপ্সায় শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিও যেমন হাত বাড়ায়, তেমনটা করার সুযোগ-অবকাশ শ্রমিকশ্রেণীর নাই। তবে, অন্যকোন উদ্দেশ্য ছাড়া কেবলই পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে মিলিত হতেও তাঁদের বাঁধা নাই। অথবা পুঁজির বাজারে শ্রমের যোগান-সরবরাহ নিশ্চিতি এবং সুযোগ পেলেই তা-হোক জোর-জবরদস্তিতে বা ছলা-কলায় বা আইনী ফাঁক-ফোকরে ফেলে কেবলই

আদালতের রায়ে দুর্গত বা দুরাবস্থায় পতিত শ্রমিককে দেশ-দেশান্তরী করে শ্রমবাজারে শ্রমশক্তি বিক্রেতার সরবরাহ বাড়িয়ে শ্রমিকের মজুরি কমিয়ে অধিকতর উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন ও অধিকতর হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাত্মের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতিতে শ্রমিকশ্রেণীকে নানান স্থান ও দেশে অভিবাসী করে শ্রমিকদের পরিবারকে যেমন নিষ্ঠুরের মতো ভেংগে দেয় তেমন কেবলই জীবিকার তাগিদে বহু বিপন্ন শ্রমিক, শ্রমশক্তি নয় কেবলই যৌনতা বিক্রি করে বেঁচে থাকে বলে পুঁজিবাদী নিষ্ঠুরতার কারণেই প্রকৃতই শ্রমশক্তি বিক্রেতা বহুজনের নিকট দু:খজনক হলেও পরিবার নয়, বরং নিজ নিজ জীবন প্রধান হয়ে যায়।

অত:পর, শ্রমিকশ্রেণীর নিকট নারী-পুরুষের প্রথাগত সমস্যা বা বুর্জোয়া বিবাহের সমস্যা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয় এবং কেবলমাত্র শিশ্নধারী শ্রমিক বলে যোনিধারী শ্রমশক্তি বিক্রেতার নয় সে প্রভু। অথবা, ২০০৮ সালেও বিশ্বের মোট আয়ের দুই তৃতীয়াংশ উৎপন্ন করা সত্ত্বেও মাত্র ১০% পেয়ে থাকে নারী এবং বিশ্বের মোট ভূমির মাত্র ১% নারীর মালিকানাধীন। (সূত্র- www.internationalwomwnsday.com) অত:পর, জেন্ডার ইক্যুয়ালিটির দাবীদার বুর্জোয়ারা সমেত লেনিনবাদীদের বক্তব্য তথা ইক্যুয়ালিটির সূত্রমতো নারী-পুরষের আনুপাতিক হারে ভূমি ও আয় বন্টন করতে হবে? অথবা, অনুরূপ বৈষম্য কি শিশ্ন ও যোনির কারণে সৃষ্টি হয়েছে না কি বুর্জোয়া ব্যক্তিমালিকানার জন্যই যেমন বৈষম্য বিরাজমান তেমন নারী বা পুরুষও নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল পণ্য উৎপন্নকারী শ্রমিকশ্রেণী সম্পত্তিহীন ? অথবা, বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া কমিউনিষ্টদের দাবীমতো যদি সো-কল্ড জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি নিশ্চিত করা হয় তবে কি দুনিয়ার সকল নারী, পুরুষের আনুপাতিক হারে আয় ও সম্পত্তি পাবে? ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকাবস্থায় সম্পত্তিবানরা কি অনুরূপ হারে ভূমি ও আয়ের বিলি-বন্টনে রাজী হবে নাকি সকলে সম্পত্তিবান হতে পারে? নাকি অনুরূপ বৈষম্য দুরীকরণে সম্পত্তিহীনদেরকে তা হোক নারী বা পুরষ কাউকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ফেরত বা সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার প্রদানের প্রতিক্রিয়াশীল দাবী নয় বরং, উক্তরূপ বৈষম্যের মুল ও মৌলিক এবং একমাত্র কারণ - বুর্জোয়া ব্যক্তিমালিকানার অবসান নিশ্চিত করা ? সুতরাং, শ্রমশক্তি বিক্রেতার পরিচয় মুচে কেবলই সমাজের সকলেই মুক্ত মানুষ হওয়া বৈ বুর্জোয়াদের মতো তথাকথিত জেন্ডার ইক্যুয়ালিটির আবশ্যকতা আদৌ শ্রমিকশ্রেণীর নাই।

অথচ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পান্ডারাও শ্রম শক্তি বিক্রেতা মানুষকে নারী-পুরষে ভাগ-বিভাজন করে ১৯০৮ সাল হতে বুর্জোয়াদের আদলেই নারী মুক্তির বিষয়টিকে আলাদাভাবে রাজনৈতিক অংগনে হাজির করে। এবং শ্রম মুক্তির মুল সমস্যাকে পিছনে ফেলে কার্যত শ্রমিকশ্রেণীকে কেবল বিভাজনই নয়, বরং বুর্জোয়া জেন্ডার সমাতার ফালতু বোধের বোধিতে রোগাক্রান্ত করে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বৈরীতা বাড়িয়ে তোলে। ফলে- বিকৃত হয় শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীবোধ এবং শ্রেণী চৈতন্যের ও শ্রেণী মুক্তির সংগঠনের পরিবর্তে নিমজ্জিত হয় তারা বুর্জোয়াদের অন্ধ গলির পংকিলতায়। অমন সুযোগেই বুর্জোয়ারাও ২য় আন্তর্জাতিকের ঘোষিত তারিখেই প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস পালন করে থাকে শুধু নয় বরং সারা দুনিয়ার বুর্জোয়াদের সেরা মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরাও দিবসটিকে গুরুত্বারোপ করে থাকে। www.irrawaddy.org এর ৮

মার্চ, ২০০৬ সালের নিউজে- " World Marks International Women's day" শিরোনামে বিবৃত এই: " US President George W Bush marked International Women's Day yesterday with a plea for the world to remember countries where women do not enjoy even basic human rights.

"As we work to advance the equality of women in the world's newest democracies," he said, "we must remember that many women in other countries around the world are still struggling for basic rights, in places like Iran and North Korea and Burma."

অত:পর, ২য় আন্তর্জাতিকের পান্ডাদের বা লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লদের যোগ্য উত্তরসূরী নয় কি প্রেসিডেন্ট বুশ? অথবা, বিশ্ব এখন লেনিনবাদী কমিউনিষ্টদেরই দখলে নয় কি ? সুতরাং, সেদিনের কমিউনিষ্ট নামধারী ২য় আন্তর্জাতিকের বুর্জোয়ারাই যে, আজকের যুগের মরণাপন্ন বুর্জোয়াশ্রেণীর সংরক্ষক তাতে সন্দেহ থাকে কি ? তৎসত্ত্বেও ২য় আন্তর্জাতিকের পান্ডারা এবং লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লরা কমিউনিষ্ট হলে , বিশ্ব পুঁজিবাদের বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্রও নিশ্চয়ই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ?

পুঁজিবাদ আর লেনিনবাদী কমিউনিজম, এ'দুয়ের মধ্যে কি চমৎকার মিল বা একে অপরের হরিহর আত্মা নয় কি ? সংশোধন বাদ বিরোধী মাওয়ের সাথে এ বিষয়ে অন্তত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতি সংঘের কোন বিবাদ-বিরোধ নাই। যদিও, জাতি সংঘ বিবাহ বহির্ভূত সন্তানের সমানাধিকার নিশ্চিতকারী হলেও মাওয়ের সংবিধান সে বিষয়ে একদম চুপ থাকলেও পার্সোনাল ল'য়ের ক্ষেত্রে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান জন্মদানতো নয়ই বরং বিবাহ বহির্ভূত মেলা-মেশাকে মনু সংহিতার মতোই দন্ডনীয় করেছে চীন । আর ভারতীয় মনুর শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেণীকাঠামো বজায় রাখতে মনু সংহিতা যেমন বিবাহ ও পরিবারকে আমৃত্যু রক্ষার শর্তে নারীকে কেবলই পুরুষের দাসী গণ্যে সতীদাহ প্রথা চালু করেছে তেমন ইহকালে বিবাহিত জীবন হতে মুক্তি লাভের অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদের কোন সুযোগ দেয়নি। যদিচ, সম্রাট হাম্মুরাবীও নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার নিশ্চিত করেছিল তার কোডে। তবে কমিউনিষ্ট মাও বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকার করেন কি না সে বিষয়ে অত্র সংবিধানে কিছুই উল্লেখিত নাই অথবা, শিশ্ন ও যোনীহীন মানুষ অর্থাৎ হিজরা বা বহির্ণলারা মানুষ হিসাবে মাওয়ের সংবিধানে স্বীকৃত না হলেও এতদ্বিষয়ে আলোচ্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৭ এ বর্ণিত এই: " Women enjoy equal rights with men in all respects. The state protects marriage, the family, and the mother and child." কি ভয়ানক কথা, চীনা নারী, চীনের পুরুষের সমান অধিকার ও সন্মান পাবে আবার, সামন্তীয় মুল্যবোধে- নিজ দেহ রক্ষায় অক্ষম-অসহায় রমনীর একমাত্র পেশা তথা দাসত্বের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বিবাহ রক্ষা করবে মাওয়ের বর্বর পুরষালি রাষ্ট্র? অবশ্য অনুরূপ দাসত্বের সামন্তীয় মুল্যবোধের লালন-পালনে অত্র সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে বিবৃত করেছেন যে, চীনা নাগরিকগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।

মাওয়ের পরবর্তী ১৯৮২ সালের চীনা সংবিধান, যাহা এপ্রিল-১৯৮৮,মার্চ-১৯৯৩, মার্চ-১৯৯৯ এবং মার্চ-২০০৪ সালে যথাক্রমে ১ম,২য়,৩য় ও ৪র্থ সংশোধনী অনুমোদন করা সহ কার্যকর তাহার অর্থাৎ সেই সংবিধানে বেশ কিছু বিষয়ে মাওয়েরই অনুগমনে পরিবার-বিবাহ ইত্যাদি রাষ্ট্রিকভাবে সুরক্ষা করার বিহীতাদিসহ অনুচ্ছেদ-১১ দ্বারা প্রাইভেট ইকোনোমির স্বার্থ সংরক্ষণ; অনুচ্ছেদ-১৩ দ্বারা ব্যক্তি মালিকানাকে "অলংঘনীয়" হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য করাসহ উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তিমালিকানার অধিকার সুরক্ষা; অনুচ্ছেদ-৪৯ দ্বারা বিবাহ ও পরিবার সংরক্ষা; অনুচ্ছেদ-৩৬ দ্বারা ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; অনুচ্ছেদ-১৮ দ্বারা বিদেশী বিনিয়োগের সুযোগ নিশ্চিত এবং বিনিয়োগকারীদের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষা ; এবং অনুচ্ছেদ-২৫ দ্বারা চীনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার সাংবিধানিক নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করছে।

যদিচ, মাও নিজেও বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষে যেমন লেখা-লেখি করেছেন তেমন লেনিন ও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সম্পর্কে রোজাকে সমর্থন করে লিখেছেন- " রোজা লুক্সেমবুর্গ বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনকেও এই সমস্ত সমস্যার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ সমস্যার মধ্যে এই একটা চমৎকার বাস্তব দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া যায় যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি না জানিয়ে কেউই গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে পারেন না।" এবং মালথাসীয় তত্ত্ব গণ্যে জন্ম-নিরোধ সম্পর্কে লেনিন লিখেছেন-" এই জন্য এবং একমাত্র এই কারণের জন্য আমরা নয়া-মালথাসতত্ত্বের আপোষ বিরোধী শত্রু। দু:খ জর্জরিত অহং সর্বস্ব ক্ষুদে বুর্জোয়া দম্পতিই এই তত্ত্বের পক্ষপাতী।" (সুত্র-"নারী ও কমিউনিজম, মার্কস থেকে মাও", সংকলক-হ্যারি পোলিট, অনুবাদক, মন্মথ সরকার, জানুয়ারী-২০০৮ সালে র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ভারত হতে প্রকাশ করেছেন- অরুণ কুমার দে)

অত:পর, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে এক সন্তানের নীতি রাষ্ট্রিকভাবে কার্যকরণে নিয়োজিত চীনা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বর্তমান চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি মোড়লরা যাঁরা ১৯৮২ সালের চীনা সংবিধান পন্থী এবং ভুয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য ভুয়া জন্ম স্থান ও ভুয়া জন্ম তারিখের হেতুবাদে মার্কিনী নাগরিক চীনা মোড়ল তথা চীনা জাতির নব্য ফাদার ডা: সান ইয়াৎ সেনের যোগ্য উত্তরসুরী এবং চীনা জাতির নতুন গাইড-সম্রাট মাওসেতুংয়ের চিন্তাধারার অনুসারী ও ইঁদুর মারার বিড়াল তাত্ত্বিক দেং শিয়াওর তত্ত্ব বাস্তবায়নকারী হালের চীনা কমিউনিষ্টরা যে, কেবলমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নীতির কারণেই খোদ লেনিনের ফতোয়াই , লেনিনবাদী নয় বরং, নয়া-মালথাসবাদী এবং পেটি বুর্জোয়া তাওতো উপরোক্ত তথ্য-প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হয়।

অনুরূপ " গণতন্ত্রী" ও "সমাজতন্ত্রী"-র মধ্যে যে লেনিনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার ফারাকহীনতার মতোই লেনিন ও বুশের মধ্যে জেন্ডার সমতা বিষয়ে ফারাক নাই বলেই ক্লারা জাটকিন ও লেনিনরা জেন্ডার সমতা ও নারীর বেসিক রাইটের জন্য যা যা দাবী করেছেন করেছেন তা সানন্দে দাবী করছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য- তদমর্মে লেনিনরা শুধু দাবীদার হলেও হাম্মুরাবীই অন্ত:ত বিবাহ-বিচ্ছেদ সহ নারীর সম্পত্তি স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সাংবিধানিকভাবে প্রদান

করেছেন বলে ইতিহাসের নিরিখে বর্বর হওয়া সত্ত্বেও নারী অধিকার বিষয়ে সম্রাট হাম্মুরাবী একদিকে যেমন লেনিন-বুশদের মহা গুরু অন্যদিকে তেমন লেনিনদের দাবীর তুলনায় নারীকে অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কার্যত, লেনিনের বয়ান ও নিদান মতো খোদ হাম্মুরাবীই যে, লেনিন-বুশ বা এজাতীয় সমাজতন্ত্রী-গণতন্ত্রীদের তুলনায় অনেক বেশী মাত্রায় নারী অধিকারদাতা অর্থে অধিকতর গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী তাতে আর সন্দেহ থাকে কি ?

(চ) হারামখোররা ছোগলখোরও, তাইতো পরজীবী মাওরা নিজেদের পরজীবীতাকে গোপন ও আড়াল করতে চীনা রাষ্ট্রের নির্বাহী ব্যয় ও আয়ের কোন বিধান বা নীতি অত্র সংবিধান গ্রহণ প্রসংগে চিয়া ওয়ের রিপোর্ট মতে অত্র ছহি মাওনামাতে সন্নিবেশিত করেনি।যদিচ, সরকার কর ও রাজস্ব আদায়-উসুল করছে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলা জবর দখল করে কর্ষিত ভূমিকে বাণিজ্যের প্রধান উপকরণে পরিণত করে বছর বছর রাজস্ব বাড়িয়েছে বলে প্রায় প্রতি বছরই চাষী ভূমিহীন হয়ে পালিয়েছে বলে কৃষি উৎপাদন যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমন ভারতের অন্য অঞ্চলে অতিরিক্ত উৎপাদন হলেও যেহেতু পণ্য পরিবহনের পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল না তাই সরবরাহের ঘাটতি জনিত কারণে দুর্ভিক্ষ ছিল বাংলার সাংবার্ষিক চিত্র। তন্মধ্যে-গাংগেয় অঞ্চলে অর্থাৎ বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যায় মোট ৩ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষ কেবলমাত্র দুভিক্ষে মারা গিয়েছিল ১৭৬৯ হতে ১৭৭৩ সালের মধ্যে। যদিচ, ঐ বছরত্রয়ীতেই কোম্পানীর ভূমি রাজস্ব আয় হয়েছিল সবচাইতে বেশী।

একইভাবে চীনের জনগণের উপর জবরদখলী চেপে বসা মাওয়ের " গ্রেট লীপের" ব্যর্থ কর্মসূচির কালে অর্থাৎ ১৯৫৮ হতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত চীনেও কেবলমাত্র দুভিক্ষে অতিরিক্ত ১৫ মিলিয়ন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল । অত:পর, গ্রেট লিপের গ্রেট ব্যর্থতা ও গ্রেট বির্পযয়ের পর গ্রেট মাওয়ের গ্রেট এনার্কি দ্বারা মাওয়েরই ১৯৫৪ সালের সংবিধানমুলে সৃষ্ট গ্রেট চীনা রাষ্ট্র কার্যত ও আইনত অকার্যকর হওয়ায় প্রণীত অত্র সংবিধানে কোথাও রাষ্ট্রিয় কর বা রাজস্ব আদায়-উসুলের নীতি বা হার ইত্যাদি বিবৃত হয়নি বলে ভারতে বিদেশী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অপরাধের তুলনায় চীনের স্বদেশী মাও কোম্পানীর অপরাধ লঘু গণ্য হতে পারে কি ?

সুতরাং, রাষ্ট্রিক কর নিয়মিত আদায়-উসুল করে সেই করের হারামের টাকা দেদারছে ও আরামে ভোগ ও ব্যবহার করলেও তস্কর মাও কোম্পানী রাষ্ট্রিক-ব্যয় বিষয়ে একদম নিশ্চুপ ছিল অত্র সংবিধানে হেতু লেনিনবাদী মাওরা কেবল পরজীবীই নয়, উপরন্ত দস্যু-তস্কর ও ছোগলখোরও বটে।

অথচ, উল্লেখিত সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৬ এই: " The fundamental rights and duties of citizens are to support the leadership of the Communist Party of China,-----It is the lofty duty of every citizen to defend the motherland and resist aggression. It is the honourable obligation of

citizens to perform military service according to law." অর্থাৎ মাও কোম্পানীর অধীন চীনা জনসমষ্টির মৌলিক অধিকার ও করণীয় হচ্ছে সদা-সর্বদা দস্যু সর্দ্দার মাওয়ের তল্পী বহন এবং মাওয়ের চীনকে বিদেশী আগ্রাসন হতে রক্ষায় সুচারুভাবে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে মাতৃভূমি রক্ষা করা। অর্থাৎ জনাব মাও বুর্জোয়াদের মতো বেতন-ভাতা দিক বা না দিক কেবলই পেশাগত খুনি তথা সৈনিকের করণীয় কর্ম হিসাবে কেবলই মাওয়ের নেতৃত্ব সুরক্ষায় চীনা জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে মাওয়ের যুদ্ধা হিসাবে যুদ্ধ করা।

অথচ, ভীষণরকমের দাংগাবাজ-যুদ্ধবাজ ও ভয়ানকরকমের যুদ্ধজয়ী ও পররাজ্যগ্রাসী ছিলেন ব্যবিলনের রাজা যিনি বহু রাজ্য গ্রাস বা দখল করে দখলীকৃত রাজ্য সমন্বয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নিজেই নিজের পদোন্নতি ঘটিয়ে 'রাজা' থেকে 'সম্রাটে' পদোন্নত প্রিন্স হাম্মুরাবীও কিন্তু তাঁর সকল প্রজাকে সৈনিক হতে বলেনি। আরো উল্লেখ্য-উক্ত সাংবিধানিক নির্দেশনার মর্মার্থ হচ্ছে-তথাকথিত মাতৃভূমি রক্ষার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করা এবং প্রয়োজন হলে মাওয়ের যুদ্ধা আসলে গুন্ডা সেজে জীবন বিসর্জন দিয়ে ভিয়েতনামীদের মতো সন্মানিত জীবন নিশ্চিত করা। উল্লেখ্য,সেনাবাহিনীতে যোগদানের নিমিত্তে মাওয়ের গুন্ডাবাজির অনুরূপ আইন-বিধি যদি দুনিয়ার সর্বত্র বিরাজমান থাকতো তবে, আলবার্ট আইনাষ্টাইন জার্মান নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে সুইজারল্যান্ড যেতে পারতো না, আর ক্লুনার্ড জসে তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা কর্মটি বুঝাতে সক্ষম হতো না জার্মান কর্তৃপক্ষকে ।

ফলে- সেনাবাহিনীতে যোগদানে অনিচ্ছুক এ দুজন মানুষের নিকট হতে যথাক্রমে -"ল' অব পিজিক্স" বা " আপেক্ষিকতার তত্ত্ব" এবং " কম্পিউটার" পাওয়ার সুযোগ লাভ করতো না মানবজাতি। আর এ দুটো মৌলিক আবিস্কার হতে মানবজাতি বঞ্চিত হলে পৃথিবীর মানুষ যেমন কেবল ইউনিভার্স বা সৌরজগতই নয়, বরং যাবতীয় উপাদান সহ পৃথিবীরই ছহি খোঁজ-খবরইবা আরো কতদিন পরে জানতো তাইবা কে জানে অথবা, এদু'টো আবিস্কারের কারণেই অগুণতি রকমের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সহ জানে বেঁচে আছে অসংখ্য মানুষ বা বহু মানুষ প্রতিদিনকার ক্লান্তিকর দৈহিক শ্রমের যন্ত্রণা হতে রেহাই পেয়েছে বা জীবন-যাপনের প্রণালী ও ব্যবস্থা সহ শিক্ষা-চিকিৎসা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে মানব জাতির যেটুকুই অগ্রগতি হয়েছে তা যেমন হতো না তেমন আমরাও কেবলই কম্পিউটার বা তদ্রুপ প্রযুক্তির অভাবেই এখনো লেনিন- মাওদের গুন্ডামির খাস খতিয়ান পেতাম না।

(ছ) পরলৌকিকতার বিধানাবলী মর্মে মনু সংহিতা এবং আদি ভারতের আদি আইন-কানুন সহ দাস থেকে দিল্লীর বাদশায় পদোন্নত সৈনিক কুতুব উদ্দীন বা ভারত দখলকারী পার্সিয়ান, মোগল ও বৃটিশদের প্রণীত-চালুকৃত পার্সোনাল আইন সহ বিচারিক বিধি ঐতিহ্য ও প্রথা ইত্যাদি সমেত দন্ডবিধি এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধকারী পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের প্রণীত ও কার্যকৃত আইন-বিধি ইত্যকার অগণতান্ত্রিক বা নারী-পুরুষে বৈষম্যকারী বা মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী বা ইহলৌকিকতার বৈরী আইন-বিধি সমূহ বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১,৭ এবং

অনুচ্ছেদ-৮ হতে ২৫ এবং অনুচ্ছেদ-২৬ হতে ৪৭ এর সহিত বৈরী-অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাংঘর্ষিক হেতু সংবিধানে অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৬ মূলে অচল ও বাতিল গণ্য হওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল অচল-বাতিল বা বাতিলযোগ্য আইন-বিধি বা প্রথা-ঐতিহ্য, রীতি-নীতি ইত্যকার বিষয়াদি বাংলাদেশে বলবৎ-বহাল ও কার্যকর থাকার কারণে বা সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৬ মোতাবেক উল্লেখিত আইন বা বিধি-বিধান সমূহ রদ-রহিত ও বাতিল না করার কারণে বাংলাদেশে সাংবিধানিক সুপ্রিমেসী কখনো কার্যকর হয়নি বলে বাংলাদেশের সংবিধান মূলত জন্মলগ্নেই অকার্যকর গণ্য হলেও বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৬ দ্বারা সংবিধান পরিপন্থী আইন প্রণয়ণে রাষ্ট্রকে যেমন বাধ্যতামূলক " না" দ্বারা বারিত করা আছে তেমন সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বা সাংঘর্ষিক সকল আইন বা আইনাংশকে অচল-বাতিল গণ্য করার মাধ্যমে দৃশ্যত সংবিধানের সুপ্রিমেসি নিশ্চিত করা আছে।

কিন্তু, মাও কোম্পানীর উল্লেখিত সংবিধান তথা ছহি মাওনামায় বাংলাদেশের ঢংয়েও সংবিধানের সুপ্রিমেসী নিশ্চিত করা হয়নি বলে উক্ত সংবিধানের সহিত সাংঘর্ষিক হলেও চীনের অতীতের দন্ডমূলক আইন ও কার্যবিধি বা দেওয়ানী আইন ও বিধি মতোই চীনের প্রথাগত বিচার-আচার যেমন হয় তেমন প্রচলিত পারিবারিক আইন তথা পার্সোনাল ল'ও বহাল আছে বলে মাওদের কোন সংবিধানই চীনে কার্যকর নয়। কাগজে-পত্রে মাওদের সংবিধান বহাল থাকা সত্ত্বে তা কার্যকর না থাকার সুযোগেই মাওরা যখন যেমন যেভাবে প্রয়োজন বোধ করে সেইভাবেই **সংবিধান বদলায়-পাল্টায় ও বাতিল বা সংশোধন করে থাকে।**

সুতরাং, লেনিনবাদী, মাও চিন্তাপন্থী ও দেং এর তত্ত্ব বাস্তবায়নকারী মোটকথা মাও কোম্পানীদের কোন সংবিধানই সমাজতান্ত্রিকতো নয়ই বা নিদেনপক্ষে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যধন্য হওয়ার সামান্যতম অবকাশও নাই। বিপরীতে মাওদের সংবিধান কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র বিরোধীই নয় বরং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে দুনিয়াময় বিভ্রান্তি ছড়িয়ে কার্যত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে যেমন মারাত্মক প্রতিবন্ধক তেমন সমাজতন্ত্র বিলম্বিতকরণের দলিল হিসাবেই নিশ্চিত হয়। তাছাড়া- সমাজতন্ত্রের নামাবলী পরিহীত হয়েও আদি চীনের আদি আইন-কানুন বাতিল করার বিধি-বিধান সাংবিধানিকভাবে বিহীত না করে বিপরীতে সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক চীনের অমানবিক মৃত্যুদন্ড সমেত দন্ডমূলক আইন সহ সাবেকী পার্সোনাল ল' বহাল ও কার্যকর রাখা হয়েছে বিধায় মাও কোম্পানীর প্রণীত সংবিধান কার্যত একটি আধুনিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ার উপযোগীও নয় ।

তবে চীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা- খোদ মাওসেতুং কর্তৃক স্বীয় সাংবিধানিক রাষ্ট্রকে স্বয়ং অকার্যকর করার কারণে চীনে বারংবার সংবিধান অকার্যকর ও বাতিল করার মাধ্যমে সৃষ্ট নৈরাজ্যিক অবস্থা দ্বারা সন্দেহাতীভাবে নিশ্চিত হয়েছে যে, পুঁজিবাদের বৈশ্বিক রাজত্বে বিশেষত বিশ্ব প্রভু আই.এম.এফের কর্তৃত্বমূলক বিশ্বে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগহীনতায় মৃতবৎ রাষ্ট্র বিশেষকে রক্ষায় যতোই অপচেষ্টা করা হোক না কেন কার্যত ইতিহাসের নিয়মেই কোনক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বা পূর্বাপর ধারাবাহিকতা সম্পন্ন বা সুগঠিত-কার্যকর একটি রাষ্ট্র গঠন-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়

বরং,বিশ্ব পুঁজিবাদের আওতায় সাবেকী আইন-কানুন সহ মাওসেতুংদের সংবিধান দ্বারা জগাখিছুড়িভাবে এবং মাওসেতুংদের মতো একচ্ছত্র ক্ষমতার একক ক্ষমতাধর স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তির মালিকানাধীন একটি রাজনৈতিক দলের একক নিয়ন্ত্রণে একটি স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে হেতু চীনের হান ডাইনেষ্টীর কিং বা সম্রাট হাম্মুরাবীর আইন-বিধান হতে তো বটেই এমনকি বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সংবিধান হতেও মাওয়ের চীন ও চীনা সংবিধানগুলো আরো জঘন্য।

(২)সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইক্যুয়েল শেয়ার হোল্ডার নাগরিকগণের নাগরিকত্ব প্রদানকারী কর্তৃত্বসহ নাগরিকত্বের শর্তাদি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি বরং "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংগালী বলিয়া পরিচিতি হইবেন" রূপ নির্ণিত- চিহ্নিত ও শনাক্তকরণের মাধ্যমে কেবলমাত্র বাংগালীদেরকে নাগরিক বলে গণ্য করা হয়েছে বিধায় জাত্যাভিমানী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের সাভারকারদের হিন্দুত্ববাদী বা হিটলারের নাজিবাদী তথা পুঁজিবাদী ফ্যাসিস্ট কনসেপ্ট কার্যকরণে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে বাংলাদেশে বসবাসকারী অপরাপর সকল জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের উপর বাংগালীদের একাধিপত্য ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে হেতু বাংগালী ব্যতীত অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীকে স্বীয় জাতি সত্ত্বার জন্মগত পরিচয় বিলীন করে কেবলমাত্র "বাংগালী" বনে বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার অর্যৌক্তিক ও জবরদস্তিমুলক শর্ত যুক্ত করা হয়েছে অনুচ্ছেদ-৬, এ ।

উপর্যপুরি,বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী হিসাবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিরোধী অপরাধী চক্র-গোষ্ঠী ও পরাজিত শত্রুশ্রেণীর এজেন্ট বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের ভোটাধিকার রহিত ও স্থগিত করার বিধি-বিধান বর্ণিত হয়নি বা এতদমর্মে গুরুতর অপরাধী বা অপরাধের দায় এড়াতে পাকিস্তান বা ভিনদেশে পালিয়ে যাওয়া বা বিদেশে আশ্রয়লাভকারীদের নাগরিকত্ব বাতিল করার নির্দেশনা নাই।

(৩) পুঁজির বিনাশ ও মজুরি দাসত্বের অবসানই হল সমাজতন্ত্র। তাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীর সাথে পুঁজিপতিশ্রেণীর লড়াইটা জাতীয়তাবাদী নয়। আবার, জাত-পাতের ছোঁয়াছুঁয়ি ধর্তব্যের মধ্যে নিলে পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা ও সঞ্চালন এবং সঞ্চয়ন সম্ভব নয়। তাই পুঁজিবাদ-ই পুঁজির সঞ্চালন ও সঞ্চয়ন আবশ্যকতায় দুনিয়ার তাবৎ জাত-জাতি ইত্যাদি বিনাশ ও ভেংগে চুরমার করে দিয়ে সমগ্র বিশ্বে পুঁজির আধিপত্য বিস্তার করে সমগ্র দুনিয়াটাকে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র প্রদান করেছে।

এমনকি কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের তথ্যমতে- ইংলন্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকা-জার্মানীতেও "জাতীয় চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বিলোপ" পেয়েছিল। যদিচ, পুঁজিবাদ যাত্রা শুরু করেছিল জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক শ্লোগান দিয়েই । অত:পর, পুঁজির দৌরাত্ম ও বিশ্বজয়ের অংশ হিসাবেই ভারতের 'চরকার' স্থান দখল নিয়েছিল ইংলন্ডের বাস্পীয় ইঞ্জিন চালিত সুতা-বস্ত্র শিল্প । ভারতের তূলা রপ্তানী হত মানচেষ্টারে। বিজয়ী মানচেষ্টারের পদতলে পিষ্ট হয়ে ঢাকার 'মসলিন' হারিয়ে গেল ইতিহাসে। এখনতো কম্পোজিট টেক্সটাইল স্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশেও। যুক্তরাষ্ট্র -যুক্তরাজ্যও তৈরী পোষাক আমদানী করছে বাংলাদেশ হতে। সি.আই.এ. ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক-২০০৯ এর পরিসংখ্যান

মতে- ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আমদানী খাতে ব্যয় করেছে ২০.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং রাপ্তানীখাতে আয় করেছে- ১৩.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কাজেই, স্বয়ং-সম্পর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়া আদৌ সম্ভব কি ? এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের মত মহাক্ষমতাধর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রও একদিনও অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না যদি তথাকথিত স্বনির্ভরতা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভুয়া বক্তব্য সম্বলিত রাজনীতি অনুসরণ করে বিদেশী পণ্য বর্জন কর্মসূচী গ্রহণ করে।

অত:পর, পুঁজিবাদী অবস্থা ও ব্যবস্থার আওতায় ভেংগে গুড়িয়ে যাওয়া জাতি বা বিনাশিত জাত বিশেষের পুনরোত্থান যেমন সম্ভব নয় তেমন প্রয়োজনীয়তাও নাই। বরং পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর বৈরীতা-বিরোধীতা হচ্ছে বৈশ্বিক পরিসরে বৈশ্বিক পুঁজিবাদ সংরক্ষণ ও বিনাশের নিমিত্তে বলে পুঁজিপতিরা যেমন দি ফান্ড সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থা-সংগঠনের আশ্রয়ে পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করার নিমিত্তে শ্লোগান তুলছে " বিশ্বায়নের" তেমন শ্রমিকশ্রেণীকেও লড়াই করতে হবে একটি একক বৈশ্বিক সংগঠনে একীভূত ও সংগঠিত হয়ে বলেই বুর্জোয়ারা আগেও কখনো প্রকৃত অর্থে জাতীয়তাবাদী ছিল না আর এখন তাঁরা খোলাখোলি বিশ্বয়ানপন্থী । অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীও নির্দিষ্ট কোন দেশ বা রাষ্ট্রের নয় বরং স্বদেশ-স্বজাতি হারিয়ে সর্বকালেই বৈশ্বিক বলেই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচৈতন্যকে "আন্তর্জাতিকতাবাদ" হিসাবেই চিহ্নিত করেছিলেন বলেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির প্রথম ও প্রধান বা মূল শ্লোগান হিসাবে " দুনিয়ার মজুর এক হও" যথার্থভাবেই নির্ধারণ করেছিলেন মার্কস-এ্যাংগেলস।

সুতরাং- পুঁজিপতিশ্রেণীর বিনাশে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বিক সমাজে দুনিয়ার সকলেই 'মানুষ' এবং সকল মানুষ একই জাতিভুক্ত অর্থাৎ সংকীর্ণ জাতিয় পরিচয় মুক্ত ও শ্রেণীহীন কেবলই এক মানবজাতি। অত:পর, পুঁজিবাদের বিপরীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকারীরা কোনক্রমেই জাতীয়তাবাদী নয়, সর্বাংশে আন্তর্জাতিকতাবাদী। কাজেই - পুঁজিবাদ কর্তৃক গুড়িয়ে দেওয়া জাতি বা বিলুপ্ত জাতিসত্ত্বা ফিরিয়ে আনার বা পুন:প্রতিষ্ঠার কোন অবকাশ স্বয়ং পুঁজিবাদই রাখেনি।

তবু, সাভারকারদের স্বর্ণালী যুগের ভারতীয় রাম রজত্বে ফিরে যাওয়ার " হিন্দুত্ববাদ" বা অর্ধ উলংগ দেহের গরীবী বাহানায় সহজ-সরল শ্রমজীবী মানুষকে বিমোহিত ও বিভ্রান্ত করণে অতীব পটু ভারতের শিল্প নগরী গুজরাটের গান্ধীজীর আধুনিক শিল্পের বদলে আদিকালের " চরকায়" ফিরে যাওয়ার শ্লোগান কেবলই প্রতিক্রিয়াশীলই নয় বরং অতীব চালাকি-কৌশলী ও ভ্রষ্টাচারীতা সমেত নয়া কৌশলে পুঁজিবাদের দালালী বটে। প্রমাণ বটে- গান্ধীদের হোষ্ট টাটা-বিড়লাদের রমরমা কর্তৃত্বের বর্তমান ভারত। একই ভাবে মার্কসবাদের আবরণে সমাজতন্ত্রের নামাবলী পরিহীত জার্মান পুঁজির দালালী করেও জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর কেন্দ্রীভূত-পুঞ্জীভূত পুঁজির সঞ্চালন সুনিশ্চিত করতে পারেনি বলেই বিশ্বাসঘাতক কাউৎস্কিরা পরাজিত হয়েছিল ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট পার্টির হিটলারদের নিকট। ' জার্মান জাতি, দুনিয়ার সেরা -শ্রেষ্ঠ জাতি'-এই শ্লোগান তুলে জার্মানীর বিশ্বজয়ে অর্থাৎ জার্মানীর পুঞ্জীভূত পুঁজির দুনিয়াময় অবাধ সঞ্চালন নিশ্চিত করতে বিশ্ব গুন্ডা হিটলার সারা দুনিয়াটাকে নিক্ষেপ করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহা ধ্বংসযজ্ঞে ও ভয়ানক তান্ডবে।

অথচ , ২য় বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তি হল সকল জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতিশ্রুতিতে জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যদিচ, ঐ চুক্তিবলেই প্রায় সমস্ত জাতিগত বা রাষ্ট্রিক সত্ত্বা হারিয়েছিল জার্মানী ।তবে, পুঁজির সঞ্চালন-সঞ্চয়নের সুবিধার্থে ও স্বার্থে কৃত্রিমভাবে বানোয়াটি জাতিগত আধিপত্য ও বৈরিতার অবসান সমেত জাতীয় চৌহদ্দি বা গন্ডী বিলীন করাসহ তথাকথিত জাতীয় চেতনার পরিপূর্ণ বিনাশ ও বিলুপ্তি সাধনই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক করণীয় ও শর্ত । অথচ, বুর্জোয়াবোধের মেকি জাতি রাষ্ট্রের মতো তথাকথিত সকল জাতির সমানাধিকার ও সুষমসম্পর্ক অর্থাৎ বুর্জোয়াদের বিশ্ব ক্লাব জাতিসংঘের প্রস্তাব মতো সকল জাতির, হোক তারা সংখ্যাল্প বা সংখ্যাধিক্য, সকল জাতির মধ্যকার প্রভেদ দুরীকরণে লিখন-কথনে সকল জাতির নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির স্বাধীন অনুশীলন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি "ইউনিটারী মাল্টি-ন্যাশনাল ষ্টেট" হিসাবে দেশকে নির্দিষ্টকরণ জাতিসংঘেরই শর্ত হলেও অত্র সংবিধানে " একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাংগালী জাতি " বলিয়া রাষ্ট্রিক নীতি হিসাবে অনুচ্ছেদ-৯ । " জাতীয়তাবাদ " সংজ্ঞায়িত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে তাতে বাংগালী ছাড়া বাংলাদেশে বসবাসকারী চাকমা-মারমা-মুরং বা গারো - সাওতালসহ অপরাপর সকলকেই সাংবিধানিক জবরদস্তিতে বাংগালী বানানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে-বাংগালী ছাড়া বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য জাতিসত্তা অস্বীকৃত-উপেক্ষিত ও বৈরীতার শিকার হয়েছে । যদিচ, ঐসকল জাতি-গোষ্ঠীর মানুষজন মুক্তির প্রত্যাশায় বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধে' অংশ গ্রহণ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং- বাংগালী জাতীয়তাবাদের শর্তে বাংলাদেশের অপরাপর জাতিকে পরাজিত-পরাভূত বা পরাধীন করার হেতুবাদে বাংলাদেশের সংবিধান এমনকি জাতিসংঘ কর্তৃক স্থিরকৃত গণতান্ত্রিক বা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের উপযোগীও নয়। মূলত: এরূপ ভন্ডামিই পুঁজিবাদের মেকি জাতীয়তাবাদের প্রকৃত চরিত্র।

(৪) পুঁজি জাগতিক বিষয় বলেই পুঁজির বিকাশকালে পুঁজিবাদ অনুসৃত নীতি তথা ধর্মীয় কারণে ব্যক্তি বিশেষের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বা অসুবিধা অবসানকল্পে- ধর্মকে রাষ্ট্র হতে বিযুক্তির নীতি-সেক্যিলারিজম অর্থাৎ " ইহলৌকিকতার" বংগানুবাদে উদ্দেশ্যমূলকভাবে "ধর্মনিরপেক্ষতা" মর্মে বিবৃত করা হলেও ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক অনুচ্ছেদ- ১২ দ্বারা বিষয়টিকে যথাযথভাবে বা সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে , সরকারী আচার-অনুষ্ঠান ও মিডিয়ায় অন্ত:ত ৪ টি ধর্মের গ্রন্থ হতে পাঠ করার রীতি চালু করেছিল শেখ মুজিব সরকার। ফলে- ইহলৌকিকতাতো নয়ই এমনকি ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতাও নয় বরং কার্যত ৪টি ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রীয় পক্ষপাত জনিত কারণে দেশের অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায় কেবলমাত্র সংখ্যালঘু হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে গণ্য হওয়ায় তাঁরা যেমন বৈরী আচরণের শিকার হয়েছে তেমন ৪টি ধর্মের বাণী সরকারী টিভিতে প্রচারিত হলেও, তন্মধ্যে সংখ্যাধিক্যরা একই যুক্তিতে অপরাপর সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রাদায়ের উপর পাকিস্তানী আমলের মতোই আধিপত্যই কেবল করে না বরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ধর্মীয় নিপীড়ন-নির্যাতন করা এবং পাকিস্তান আমলের মতোই শত্রু সম্পত্তি আইন কার্যকর থাকায় কার্যত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত নাগরিক হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে।

উল্লেখ্য- মোগল সম্রাট আকবর নিজে নিরক্ষর হলেও সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদে স্বীয় পূর্বপ্রজন্মের সম্রাটগণের অনুসৃত স্ব-ধর্ম ব্যতীত অপরাপর ধর্মের প্রতি বৈরীতার নীতি অবসানে নিজেই ভারতের অন্তত ৪টি ধর্মের সংমিশ্রণে " দীনে- এলাহী" নামক একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন। অত:পর, 'স্বাধীন' তদপুরি কথিত 'সমাজতান্ত্রিক' নীতিমালা ভিত্তিক বাংলাদেশে একটি মাত্র ধর্মের রাষ্ট্রিক পৃষ্ঠপোষকতা করা সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতার ছলনায় ধূর্ত মোগল সম্রাট আকবরের আদলে অনুরূপ ভন্ডামি কেবল মুর্খমি নয়, স্বার্থান্ধতা সমেত পাকিস্তান প্রীতিও বটে;

(৫) অনুচ্ছেদ-১১, " মানবসত্তার মর্যাদা" নিশ্চিত করতে " গণতন্ত্র", চর্চা ও অনুশীলন ও তা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় সকল পর্যায়ে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিতকরণে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমুহে মতামত প্রদান, সংবিধান সংশোধন ও আইন ও বিধি বিধান পরিবর্তন-পরিমার্জন ও বাতিলকরণ, প্রণীতব্য আইন-বিধি সম্পর্কে মতামত প্রদান এবং প্রয়োজনীয় আইন-বিধি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ ও উপযুক্ত ফোরামে উপস্থাপন এবং সরকারী নীতি, বৈদেশিক ঋণ ও চুক্তি সর্ম্পকে মতামত জ্ঞাপন বা পুর্বোক্ত ধরণের বিহিতাদি গ্রহণসহ স্বীয় এলাকায়- ব্যয়সহ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও অর্জন এবং বন্টন প্রণালী ও বন্টন ব্যবস্থপনা নিয়ন্ত্রণ, কাম্য জনসংখ্যা সহ আবশ্যকীয় বসতি, বিদ্যুৎ-জ্বালানী,স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য,সুপেয় ও প্রয়োজনীয় পানি, শিক্ষা-চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, কর্ম-বিশ্রাম,বিনোদন ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন, যোগাযোগ-অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, বৃক্ষায়ন-বনায়ন,পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং সামাজিক তহবিল গঠন, গণ চাঁদা,কর-ঋণ ইত্যাদি আদায়-গ্রহণ ও গণশৃংখলা রক্ষা , জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন-পরিসংখ্যান ও তথ্য সংরক্ষন এবং ভোটার লিষ্ট প্রস্তুত ও হালনাগাদিকরণসহ স্থানীয় পর্যায়ে সৃষ্ট বিরোধ নিস্পত্তি এবং স্থানীয় সকল সামাজিক বিষয় ও উন্নয়ন বিষয়ক পলিসি-কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়নে ভোটারগণের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান (এ.জি.এম অব ভোটারস) এবং অনুরূপ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও কাযাদি সম্পাদনে সর্বাধিক এক বছর মেয়াদী নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত অটোনমি ক্ষমতাসম্পন্ন ফোরাম হিসাবে 'জেনারেল এন্ড লোকাল এফেয়ার্স ম্যানেজারস ক্লাব' অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্ব নিম্ন অর্গান বা স্বয়ং সম্পন্ন স্থানীয় সরকারসহ রাষ্ট্রীয় সকল স্তরের গণপ্রতিনিধিগণকে "রি-কল" অর্থাৎ প্রত্যাহার করার ক্ষমতা এবং গণপ্রতিনিধিগণ ২ বছর মেয়াদি, কেন্দ্রীয় স্তরে পর পর ২ বার এবং ১ বছর মেয়াদি স্থানীয় স্থরে সর্বমোট ৩ মেয়াদের অতিরিক্ত মেয়াদে নিবাচনে অযোগ্য গণ্য হওয়াসহ কার্যকর জনকর্তৃত্বের সরকার ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা কায়েমে প্রয়োজনীয় বিধানাবলীর অনুপস্থিতি সহ ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ মতো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত-নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত " প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার" লাভকারী হিসাবে "স্থানীয় শাসন" তথা অনুরপ শাসনকারী সংস্থা হিসাবে স্থানীয় সরকারকে নির্ণিত করার মাধ্যমে "সমাজতন্ত্রতো" নয়ই এমনকি "প্রজাতন্ত্র" বা সাধারণতন্ত্রের কনসেপ্ট মতো রাষ্ট্রিক মৌলনীতি বাস্তবায়নে সামষ্টিক কার্যাবলী - নির্বাহ ও সমন্বয় সাধনকারী একটি সংগঠন হিসাবে গণ্য করার বিপরীতে কথিত "স্বাধীন" দেশের তথাকথিত " মর্যাদাবান" মানুষকে, কতিপয় শাসকের অধীন বা শাসনমূলক কর্তৃত্ব বিশেষের নিকট পরাধীন ও অমর্যদাবান ব্যক্তি মর্মে গণ্য করা হয়েছে।

অথবা, কতিপয় ব্যক্তিকে অপরাপর ব্যক্তির উপর শাসক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে বিধায় উক্ত অনুচ্ছেদ-৫৯ ও ৬০ অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১১ সহ "সুযোগের সমতা" বিষয়ক রাষ্ট্রীয় নীতি, অনুচ্ছেদ-১৯ এর পরিপন্থী হেতু "মানবিক মর্যাদা" সম্পর্কিত "স্বাধীনতার ঘোষণা" তথা সামগ্রীকভাবে "মুক্তিযুদ্ধের" আকাংখা - চেতনা ও অংগীকার বিরোধী মর্মে উক্ত অনুচ্ছেদদ্বয় দ্বারা স্বাধীন-মর্যাদাবান মানুষ নয়, বিপরীতে মানুষে-মানুষে 'শাসক-শাসিতের' সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।

অথচ, সাম্যবাদের ক্লাসিক্যাল সংজ্ঞা ও ধারণা মতো- কেবলমাত্র, অন্যকে শোষণ-পীড়ন ও শাসন না করা এবং নিজেকে শোষিত-শাসিত হতে না দেওয়ার শর্তেই কেবলমাত্র প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বাধীন বিকাশের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও মুক্তি সুনিশ্চিতকরণে সক্ষম বিধায় সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও নিছক আত্মকেন্দ্রীকতামুক্ত সামাজিক ও মানবিকবোধ সম্পন্ন ও চৌকশ বুদ্ধিমত্তার সহজ-সরল মনের স্বাধীন-মুক্ত মানুষ স্বয়ং স্বনির্ধারিত নীতি-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং মানবজাতির মুক্তি সুনিশ্চিতকরণে- নিজস্ব বেঁচে থাকার আবশ্যকীয় কর্ম সম্পাদন সমেত সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব সহ স্বীয় কর্ম ক্ষমতার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করা বিষয়ে প্রত্যেকে নিজের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পন্ন-সচেতন এবং উন্নতর মানবিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অধিকারী হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় দায়িত্ব -কর্তব্য, স্বজ্ঞানে-স্বেচ্ছায়, স্বসন্মানে ও সুচারুভাবে সম্পাদন- পালন বা পালনে সচেষ্ট বিধায় কেউ কারো শাসনের অধীন নয় হেতু প্রত্যেকে স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ ।

অনুরূপ যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রয়াশে আপাত বিরূপ প্রকৃতিকে অন্তঃত ধরত্রীকে মানববান্ধব আধারে পরিণত করার নিরন্তর প্রচেষ্টাকারী সার্বজনীন মানবিকতায় পরিপূর্ণ মানুষের সমন্বয়ে বিশ্বপরিসরে গঠিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক অতিসমৃদ্ধ ও উৎপাদন প্রাচুর্যে ভরপুর, সুখ-শান্তি এবং আনন্দ ও ভালোবাসাময় সাম্যবাদী সমাজ লাভে, শ্রেণী কর্তৃত্বের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার অবসানে প্রত্যেককে অনুরূপ স্বাধীন ও মুক্ত মানুষ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কেবলমাত্র প্রত্যেকের সম্মিলিত সম্মতিতে পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থা বলেই উল্লেখিত রূপ 'শাসক-শাসিতের' সম্পর্ক লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হলেও প্রথাগত গণতন্ত্র হিসাবে গণ্য নয়; এবং

(৬) অনুচ্ছেদ-৩, দ্বারা শুধুমাত্র বাংলাকে " রাষ্ট্রভাষা" গণ্য করার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের অপরাপর ভাষাকে রাষ্ট্রিক বলে- গায়ের জোরে গুরুত্বহীন ও মর্যদাহীন করা হয়েছে। অথচ, রাষ্ট্রের অন্যতম অংগ খোদ সুপ্রিমকোর্ট বাংলা নয়, ব্যবহার করে ইংরেজী ভাষা । ফলে- সংবিধান সমর্থন ও সংরক্ষণের কর্তৃত্ব হয়েও সুপ্রিম কোট যেমন উক্তমর্মে সংবিধান অমান্যকারী তেমন অত্র সংবিধানমূলে " ন্যায়বিচারিক" কর্তৃত্ব হয়েও অন্তত ভাষা প্রশ্নে সুপ্রিমকোর্ট সাংবিধানগতভাবে ন্যায়বিচারিক নয়।

তবে, রাষ্ট্রের ভাষা "বাংলা" লিখে বাংগালীত্ব স্বপ্রমাণের চেষ্টা করা হলেও বাংগালীত্ব যেমন সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের সহায়ক নয়, তেমন কেবল সংস্কৃত ভাষাই নয় ইংরেজী ভাষার " চেয়ার" বা পূর্তগীজ ভাষার " আলমিরা", " সুরংগ" সহ বহু ভাষার বহু

শব্দরাজির সমন্বয়ে গঠিত বাংলাভাষাও আদি-অকৃত্রিম নয়। কাজেই, "সুপ্রিমকোর্ট"-র বংগানুবাদ যেমন আবশ্যকীয় নয়, তেমন অকৃত্রিম বাংলা ভাষা ব্যবহারেরও সুযোগ নাই। সুতরাং, তদার্থে গোয়ার্তুমি যেমন প্রতিক্রিয়াশীলতা তেমন ভন্ড-মূঢ়দের ফালতু দাম্ভিকতা।

উল্লেখ্য- আমেরিকার বসবাসকারী ইউরোপীয় মাইগ্রেন্ট সকলেই ইংরেজী ভাষী ছিল না বা আফ্রিকান বংশোদ্ভুত প্রেসিডেন্ট ওবামাও ইংরেজীতেই যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী দায়িত্ব সম্পাদন করেন। আবার ভারতের কোন অংশের জনগণই ইংরেজী ভাষী নয় । অথচ, ভারতের পার্লামেন্টে প্রধানত ইংরেজীতেই যেমন ভাষণ দান বা ঝগড়া-বিবাদ করা হয় তেমন কেন্দ্রীয় সরকারী দফতরে ইংরেজী ভাষাই ব্যবহৃত হয় এবং কংগ্রেস-সি.পি.আই (এম) এবং সি.পি.আই সহ সর্বভারতীয় পর্যায়ের সকল পার্টি বা সংগঠন দলীয় ঘোষণা-কর্মসূচী, সম্মেলনের রিপোর্ট ইত্যকার যাবতীয় বিষয়াদি ইংরেজীতেই করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে-সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে ব্যবহারিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা-কার্যকারিতা লাভ করেছে ইংরেজী। হিন্দি-উড়িয়া বা মালেয়ালাম ভাষাভাষী বা বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ভাষা বিষয়ে বিরোধী-বৈরীতা হাল আমলেও পরিলক্ষিত হলেও ইংরেজী ভাষার সর্বভারতীয় ব্যবহার নিয়ে বৈরীতা-বিরোধীতা বা মতান্তর নাই কারো মধ্যেই। কারণ-সমগ্র ভারতে ইংরেজী ছাড়া আর কোন বোধগম্য ভাষা নাই বলেই পীড়ক ইংরেজ জাতির ভাষা - ইংরেজী ভাষার অর্থাৎ কেবল ইংরেজী ভাষার আশ্রয় নিয়েই ভারতের সকল অংশের জনগণের মধ্যে ভাব-বোধের আদান করতে হচ্ছে।

নিজেরা কেন আদি ও মৌরশী তার কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই সংগঠনের নামাকরণের মাধ্যমে বাংগালীদেরকে বিদেশী বা পরবাসী গণ্যে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের নেতারাও নিজ নিজ ভাষা-সংস্কৃতি ও কথিত আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবী সম্বলিত বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করে থাকেন বাংলায়। অথচ, ইতিহাসের নিয়মেই যা হারিয়ে গেছে বা যায় তা যেমন পুনর্বহাল করার চেষ্টা না করাই আধুনিকতা তেমন যে কোন কারণেই একদা পাহাড়-জংগলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাহীনতায় ভগ্ন-অর্ধ নগ্ন দেহ সমেত অমানবিক জীবন যাপনে বাধ্য জানসমষ্টিকে আধুনিক সভ্যতার সুযোগ হতে কেবলই আদি-ইত্যাদির অজুহাতে বঞ্চিত রাখা চরম প্রতিক্রিয়াশীলতার নামান্তর বৈকি। তাছাড়া-রাজধানী ঢাকা সহ শহরাঞ্চলে বসবাসকারী কথিত আদিবাসী বা পাহাড়-পর্বতের বাসিন্ধা হয়েও যাঁরাই নগর জীবনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে তাঁরা কি কালভদ্রে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া নিজ বা পূর্ব প্রজন্মের ভিটায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে রাজী হবেন? তবুও, কেবলই জাত-পাতের দোহাই দিয়ে পাহাড়ের গরীব বা শ্রমজীবী মানুষকে কেন নিরাপদ ও সমতল ভূমিতে বসবাস করার সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে পাহাড়ী জীবনের দু:সহাবস্থা হতে মুক্তি দেওয়া হবে না? প্রায় ২লাখ বছর আগে আফ্রিকায় জন্ম লাভ করলেও জীবনের তাগিদেই মানুষ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, নিরাপদ বসতির সন্ধান করেছে এমনকি ২২ হাজার বছর পূর্বে মানুষ পায়ে হেঁটে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে বা কেবলমাত্র মাছের জন্যও মানুষ অভিবাসী হয়েছে মর্মে প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ দাবী করে থাকেন।

অত:পর, ভারত-আমেরিকা যেমন ইংরেজী ব্যবহার করছে তেমন আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যকার বিষয়াদি সংগঠন-সম্পাদনে এমনকি জাপানের মতো তীব্র ইংরেজ বিদ্বেষীরাও ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার করে শুধু নয় জাপানী প্রডাক্টের নামকরণ করা হয় ইংরেজীতে। সুতরাং- মানুষ পরস্পরের সহিত মেলবন্ধনে আবদ্ধ হতে যেমন ভাষার উদ্ভব করেছিল তেমন মাত্র ৪৭০০ বছর পূর্বে ভাষার লিখিত রূপ দানের জন্য অক্ষর বা বর্ণমালা আবিস্কার করেছিল। অনুরূপ শ্রেণীমুক্ত-রাষ্ট্রমুক্ত বা কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মুক্ত বিশ্বের মুক্ত মানব জাতি শাশ্বত শান্তির আবহে বসবাসের নিমিত্তে বৈশ্বিক পরিসরে নিজেদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাবার প্রয়োজনে কালক্রমে একটি সার্বজনীন ভাষা সৃজন-উদ্ভাবন করবে।

অত:পর, সাম্যবাদী সমাজের উপযোগী তথা মানবজাতির বৈশ্বিক পরিভাষা গড়ে উঠার পথেও যেমন ভাষা সম্পর্কিত উক্ত ৩ নং অনুচ্ছেদ প্রবল প্রতিবন্ধক তেমন বাংলাদেশের অপরাপর ভাষাভাষী জনগণের উপর ভাষাগত জবরদস্তি করায় উক্ত অনুচ্ছেদের কারণেই অত্র সংবিধান গণতান্ত্রিকতো নয়ই এমনকি নানান ভাষা-ভাষী ও জাত-জাতির সমন্বয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনকারী দলিল হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয়।

(৭) সাম্যবাদী নীতি ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সূত্র-তত্ত্বের সহনির্মাতা ফে. এংগেলস "পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি " নিবন্ধ, রচনাবলীর ২১০ নং পাতায় উল্লেখ করেছেন -আরাগনে **ক্যাথলিক ফার্ডিন্যান্ড ১৪৮৬** সালে "কৃষক বধুদের প্রথম রাত্রির অধিকার --------সহ ভূস্বামি কর্তৃক কৃষক সন্তানসন্ততিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিনামূল্যে বা মূল্য দিয়ে তাদের সেবা গ্রহণ " করার প্রথা রদ ও নিষিদ্ধ করেছিলেন। অথচ, ইন্ডিয়ার ফাষ্ট প্রাইম মিনিষ্টার, ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কর্তৃত্বে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৩ দ্বারা ব্যাখ্যাকৃত শোষণ অর্থ -" মানুষ পাচার এবং বেগারী ও অনুরূপ জোর পূর্বক শ্রম " যা মূলত,সামন্তবাদী ব্যবস্থার অংগ ও বৈশিষ্ট্য বলেই অনুরূপ শোষণমুক্তি অর্জন বা অনুরূপ শোষণকে উচ্ছেদ করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রিয় নীতি হিসাবে "সমাজতন্ত্র" বর্ণিত হলেও কার্যত, সমাজতন্ত্র নয়, পুঁজিবাদের প্রারম্ভেই অনুরূপ শোষণমুক্তি নিশ্চিত করা সম্ভব এবং ফার্ডিন্যান্ড অন্তত অনুরূপ শোষণকে উচ্ছেদ করার বিহীত করেছিলেন বলে নিশ্চিত করেছেন ফে.এ্যাংগেলস। তবে, শ্রম শোষণ করা ব্যতীত বা শ্রমের প্রকৃত পারিশ্রমিক প্রদান করা হলে পুঁজিপতি কর্তৃক মুনাফা অর্জন বা লাভ গ্রহণ বা পুঁজি সৃষ্টি বা মৃত শ্রম আত্মসাৎ করা সম্ভব নয়। কাজেই, পুঁজিবাদের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন অর্থাৎ শ্রমশোষণের মুল সূত্র উদ্বৃত্ত-মূল্য তত্ত্ব দ্বারা সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্মাতা কার্ল মার্কস এ সত্য প্রমাণ করেছিলেন ।

এখনো এ তত্ত্ব অভ্রান্ত হিসাবে স্বীকৃত ও গণ্য বলেই পুঁজি বা পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ হতে শ্রমকে অবমুক্তকরণে - পুঁজিবাদ ও পুঁজির নৈরাজ্যিক কর্তৃত্বের ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ তথা মুনাফা ও মধ্যস্বত্বভোগী অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর কর্তৃত্ব বিনাশ-অবসান কল্পে রাষ্ট্রের জন্মকালীন বৈশিষ্ট্য- "সাধারণ জনগণ থেকে স্বতন্ত্র একটি সামাজিক শক্তি" রূপ সংগঠন নয়, বিপরীতে বেচা-বিক্রিহীন, মুনাফাহীন-লাভমুক্ত বা মধ্যস্বত্বভোগীর

কবলমুক্ত,শোষণহীন-শ্রেণী হীন তথা ট্রেড-কমার্স বিমুক্ত ও ফিনান্স পুঁজির প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাংক-বীমাহীন, জুয়াড়ী সমেত ফটকাবাজারীর ষ্টক একচেঞ্জ বিযুক্ত, যুদ্ধাস্ত্রসহ যুদ্ধা বা খুনিবাহিনীহীন এবং দমন-পীড়নের হাতিয়ার পুলিশ-কোর্ট-কাছারী ও কয়েদখানা মুক্ত একটি সমাজ কেবল আবশ্যকই নয় বরং সেরূপ একটি সমাজ পুঁজিবাদেরই অবশ্যসম্ভাবী পরিণতি।

অত:পর, মধ্যস্বত্বভোগী বা উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকারী বা তদার্থে যেকোন কর্মে নিয়োজিত পেশাজীবী ও তদানুরূপ সকল অকর্মন্য-ক্ষতিকর পেশা বা প্রত্যক্ষ উৎপাদনের মাধ্যমে সামাজিক মূল্য সংযোজনে অক্ষম সকল পেশা বিযুক্ত অর্থাৎ মানবজাতির প্রগতির প্রতিবন্ধক- ব্রাহ্মণ্য ধাঁচের বুদ্ধিজীবী-তাত্ত্বিক, বুজরুক ও পরামর্শক বা অনুরূপ অনুৎপাদনশীল পেশা ও পেশাজীবীহীন সমাজই সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

তাছাড়া- মানবিকতার প্রতিবন্ধক ও মানবজাতির জন্য লজ্জাজনক মানুষের জেন্ডার ভিত্তিক পরিচিতি ও সম্পর্কের কদার্থক, বিশ্রি-কুৎসিৎ ধ্যান-ধারণা ও বোধের অভিশাপমুক্ত বা জেন্ডার ভিত্তিক সম্পর্কের হেতুবাদে অংগ বিশেষকে লাজ-লজ্জার উপকরণ ও উপাদান গণ্যে তাপানুকুল পোষাক-পরিচ্ছদের কার্যকরতা ও তারতম্যকে অস্বীকার করে কেবলই নাকি লজ্জা নিবারণে তথাকথিত সভ্যতার আবরণের বোধ ও বস্ত্রাবৃত হয়েও কেবলই জেন্ডার ভিত্তিক সম্বোধনে -দৈহিক অংগ বিশেষ তথা কথিত লাজ-লজ্জার উপদান-উপকরণ নিরত প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষে মানুষে পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে- বৈষম্য ও বৈরীতা বজায় রাখায় -বাহাদুরী ও হীনমন্যতা,আধিক্য ও অধীনতা, সক্রিয়তা ও নিস্ক্রিয়তা, লাম্পট্য ও শ্লীলতা, ব্যভিচার ও সতীত্ব ইত্যাকার সাবেকী ধারণা এবং তজ্জনিত বিরোধ ও বৈরীতা মুক্ত হিউম্যান বিয়িং বা ম্যানকাইন্ডের সদস্য রূপ মানুষ পরিচিতি অর্থাৎ প্রত্যেকেই কেবলমাত্র মানুষ পরিচয়ের অধিকারী বলে জেন্ডারভিত্তিক রক্ত সম্পর্ক বা উত্তরাধিকার নির্দিষ্টকরণের পারিবারিক সম্পর্ক ও বন্ধন (পরিবারের পত্তনকালীন মর্মার্থ হচ্ছে -গৃহস্ত দাসত্ব বা ঘরোয়া দাস বা এক ব্যক্তির অধিকারভুক্ত সমস্ত ক্রীতদাস ইতাদি) দ্বারা স্থিরকৃত সংকীর্ণ আত্মীয়তা বিধি তথা জেন্ডার ভিত্তিক -যৌনতা কেন্দ্রিক আত্মীয়তার সম্পর্ক ভুক্ত নয় বরং মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের আত্মীয় রূপ মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ এবং জেন্ডার কেন্দ্রীক নাম-পরিচয় মুক্ত ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে সভ্য-স্বাধীন মুক্ত মানুষ হেতু জেন্ডার ভিত্তিক-কেন্দ্রীক বা রক্তসম্পর্কিত বা পরিবারিক গন্ডির সীমিত ও ক্ষুদ্র মানুষ নয়, বরং স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের জন্য ক্ষতিকর এতদসম্পর্কিত সকল বোধ-সংস্কৃতিসহ জাতি-উপজাতি,গোত্র-গোষ্ঠি,রং-বর্ণ ইত্যাদির মতো তামাম সংকীর্ণবোধ ও অভিশপ্ত ধ্যান-ধারণা মুক্ত কেবলমাত্র মানবিকতার সম্পর্কযুক্ত মর্মে কেবলমাত্র মানবজাতির সদস্য হিসাবে বিশ্ব মানব প্রত্যেকেই ইক্যুয়েলী মর্যাদাবান বিধায় প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সখ্যতা-সমতা স্থাপনে-পারিবারিক গন্ডীমুক্ত ও শ্রেণী মুক্ত অর্থে রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল বিযুক্ত এবং রাষ্ট্র হীন বা রাষ্ট্র রক্ষক বৈশ্বিক সংগঠনহীন বিশ্বে এক বিশ্ব সমাজের মুক্ত বাসিন্দা হিসাবে প্রত্যেকে সুষম সম্পর্কাধীন মানুষ হিসাবে সাম্যবাদী ।

মানববান্ধব পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগি প্রকৃতি করায়ত্তকরণে সদা সচেষ্ট স্বাধীন-মুক্ত মানুষের সমন্বয়ে গঠিত পরিপূর্ণ মানবিকতার বৈশ্বিক সমাজ তথা শ্রেণীহীন-সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণে- রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের অবসান ঘটা প্রসংগে- " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" পুস্তক,রচনা সংকলনের ১৪৬ পাতায় ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস, লিখেছেন- " প্রলেতারিয়েত ক্ষমতা দখল করে উৎপাদনের উপায়কে পরিণত করে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে । কিন্তু তা করতে গিয়ে প্রলেতারিয়েত হিসাবে তার আত্মাবসান ঘটে, লুপ্ত হয় সমস্ত শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণী বৈরীতা, রাষ্ট্রের রাষ্ট্র হিসাবে যে অস্তিত্ব তা বিলুপ্ত হয়।" এবং রচনা সংকলন,১৪৭ পাতায় অর্থাৎ ঐ পুস্তকেই তিনি আরো লিখেছেন- "সমাজের নামে উৎপাদন উপায়গুলোকে দখল করা-সেটাই হল একালে রাষ্ট্র হিসাবে তার শেষ স্বাধীন কাজ । সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র অনাবশ্যক হয়ে উঠতে থাকে এবং তার পর সে নিজেই মরে যায়; লোক শাসন করার স্থানে আসে বস্তুর ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালন।"

অর্থাৎ লোকের শাসন নয়, উৎপাদনী পরিচালনা ও বস্তুর ব্যবস্থাপনাই সমাজকে পরিচালিত করবে। সুতরাং, ইত:পুর্বে মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব সাধনে সৃষ্ট ও উদ্ভুত সকল উপাদান বা হাতিয়ার বিলীন ও বিলোপকরণের নিমিত্তে রাষ্ট্র ও হালের রাষ্ট্র রক্ষক বৈশ্বিক সংগঠন ইত্যাদির মৃত্যু সুনিশ্চিতকরণে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর কর্তৃত্বে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত সাংগঠনিক ব্যবস্থাই -সমাজতন্ত্র বিধায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকল ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক-মালিক কেবলমাত্র শ্রমজীবী মানুষ।

অথচ, বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭। " প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ", ও " জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন; " বিধায় শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের একাধিপত্য ও কর্তৃত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। বিপরীতে- অশ্রমিক,অশ্রমজীবী বা মুনাফাখোর ও সুদ-লাভ বা লভ্যাংশভোগী বা মধ্যস্বত্বভোগী- শিল্পপতি,ভূমিপতি, ব্যবসাদার ও পুঁজিপতি শোষক ও পরজীবী ব্যক্তি-গোষ্ঠী ও শ্রেণীকে, ক্ষমতার মালিক স্বীকার ও গণ্য করার উল্লেখিত ৭ নং অনুচ্ছেদটি কার্যত ," রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" রূপ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ- ১৪, এবং অনুচ্ছেদ- ২০, " কর্ম হইতেছে প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার------- " প্রত্যেকের নিকট হতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।" রূপ ইত্যকার সকল অনুচ্ছেদের সহিত বৈরী ও পরিপন্থী ।

প্রকৃতপক্ষে শোষণ-পীড়নে সর্বাধিক কার্যর ও ভয়ংকর যন্ত্র-রাষ্ট্র বিশেষ গঠনকারী দলিলে উল্লেখিত অনুচ্ছেদগুলো কেবলই নিরর্থক ও অসার এবং তদার্থে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা। তদ্ভিন্ন উক্ত ৭ নং অনুচ্ছেদটি অত্র সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রিক নীতিমালা, অনুচ্ছেদগুচ্ছ- যথাক্রমে ১০,১১, ১৩,১৫,১৬,১৮, ও ১৯ এর সহিত সামঞ্জস্যহীন ও সাংঘর্ষিক বলেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধাভোগী বা নতুন-পুরাতন বা ভূইফোঁড় ধনিক ও তাদের সহযোগী অনুরূপ শোষকগোষ্ঠী সকলে রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য লাভ বা

রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র তাদের বিত্তবাসনা পরিপুরণের হীনস্বার্থে নিজেদের মত করে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে বলে প্রায় আদিমতম পন্থায় গার্মেন্টস শ্রমিকগণকে নিত্য শোষণ করছে আধুনিক পুঁজিওয়ালা নামক ফিউডাল ক্যারেক্টারের মালিক ও করফাঁকিবাজ-ফেরেববাজ তস্কর এবং চাকুরিসহ পেশাগত বা জীবনের স্বাভাবিক নিরাপত্তা হারিয়েছে অপরাপর শ্রমজীবী জনগণ। ৭নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধাভোগী -পুঁজিপতিরা অনুরূপ শোষণমূলক ব্যবস্থা পাকাপোক্তকরণে অসাংবিধানিক জুররী আইন -সেনা শাসন পুন:পুন জারী ও বহাল করা সহ নানান বিহীতাদি সম্পন্ন -সম্পাদন ও সংগঠনে সফল হয়েছে বিধায় বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত আয় নিত্য কমছে বাড়ছে দারিদ্র ।

উল্লেখ্য-'৪০% জনের দৈনিক আয় ২২ টাকা' লিড নিউজ হিসাবে চেপেছে ২২ নভেম্বর,২০০৯ তারিখের ঢাকার দৈনিক সংগ্রাম। সরকারী তথ্য-উপাত্তও অনুরূপ তথ্যের অসারতা নিশ্চিত করে না। কাজেই, শ্রমিকশ্রেণীর অনুরূপ নাজুক দারিদ্রাবস্থা জারী রেখে খোদ বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পুঁজিওয়ালা ধনীক শ্রেণীর পুঁজি ও ধন সৃষ্টি ও বৃদ্ধির সর্বাধিক কার্যকর এক হাতিয়ার হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিধায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের " শাসক" সাব্যস্তকরণের ভোটাধিকার প্রয়োগের অবাধ সুযোগও প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবী জনগণের নাই হেতু "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"কার্যত, বাংলাদেশের ধনীকশ্রেণী ।

তদপুরি, অনুচ্ছেদ-২১ । " সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃংখলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য" বলেই দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি সংবিধান সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত থাকবেন-জানবেন ও বুঝবেন এবং তবেই তো জনগণ সংবিধান মান্য করাসহ সাংবিধানিক কর্তব্য পালনের সুযোগ পাবেন। উল্লেখ্য-ব্যাবিলনের সম্রাট হাম্মুরাবী কর্তৃক খ্রীষ্ট পূর্ব-১৭৬০ সালে প্রণীত সংবিধান জনগণের জানার জন্য দেশের বিভিন্ন পাবলিক প্লেস বা জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাথরে খোদাই করা বহু কপি স্থাপন করা হয়েছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব ৬২০ সালে ড্রাকো প্রণীত নগর রাষ্ট্র এথেন্সের সংবিধানখানিতে শিক্ষিত নাগরিকগণের জানার ব্যবস্থা সম্বলিত অনুচ্ছেদ ছিল। অথচ, বাংলাদেশের সংবিধান দেশের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্ত র্ভুক্তকরণ সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার অফিস ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ বা সংবিধান বিষয়ে জনগণকে সম্পূর্ণরূপে অবহিতকরণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংবিধানে নাই হেতু অত্র সংবিধান তদার্থে অপূর্ণতা-সীমাবদ্ধতা, স্ববিরোধীতা-অসমঞ্জস্যতা, সাংঘর্ষিতা-অকার্যকারিতা , ভ্রান্তি -বিভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দোষে মারাত্মকভাবে দুষ্ট। অত:পর, বাংলাদেশের সংবিধান- গণতান্ত্রিক নয়, এমনকি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের উপযোগীও নয় ।

খ) ব্রিটিশের কালেক্টর বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্বীয় ছাত্রজীবনে লিখিত "সাম্যবাদ" কবিতা যেমন প্রত্যাহার করেছিলেন,তেমন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী সাভারকারের " হিন্দুত্ববাদের" সোনালী অতীতের মোহাচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে -প্রয়োজনে প্রভু ইংরেজকে রেখে "যবন" তাড়িয়ে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠায় দেবী চৌধুরানীর মতো উপন্যাস এবং "বন্দে মা তরম"

নামীয় কবিতাও লিখেছেন। কারণ, তিনি শিক্ষিত,প্রভু ইংরেজের ভৃত্য ও ব্রিটিশ রানীর গোলাম, সর্বোপুরি, পুঁজির হুকুমের দাস। ভারতে ইংরেজ কর্তৃক চালুকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা পত্তনে গঠিত ১৮৩৬ সালের শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান লর্ড ম্যাকলে তদীয় কমিশন রিপোর্টের মুখবন্ধে- ভারতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসংগে ভারতে জন্ম নেওয়া কালো মানুষ যারা শিক্ষিত হয়ে পরিণত হবে কালো ইংরেজ তথা একজন লোক জন্ম নিবে ভারতে কিন্তু কোম্পানী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আচার-আচরণে সে হবে একজন ইংরেজ অর্থাৎ কালো ইংরেজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য লিখে সত্যি সত্যি ভারতে অসংখ্য কালো ইংরেজ তথা বঙ্কিম বাবু বানাতে সফল হয়েছিলেন। কতিপয় ব্যতিক্রম হিসাবের মধ্যে না নিলে সাধারণভাবে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়রা যে, শোষক ইংরেজের বেতনভুক দাস ও স্থানীয় এজেন্ট হবেন,তাতো ম্যাকলে সাহেব তার রিপোর্টেই নিশ্চিত করেছিলেন।

বেনিয়া ইংরেজ চতুর ও হিসাবী বটে। নিরক্ষর শ্রমিকের তুলনায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিক অধিকতর উৎপাদনশীলতার অধিকারী ও যোগ্য-দক্ষ এবং দেশের সকল লোককে মাধ্যমিক স্থরে শিক্ষিত করার ব্যয়ের তুলনায় অনুরূপ শিক্ষিত শ্রমিকের মাধ্যমে ল্যাংকাশায়র সহ ইংল্যান্ডের শিল্প-কারখানা পরিচলনা করার মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদনের আনুপাতিক ব্যয় কম বলেই অধিকতর মুনাফা অর্জনে কষ্ট ইফেক্টিভ উৎপাদন নিশ্চিতকরণে শিল্পপতি-মার্চেন্টদের স্বেচ্চায় দেয় চাঁদা ও প্রস্তাবমতো টরি দল সরকারীভাবে ১৭৫০ সালে ইংল্যান্ডে সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। বহুল বিস্তৃত ও বিশাল উপনিবেশের দখলদার বৃটেনে প্রয়োজনীয় - পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত জনবলের অভাব, ব্রিটিশ ষ্ট্যান্ডার্ডে বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা এবং বৈদেশিক ভাতা সহ বার্ষিক ছুটি ইত্যাদির তুলনায় অনেক কম বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সমাধিক কর্ম আদায় এবং বিনা খরচে দেশীয় দালাল-সহযোগী পাওয়ার জন্য ম্যাকলে সাহেবের রিপোর্টমতো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছিল।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে " কষ্ট ইফেক্টিভ প্রডাক্টশন" নয়, বরং সকলের যোগ্যতার সর্বাধিক বিকাশ ও সকলের দক্ষতার সর্বাধিক ব্যবহার মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক উৎপাদন নিশ্চিতকরণে সুস্বাস্থ্য এবং প্রতিবেশ-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সামাজিক ও মানবিক বিষয়াদি সম্পর্কে বেসিক কনসেপ্ট সহ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট-সম্পৃক্ত তথ্য-উপাত্ত ও তত্ত্বাদি অর্থাৎ জ্ঞানার্জনে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা সমেত শিক্ষা কার্যক্রম আধুনিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে প্রত্যেককে সামাজিক খরচে শিক্ষিত করা। কাজেই বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করা অবান্তর। কিন্তু ইহজাগতিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ম্যাকলে কমিশন ভিত্তিক ব্যবস্থিত তথা বাংলাদেশে অতীতের চালুকৃত কোম্পানীর কেরানী তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি বাতিল করা আবশ্যক ছিল। যদিও অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৭ দ্বারা " একই পদ্ধতির গণমুখি ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য" এবং "আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দুর করিবার জন্য" রাষ্ট্রকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে বটে ।

কিন্তু, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অতীতের চালুকৃত সকল শিক্ষাব্যবস্থাকে বাতিল না করে এবং একই পদ্ধতির গণমুখি ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থাকে সংজ্ঞায়িত না করে অথবা

ভোটাভোটির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা না বলে কৌশলে " সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য" বিবৃত করা হয়েছে বিধায় উৎপাদনের সহিত সম্পর্কহীন ও প্রকৃত মুল্য সংযোজনে অক্ষম এবং বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অযোগ্য বা উৎপাদনশীল শ্রেণীকে শোষণ-পীড়নে কার্যকর ও উপযুক্ত এবং অজ্ঞতা-অন্ধত্ব ও মিথ্যাচার এবং তদানুরূপ মিথ বা কল্পকথার বিষয়াদি বা কুসংস্কারময় ধ্যান-ধারণার প্রসার-বিকাশে অবৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান বিরোধী তথা গণবিরোধী মর্মে পূর্বকাল হতে চলে আসা নানান ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা-কার্যক্রম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এখনো বিদ্যমান শুধু নয়, বরং পুঁজিবাদের চাহিদা পূরণে জ্ঞান-শিক্ষাকে পণ্য গণ্যে অধিকতর মুনাফা অর্জনে পুঁজিবাদী প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সহ নানান ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা ও কার্যক্রম বাংলাদেশে হালে দ্রুতগতিতে চালু ও প্রসারিত হচ্ছে ।

অথচ, পাকিস্তান আমলে শিক্ষাকে পণ্য গণ্যে অনুরূপ মানদন্ডে শিক্ষা বাণিজ্যের প্রস্তাব সম্বলিত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পরিত্যক্ত হয়েছিল। উক্তরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার হেতুবাদে তৈরী হচ্ছে ও বহর বৃদ্ধি করছে যোগ্য-অযোগ্য, অকর্মণ্য , বেকার-অর্ধ বা প্রচ্ছন্ন বেকারসহ নানান ধরণের বৈষম্য ও বৈরী সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর বিরোধী বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন জনগোষ্ঠী। তদপুরি, তুলনামূলকভাবে পাকিস্তান আমলের মতোই বহু সংখ্যক মানুষ এখনো নিরক্ষর বা নূন্যতম শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়ে আসছে। ২০০৯, জুলাইতে আপডেটেড সি.আই.এর ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুকের তথ্য মতো- বাংলাদেশে নিরক্ষতার হার ৫৭% । যদিও, ঐসকল নিরক্ষর -দরিদ্রজনের করের অর্থে পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হয়ে থাকে বলেই উক্ত ১৭ নং অনুচ্ছেদ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৮ ও ১০,১৯,২০,২৭,২৮,২৯ ও ৩১ এর সহিত সাযুজ্যহীন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ।

গ) "নারী" ও "পুরুষের" সম অধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিতয়তা করা বিষয়ক অনুচ্ছেদ-২৮ ও ২৯ দ্বারা অমানবিক ও অবৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের পরিচিতি নিয়ামক (আইডেন্টিটি ষ্ট্যান্ডার্ড) মর্মে শিশ্ন ও যোনি বিবেচিত-গণ্য বিধায় ' হিজড়া', মানুষ প্রজাতিভুক্ত প্রাণীর স্বীকৃতি পায়নি , চিহ্নিত নাই তাদের আইনানুগ অধিকার -কর্তব্য ও মর্যাদা। যদিচ, বন্ধ্যা ও নপুংষক বিদ্যমান আইনে সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী বটে এবং "---বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাহিরে যে ভাবেই ভূমিষ্ঠ হোক না কেন, সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।" রূপ বর্ণিত বটে বিশ্বজনীন মানবাধিকার সনদ, অনুচ্ছেদ-২৫(২) বিধায় বংশ বিস্তারের অংগ হীন মর্মে প্রেগনেন্সি বা বংশ বৃদ্ধির কাজ ব্যতীত হিজড়ারা অপরাপর উৎপাদনমূলক ও সামাজিক কর্মে উপযুক্ত মানুষ বলে হিজড়াগণকেও উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষাসহ সামাজিক-মানবিক মর্যাদা প্রদানে জন্মগত শর্তে বাংলাদেশ অংগীকারাবদ্ধ বলে জেন্ডার ভিত্তিক তথা " নারী" ও "পুরুষ" মর্মে পরিচিতি নয়, বরং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হিজড়াসহ সকল মানুষ হিউম্যান বিয়িং হিসাবে কেবলমাত্র মানুষ পরিচয়ে গণ্য হবে হেতু উল্লেখিত অনুচ্ছেদদ্বয় সমাজতন্ত্রতো নয়ই, এমনকি অত্র সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা সম্পর্কিত অপরাপর অনুচ্ছেদের সহিত অসমঞ্জস্যপূর্ণ ও সাঘর্ষিক এবং বৈরীতাপূর্ণ।

ঘ)সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও নির্বাহী বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও কর্তৃত্বের এখতিয়ার ও কর্তৃত্ব,দায় ও দায়িত্ব , ক্ষমতা ও অক্ষমতা এবং জবাবদীহিতা চিহ্নিত-নির্ণীত ও বিবৃত করার ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে গাণিতীক নীতি যথার্থভাবে অনুসরণ করা হয়নি। একই বিষয় নানান অনুচ্ছেদে নানানভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বা বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখলভাবে বিবৃত হয়েছে বলে এটি ওয়েল ফর্মেটেড নয়। এমনকি উক্ত মর্মে ১৭৮৭ সালে প্রবর্তিত আমেরিকার সংবিধানের নিকটবর্তীও নয়। উল্লেখ্য, আমেরিকার সংবিধান মাত্র ৭টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত। প্রেসিডেন্টের নিয়োগ-কার্যাবলী, ক্ষমতা-এখতিয়ার, কর্মকালীন সুযোগ-সুবিধা ও অসুবিধা এবং কর্মের বেতন-ভাতা নয়, কর্মকালীন সময়ের " ক্ষতিপূরণ" এবং শপথনামা ইত্যাদি মাত্র ৪ টি ধারা সম্বলিত "অনুচ্ছেদ-২",এ বর্ণিত হয়েছে।

অথচ, বাংলাদেশের - প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি, সি.ই.সি সহ অন্যান্য সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃত্বকারী ব্যক্তি ও কর্মবিভাগের কর্মকর্তা প্রমুখ নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়াদি, রাষ্ট্রপতির কর্ম হিসাবে একই সেকসনে বর্ণিত না হয়ে এতদ্বিষয়ক অপরাপর অনুচেছদে বিবৃত হয়েছে। এমনকি জাতীয় সংসদের মেয়াদ ও সংসদ সদস্যের শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি আইনসভা বিষয়ক পঞ্চমভাগে লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং অনুচ্ছেদ-৬।"নাগরিকত্ব", এ ভোটাধিকারের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ণিত না হয়ে অনুরূপ বিষয়াদি বিবৃত হয়েছে "নির্বাচন কমিশন" বিষয়ক, সপ্তমভাগ- "নির্বাচন" শিরোনামে বলেই ফরমুলেশন ও কাঠামো বিন্যাস যথেষ্ট মাত্রায় সমোপযোগী নয়।

ঙ) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অংগীকার-"সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণার্থে " মানব 'মুক্তি' বা শ্রেণীহীন-শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ বিষয়ক মার্কস-এংগেলস প্রণীত ১৮৪৭ সালের কমিউনিষ্ট ইশতেহারের বাক্যালংকার ভিত্তিক কতিপয় রাষ্ট্রীক নীতিমালা ঘোষিত হয়েছে। অথচ, সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহিত বৈরী ও সামঞ্জস্যহীন পুঁজিবাদী ধারণার এবং আমাদের একদা শাসক ও শোষক ব্রিটিশ ধাঁচের 'প্রধানমন্ত্রী নির্ভর-প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীক ও প্রধানমন্ত্রীর সন্তুষ্ঠি সাপেক্ষ মন্ত্রীমন্ডলীর' কথিত সংসদীয় সরকার কাঠামো-ব্যবস্থা বহাল করা হযেছে। তদপুরি-বিদায় আসন্ন জেনে ভারত হাত ছাড়া করার অনিবার্য পরিণতি প্রলম্বিত ও বিলম্বিত করণে অনুগত বিরোধী দলের প্রয়োজনে ব্রিটিশ রাজকীয় ভারতীয় আমলা মি: হিউমের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কৌশলী করুণায় রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেস ও গান্ধী বিরোধী হয়েও ভারতের আইন মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ কারী একদা ব্রিটিশ রাজের ভারতীয় গভার্নেস কাউন্সিলের চাকুরে সদস্য ড.বি.আর.আম্বেদকারের কর্তৃত্বে ব্রিটিশ রাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা-মোহাচ্ছন্নতায় ও ব্রিটিশ কলোনিয়াল প্রোডাক্ট ভারতীয় ভূমিওয়ালা, ধনীক-বণিক তথা টাটা-বিড়লাদের স্বার্থে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা নাজি সেন্সেলর যুদ্ধোন্মাদ এডলপ হিটলার কর্তৃক লেনিনবাদী বিপ্লব প্রতিহতকরণের ছুতায় ১৯৩৩ সালে প্রয়োগকৃত "সিভিল রাইট" ক্ষুন্ন-বিঘ্ন , কাটছাঁট,অস্বীকার ও অকার্যকারিতার ১৯১৯ সালের জার্মান সংবিধানের এতদ্বিষয়ক কুখ্যাত "অনুচ্ছেদ-৪৮" এর অনুকরণ ও অনুসরণে বর্বর "জরুরী" আইন হিসাবে চ্যাপ্টার-৮, ৩৫২ হতে ৩৬০ অনুচ্ছেদে সংযোজন করার মাধ্যমে প্রণীত ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালের ভারতীয় সংবিধান - সমাজতান্ত্রিকতো নয়ই,এমনকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসাবে শনাক্ত করার উপযুক্ত

নয়। তবু- ঐ সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের কিঞ্চিত সংযোজন-বিয়োজন ও রদ-বদল বা কোন কোন অনুচ্ছেদের বাক্য-শব্দ বিশেষের পূর্বাপর অবস্থানিক পরিবর্তন-কর্তন ও সম্প্রসারণ এবং অনেকগুলো অনুচ্ছেদের নকল বা প্রায় হুবুহু নকল বা অনুকরণ করা হয়েছে ।

তন্মধ্যে,উল্লেখযোগ্য-ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদগুচ্ছ, যথাক্রমে - ১৩,১৪,১৫,১৬,১৮,১৯,২০,২১,২২,২৩,৫০,৭৬(৪),১১০,১২৩,(১২৪+২১৭),১২৬, ১২৭,১৩০,১৩১,১৩৭,১৪১,১৪৪,১৪৫,১৪৬,১৪৭,৩২৪(৩),২৬৫,(৩৬৬+৩৬৭) এবং ৩৬৮(১) ও (২) এর অনুগামিতায় যথাক্রমে বাংলাদেশের সংবিধানের - ২৬,২৭,২৮,২৯,৩০,{১৯ এর সমার্থক মর্মে (৩৬,৩৭,৩৮,৩৯) } ৩৫,৩২,৩৩, ২২,৬৪(৪),৮১,৯৩,(৯৪+৯১+৯৬),৯৭,৯৮,১০০,১০১,১০৩,১০৫,১১১,১১২,১০৭, ১১৩,১০৬,১১৮(২),৮৩,১৫২ অনুচ্ছেদগুচ্ছ এবং অনুচ্ছেদ-১৪২(ক) ও (খ) এবং প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী সহ নির্বাহী বিভাগের অনুচ্ছেদ গুলো কিঞ্চিত রদ-বদল বা পূর্বাপর অবস্থান /স্থিতি পরিবর্তন বা সংযোজন-বিয়োযোজন করা হয়েছে মাত্র ।

অথবা, বিচার বিভাগ,নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,সরকারী কর্ম কমিশন ইত্যাদির গঠন-ক্ষমতা-এখতিয়ার বা কার্যাবলী প্রভৃতি ভারতীয় সংবিধানের কোন কোন ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তকরণ বা ক্ষেত্র বিশেষ পরিবর্তন বা অংশবিশেষ গ্রহণ,অনুসরণ ও অনুগামিতায় বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য-পারস্পর বিরোধী-বৈরী বা সামঞ্জস্যহীন ও সাংঘর্ষিক নীতি-দর্শন ও জুরিস্প্রুডেন্স ভিত্তিক রচিত -ব্রিটেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, প্রাচীন ভারত, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, সোয়িেভট ইউনিয়ন সহ কতিপয় রাষ্ট্রের সংবিধানগুচ্ছের বিভিন্ন অংশের জগা খিছুড়ী বা বারোয়ারী সংযোজনের নিট ফলশ্রুতি-ভারতের সংবিধানের প্রতি এমনতরো অন্ধ আনুগত্য, "মুক্তিযুদ্ধ","মুক্তিযোদ্ধা" ও "মুক্তিযুদ্ধ"-এর সমর্থক জগণের প্রতি যেমন আন্তরিকতার প্রমাণ বহন করে না তেমন লুণ্ঠন প্রবনতায় উক্তরূপ অনুকরণ, অনুগমন ও নকলীকরণ, সমাজতন্ত্রতো নয়ই এমনকি বাংলাদেশের সংবিধান, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি-অনুচ্ছেদগুচ্ছ-৮, ১১, ১৩,১৫,১৭, ১৯,২০,২১ ও ২৫ এ বর্ণিত নীতি মালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় ।

অনুরূপভাবে, পুঁজিবাদী শোষণের হেতুবাদে রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র দখল-বেদখল বা অর্থনৈতিকভাবে অধীনস্থ ও অধীনতামুক্ত হওয়ার উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকাবস্থায়ও দুনিয়াময় যুদ্ধ বন্ধ বা যুদ্ধ নির্মূলে আবশ্যকীয় করণীয় বা কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যুদ্ধের জন্য ব্যবহার না করা বা দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা ইত্যকার মৌলিক বিষয়ে নিশ্চুপ থেকে কেবলমাত্র "বিদ্রোহ" ঠেকানোর নিমিত্তে মেকি মানবতাবাদী ও কৃত্রিম মানব দরদীর ছদ্মাবরণের শোভন চেহারায় আভির্ভূত হতে জবরদখলকারী আমেরিকা-উপনিবেশিক ব্রিটিশ, যুদ্ধবাজ-ফ্যাসিস্ট চীন ও রাজতন্ত্রী ইত্যাদি সদস্য রাষ্ট্র ও প্রারম্ভিক পর্যায়ে ক্যাথলিক মিশনের প্রতিনিধি সমেত মার্কিনী ঘরানার কিউবা ও

ফানামার ডেলিগেটদের ড্রাপ্ট কমিটিতে অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে প্রণীত এবং পাকিস্তান সহ ৪৮ টি রাষ্ট্রের সমর্থনে গৃহীত জাতিসংঘের তথাকথিত "সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা" - ১৯৪৮ এর কতিপয় অনুচ্ছেদ,অত্র সবিধানে মৌলিক অধিকার মর্মে সংযুক্তকরণের মাধ্যমে অত্র সংবিধান প্রণীত ও তৈরীকৃত বলে ও অনুরূপহেতুবাদে অত্র সংবিধান কার্যত ঐ সকল নানান দলিলাদির কার্টপিসের জোড়া-তালি দেওয়া এক পুস্তক বিশেষ মাত্র।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী স্বয়ং স্রষ্টা বলে জাল-নকল ইত্যকার বিষয় কখনো শ্রমিকশ্রেণীর কর্ম নয়, বরং জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত করে ঠকিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী নিত্যই উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের পরিমান-মাত্রা বাড়িয়ে পুঁজি সঞ্চয় করে থাকে হেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সকল সুযোগ-সুবিধা বিলোপে একমাত্র সামাজিক বর্গ শ্রমিকশ্রেণীকে জন্ম ও বিকশিত করে যে পুঁজিবাদ, তৎসম্পর্কে অর্থাৎ পুঁজির গোপন রহস্য মার্কস কর্তৃক আবিস্কৃত হওয়ার পর সমাজতন্ত্র হয়ে উঠেছে "বিজ্ঞান" বিধায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের -দর্শনে জাল-জালিয়াতি বা ভুয়ামির সুযোগ-অবকাশ নাই হেতু উক্তরূপ জাল-নকল ও নকলীকরণের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশের সংবিধানকে "সমাজতান্ত্রিক" সংবিধান হিসাবে গণ্য -চিত্রিত করার মতো অসমাজতান্ত্রিক কর্ম আর কি হতে পারে? এমনকি, স্বাধীন রাষ্ট্র বিশেষ গড়ে তোলার জন্য এমন নকলীকরণ-অনুকরণ বা অনুগামিতামূলে প্রণীত সংবিধান কার্যকরী হতে পারে কি ?

অত:পর, অত্র সংবিধানে জন্মকালীন নকলীকরণ দোষে অতিমাত্রায় দুষ্ট বলে সংবিধান প্রণেতারা সমাজতন্ত্র -গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা বিষয়ে হয় অজ্ঞ-মূঢ় না হয় ভন্ড-ধান্ধবাজ। উপরন্ত অত্র সংবিধান- কার্যকরণে বা অনুশীলনেও বা তদমূলে রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় ছিল অযোগ্য- অনুপযুক্ত ও অপরিপক্ক অথবা কেবলই পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতায় সীমাবদ্ধ বুর্জোয়াশ্রেণীর তদমর্মে কেবল অক্ষমতাই নয় বরং তদসহযোগে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও সমর্থনকারী শ্রমিকশ্রেণী অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাতেই এমন একটি কিম্ভুতকিমাকার সংবিধান নকলমূলে প্রণয়ন করায় তা কার্যকর হয়নি; অথচ, সংবিধানের অনুরূপ অকার্যকরতা বা তলিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের দায়-দায়িত্ব স্বীকার না করে বা তদার্থে যথাযথ বিহীতাদি না করে এখন কেবলই তা বাস্তবায়নে তাঁরা মায়া কান্না করেন। এমনকি কেউ কেউ 'ডিরেইলড' রাষ্ট্রকে সেনাশক্তির জোরে টেনে সোজা করতে তথা সিভিল-মিলিটারী অংশীদারীত্বের স্বৈরতান্ত্রিক নিহড়ে নাগরিকগণকে আবদ্ধ এবং আরো মাত্রাতিরিক্তহারে শোষণে শ্রমিকশ্রেণীকে বন্দুকের নলের দ্বারা বাধ্যকরণে কার্যত ও স্বীকৃত ভাংগাচুরা রাষ্ট্রটিকে সচল রাখার অপতৎপরতা চালান। সুতরাং- নকলীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রণীত হেতু এটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী সংবিধানও নয়, গণতান্ত্রিক হওয়ার প্রশ্নতো অবান্তর।

চ) গোত্র প্রথার বিরোধ-বিশৃংখলা নিরসনে " এথেনীয়:প্রতিবেশী উপজাতিগুলোর একটি সরল সমামেলের জায়গায় এখানে সমস্ত উপজাতি পরস্পরের মধ্যে বিলীন হয়ে একটি মাত্র জাতি তৈরী হল।" মর্মে থিউসের সংবিধান দ্বারা এবং সোলন কর্তৃক প্রণীত খ্রীষ্ট পূর্ব-৫৯৪ সালের সংবিধান- "ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা" করেছিল বলে এথেনীয়

রাষ্টে "আরেকবার গোত্রপ্রথার পরাজয় হয়েছিল" এবং শেষত "গোত্র প্রথার শেষ কাঠামোও ধ্বসে পড়ল" ক্লিস্টিনিসের খ্রীষ্ট পুর্ব ৫০৯ সালের সংবিধানের মাধ্যমে বলেই সমগ্র এথেন্সবাসী একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনস্থ হয়েছিল হেতু রক্ত সম্পর্কিত বা রক্তসম্পর্ক হীন দেশী-বিদেশী সহ সকলকেই " ভূখন্ডসংশ্লিষ্ট" অধিবাসী হিসাবে একই কর্তৃত্বে উন্নীতকরণের আদিম গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এথেন্স এর মতই রোম ও জার্মানে গোত্র প্রথার অবসান ঘটিয়েছে জাতি রাষ্ট্র, এমনটা জানিয়েছেন ফে. এ্যাংগেলস, তাঁর "পরিবার,ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" পুস্তকে ।

অথচ, মনু সংহিতার-আদিমানব "মনু", হোমারের "ইলিয়ডে" আদিজনক "জিউস" রূপ নানান মাইথলজি বা গ্রোটের " ষোল পুরুষ পুর্বেকার আদিজনককে দেবতারূপে" মান্য করার অপূর্ণাংগ "গ্রীসের ইতিহাস" নির্ভর ক্লেন বা সন্তান জন্মে- অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতা বশত জন্মদাত্রীর ভূমিকাকে অস্বীকার করে উত্তরাধিকার নিশ্চিতিতে কেবলই জন্মদাতার একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রক্তসম্পর্ক জনিত গোত্রীয় ধারণায় আচ্ছন্ন বা মোহাচ্ছন্ন কূপমন্ডুকদের সৃষ্ট জাতির "জনক" ইত্যাদিতো নয়ই, এমনকি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী রূপ "সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক কোন পদাধিকারী ছিল না " ইতিহাসের প্রচীনতম রাষ্ট্র-এথেন্সে। কিন্তু, "সমাজতান্ত্রিক" বাংলাদেশের কার্যত ১ টি বিষয় ব্যতীত "রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন" বিধায় প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃক নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হওয়া ও প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুরূপ মন্ত্রীসভা এবং প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে মন্ত্রীসভার প্রত্যেকের পদত্যাগ স্বয়ং কার্যকর হওয়া এবং কার্যত প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভোট দিলে সংসদ সদস্য পদ হারানোর মতো বিধানাদি অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদগুচ্ছ-৪৮, ৫৫, ৫৬,৫৭,৫৮ ও ৭০ দ্বারা কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীকে প্রায় একক কর্তৃত্ব সম্পন্ন ও প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

উপর্যপুরি, অন্যান্য কয়েকটি অনুচ্ছেদে নির্বাহী কর্তৃত্বের ক্ষমতা সম্পর্কিত বিবৃতি এবং চতুর্থভাগে নির্বাহী বিভাগ এর পদ পদবীর যেভাবে বাংগানুবাদ করা হয়েছে তাতে- প্রাচীনকালের ধ্যান-ধারণা ও কৃসংস্কার বা বোধমতে- গরু,নারী ও ভূমি, দখল-বেদলের সম্পত্তি বলে গরু, নারী ও রাজ্য, গোত্র-গোষ্ঠী, পুরুষ ও রাজার- ব্যবহার,ভোগ ও সম্ভোগের মালিকানাধীন সম্পত্তি বিধায় গরু, নারী ও ভূমি রূপ সম্পত্তির স্বত্বের মালিক বা মালিকানায় স্বত্ববান কর্তৃত্ব বুঝাতে বিভিন্ন মাইথলজিতে গোরক্ষক, স্ত্রী রক্ষক ও রাজ্য রক্ষক হিসাবে 'স্বামী' শব্দের উদ্ভব ও ব্যবহার হেতু রাজ্যের স্বামী বা ওনারশীপের প্রতিক অর্থাৎ মোহর-ছাফ, পাঞ্জা বা পতাকা দ্বারা যেমন রাজ্যের আইডেন্টিটি নিশ্চিত করা হয় তেমন শাখা-সিঁদুর বা সাদা থান সহ বিশেষ বিশেষ অলংকার, চিহ্ন-পদবী ইত্যাদি দ্বারা নারীর মান,কুল ও স্থিতি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত হয়।

বাঁচার প্রয়োজনে অসহায়-অবলা নারীর যেমন থাকতে হয় পুরুষ-স্বামী তেমন রাজ্যের সীমা অটুট রাখতে প্রয়োজন- রাজা, বৈদিক যুগের এরূপ দাসোচিত মানসিকতায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে 'স্ত্রী'বাচক গণ্যে এবং রাষ্ট্রের প্রথম নির্বাহী ব্যক্তিকে রাজা তুল্যে বা রাজ্যেশ্বর গণ্যে তাঁকে রাষ্ট্রের, পতি/স্বামী সাব্যস্তকরণের বর্বর সামন্ততান্ত্রিক মেইল

জেন্ডারাধিক্যের ধারণা প্রকটভাবে পোষণ করা হয়েছে বলেই "প্রেসিডেন্ট" দুর্বোধ্য শব্দ না হওয়াসত্ত্বেও বংগানুবাদে "রাষ্ট্রপতি" করা হয়েছে । আবার রাজাকে রাজকীয় কার্যে পরামর্শ বা মন্ত্রণাদানে রাজা কর্তৃক নিযুক্ত – মন্ত্রী আর প্রজাদের ভোটাধিকারে নিযুক্ত আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাহ বিভাগের প্রধান ব্যক্তি যেমন একই ধরণের ক্ষমতা–এখতিয়ার বা সমক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃত্ব নয়,তেমন পরামর্শ বা "মন্ত্রণা " এবং "নির্বাহ" পরস্পর সমার্থক শব্দ না হলেও ব্রিটিশ রাজানুগামীতায় বা হীনমন্যতায় বা রাজন্য সাজার লালসায় নির্বাহী বিভাগের প্রধান ব্যক্তিকে "প্রধানমন্ত্রী" ও অন্যান্যদেরকে "মন্ত্রী" হিসাবে অত্র সংবিধানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অনুরূপ সামন্তবাদী মূর্খামির কারণেই অনুচ্ছেদ–৫১(২) দ্বারা রাজ্যেশ্বর রাষ্ট্রপতিকে কার্যভারকালে ফৌজদারী আদালতের এখতিয়ার হতে মুক্ত রাখা হয়েছে বিধায় দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতি তদীয় স্বামী/ স্ত্রী–কন্যা–পুত্র বা পারিবারিক বা সম্পত্তিগত বিরোধের কারণে কারো প্রতি কোন প্রকার গর্হিত কর্ম বা ব্যক্তিগত লোভ–স্বার্থ চরিতার্থ করার মতো অপরাধমূলক কার্য না করবার মতো দেবতাতূল্য অতি ভালো বা কেবলই ভালো মানুষ বলে গণ্য হয়েছেন, যেমনটা গণ্য হতেন বটে ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথ বলেই রাজতান্ত্রিক তত্ত্বে " রানী কোন অন্যায় করতে পারেন না। সুতরাং, তিনি যদি ইডেনবার্গের ডিউককে হত্যা করেন, তবু আইনত ক্রিমিনাল মামলা হবে না" । অনুরূপ , সম্পত্তি সংক্রান্ত বা সিভিল রাইট ভুক্ত স্ত্রী–স্বামী বা ভ্রাতা–ভগ্নী ইত্যকার ব্যক্তিবর্গ সহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত অপরাধমূলক কর্মের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কেউ ফৌজদারী আদালতের দারস্থ হতে পারবেন না হেতু বাংলাদেশের সকলে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী এবং কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ ও আইন অনুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হতে বঞ্চিত না হওয়ার অধিকারী মর্মে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদগুচ্ছ –২৭ ,৩১ ও ৩২ কার্যত গুরুত্বহীন ও অকার্যকর করা হয়েছে।

যদিচ, ধনতান্ত্রিক আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা–ঘুষ বা গুরুতর অপরাধমূলক কর্মের জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ–২ এর সেকসন–৪ দ্বারা কেবলমাত্র ইম্পিচমেন্ট নয়, কনভিকশানও দেওয়া যায়।বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের–প্রেসিডেন্ট আইন প্রণয়নে ক্ষমতাবান নয় ।

অথচ, "প্রজাতন্ত্র" এর প্রজাগণকে শাসন করা ও কর বিষয়ক প্রয়োজনে "সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতা সম্পন্ন " আইন তথা "অধ্যাদেশ" প্রণয়নে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কর্তৃত্ববান অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ–৯৩ বলেই অনুরূপ প্রেরোগেটিভ ক্ষমতাহীন জাপানের সম্রাট বা ব্রিটেনের রানীর অধিক ক্ষমতাবান রাজ্যেশ্বর বটে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের 'পতি' বা রাষ্ট্রপতি।

ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজা জীবন নিতে পারেন এবং দিতে পারেন বলেই তিনি বন্দিকে মুক্তি বা মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন বা প্রাচীনকালে ক্রিমিনাল ট্রায়ালে দোষী সাব্যস্ত কৃত ব্যক্তির দন্ড, জজ নয় দিতেন বটে রাজা স্বয়ং বর্ণিত আছে নানান প্রাচীন কল্পকাহিনী

ও ধর্মশাস্ত্রে বলে অনুরূপ প্রাচীন রাজকীয় নিদান- বিধানের প্রতি অটুট বিশ্বাস বা অসীম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় বিগলিতবোধে বিভোর ও নিমগ্ন হয়ে - যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি অন্যায় করে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আইনানুগ ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন এবং অস্বীকার ও অকার্যকর করে আদালতের প্রদত্ত যেকোন দন্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করার ক্ষমতা,অনুচ্ছেদ-৪৯ দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করার মাধ্যমে কার্যত বস্তুতান্ত্রিক জগত বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শন ভিত্তিক "সমাজতান্ত্রিক" সমাজ বা ব্যবস্থা নয় , নিদেনপক্ষে একটি আধুনিক-ইহজাগতিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রয়াশ বিস্মিল্লায় বিনাশ করা হয়েছে বা অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৮ হতে ২৫ পর্যন্ত বর্ণিত রাষ্ট্রিক মূলনীতি বা নীতিমালাসমূহ অস্বীকৃত ও অকার্যকর হয়েছে এবং " রাষ্ট্রপতি" প্রাচীনকালের রাজার মতোই দন্ড বিধান বা মার্জনাকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বিধায বৈদিক আমলের মতো বিচার বিভাগ রাজ দরবারের অংগ ও অংশ হিসাবে গণ্য হয়েছে হেতু নির্বাহী বিভাগের নিরুংকুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্থিরকৃত হয়েছে বলে অনুচ্ছেদ-২২ এর নির্দেশিকা মতো "বিচারবিভাগ পৃথকীকরণ" নয়, বরং আদালতের রায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অকার্যকরণের প্রেক্ষিতে খোদ আদালতের কার্যকারতা নসাৎ হয়েছে ।

এবং নাগরিকগণের আইনানুগ ব্যবহার পাওয়ার মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ-২৭, ৩১ ও ৩২ অস্বীকৃতকরণের মাধ্যমে অনুরূপ রাজকীয় ক্ষমতাহীন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হতে অধিকতর ক্ষমতাধর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কার্যতই প্রাচীন ভারতের রাজার মতো রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী গণ্য হয়েছেন হেতু কতিপয় পরজীবি ব্যক্তি ও গোষ্ঠিবিশেষ কর্তৃক শ্রমজীবী গণমানুষের জীবনদায়ী সংগ্রাম ও "মুক্তিযুদ্ধের" ফসল আত্মসাৎকরণে "সমাজতন্ত্র"এবং " গণতন্ত্রের" নামাবলীর আড়ালে রাজতান্ত্রিক ধারণার আধিক্যে ও কুপমন্ডকতায় উদ্ভট বারোয়ারি রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বিশেষ পত্তন করা হয়েছে বলেই সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদিকে সাধারণতান্ত্রিক ধারণায় ডিক্লারেশন বা ঘোষণা না বলে আবারো রাজানুগত্যে অনুচ্ছেদ-১৫১ ও প্রথম তফসিলে "রাষ্ট্রপতির আদেশ" বলা হয়েছে।

ছ) -" মাতৃ-অধিকার উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হলো পদানত, শৃংখলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্রমাত্র । " রূপ মত উল্লেখ পূর্বক পরিবারের ইতিহাস রচনায় বাখোফেনের ধারস্ত হয়ে এস্কাইলাস্ রচিত " আরস্টেইয়ার" মর্মার্থ গ্রহণ করেছিলেন ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস । ঐ পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে- প্রেমিকের জন্য স্বীয় স্বামীকে হত্যা করেছিলেন ক্লাইটেমনেস্ত্রা। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে আগামেমনেসের পুত্র অরেস্টস স্বীয় মাতাকে হত্যা করায় জুরিদের সমান সমান ভোটে **শাস্তি** ও **মুক্তি** নিশ্চিত না হওয়ায় বিচার সভার প্রেসিডেন্ট দেবী "এথেনা" অরেস্টেসের পক্ষে ভোট দিয়ে তাকে মুক্ত করেছিলেন এবং মাতৃহত্যা সর্বাধিক অপরাধ রূপ বিধান বাতিল করে পিতার পক্ষে যারে সে করেছে হত্যা তার সাথে ছিল নাক রক্তের সম্পর্ক" রূপ ফতোয়ায় পিতৃতন্ত্রের নব বিধান প্রণয়ন ও তদাধীনে নতুন পদ গ্রহণ করেছিলেন হেতু ঐ সময় হতে পিতৃ অধিকারের সুচনা হয়।

কিন্তু, দেবতা নয় বলেই মানুষের প্রতি দেবত্বারোপের গ্রীক ম্যাইথলজি বা ইন্ডিয়ান ম্যাইথলজির চক্রবর্তীকুলের বা পুরোহিততন্ত্রের অনুরূপ পৌরহিত্যের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র । সেমর্মে বিহীতাদি সম্পাদনে সুইজারল্যান্ডের ২৯ মে, ১৮৭৪ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৯৮(১) ও (২) অনুসারে ফেডারেল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, যিনি কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট তিনি মাত্র ১ বছরের জন্য এবং কেবল মাত্র ১ বারের জন্য নির্বাচিত হন এবং অনু: ৭৮(১), (২) ও (৩) এ সুস্পষ্টভাবে বলা আছে যে, জাতীয় পর্ষদ নিজেদের মধ্য হতে প্রত্যেক অধিবেশনে একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবেন। জাতীয় পর্ষদের ভোটাভোটিতে - প্রেসিডেন্ট কাষ্টিং ভোট প্রদান করতে পারেন। তবে তিনি অন্যান্যদের মতো এক ভোটের অধিকারী এবং যিনি একবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ঐ পদে পরবর্তীকালে অযোগ্য।

ইউ.এস.এস.আরের ১৯১৮ সালের সংবিধানে সোভিয়েট কংগ্রেস অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট বা স্পীকার সম্পর্কে কোন বক্তব্য রহস্যজনক কারণে নয় বরং বোধগম্য কারণে অর্থাৎ মহামতি লেনিনের মহাআধিক্যের হেতুবাদে নাই । পদ -পদবীসহ রাষ্ট্রিক ব্যক্তির বুর্জোয়া কর্তৃত্ব দুরীভূত-তিরোহিত করাই বস্তুতান্ত্রিকতার দর্শনে চালিত বা লোকতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌল লক্ষ্য বলেই রাষ্ট্রিক ও সরকারী স্থরে অধিষ্ঠিত ব্যাক্তিবিশেষকে দেবত্বারোপ করা সমাজতন্ত্রকে অস্বীকার করার নামান্তর হলেও বাংলাদেশের "মহান সংসদের মাননীয় স্পীকার", রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ পত্র গ্রহণ ও অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সহ পরবর্তী সংসদের স্পীকার নির্বাচিত হওয়াতক দীর্ঘমেয়াদে স্বপদে অবস্থানকারী এক মহাক্ষমতাধর কর্তৃত্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনুচ্ছেদ-৭৪দ্বারা ।

রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের মতে- আমেরিকার ইরকোয়ারদের মতোই প্রচীনকালে জার্মানীর সকল ক্ষমতার মালিক " জনসভা"য় সভাপতিত্ব করতেন রাজা বা উপজাতি প্রধান এবং জনসভায় " জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত: গুঞ্জন দিয়ে ব্যক্ত করা হত 'না' এবং উচ্চ ধ্বনি ও অস্ত্রের ঝঙ্কার ব্যক্ত করত ' হ্যাঁ' " বলে, কিন্তু সভাপতির ছিল না বিশেষ কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব । তবে, অনুরূপ 'না' এবং 'হ্যাঁ' এর ফলাফল ঘোষণাকারী বাংলাদেশের স্পীকার কতটা ক্ষমতাধর তা প্রত্যক্ষ করছে- শৃংখলা বিধান নয়, ঢাকার ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি কারী 'লাল-সবুজ' বাতির আদলে সংসদে লাল-সবুজ বাতির তেলছমতি সৃষ্টিকারীর লাল-সবুজের হেতুবাদে সংসদ জ্যাম সৃষ্টি জনিত কারণে অহরহ রাজনৈতিক হরতাল-অবরোধে ভুক্তভোগি ও তিক্ত-বিরক্ত নাগরিক।

অনুরূপভাবে,ব্রাহ্মণই জ্ঞানী,শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত এবং বিশেষ প্রাধিকারভোগী রূপ ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুসরণে সংসদ সহ সংসদ সদস্যদের " বিশেষ অধিকার নির্ধারণ" করার অনুচ্ছেদ ৭৮(৫) দ্বারা খোদ সংসদ ও সংসদ সদস্যগণ, নিজেদেরকে বিশেষ অধিকারভুক্ত গণ্যে যখন যেরূপ বিশেষ সুবিধা ভোগ করার প্রয়োজন মনে করবেন সেরূপ সুযোগ-সুবিধাদি গ্রহণে প্রয়োজনীয় আইন করতে পারবেন বিধায় গণঅভিপ্রায় নয় স্বীয় অভিপ্রায় পরিপূরণে নিয়োজিত হতে উৎসাহিত হয়ে ব্যক্তিগত লোভ- লালসা হাসিলে দলপতি-

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান নির্বাহী কর্তৃত্বের আজ্ঞাবাহী দাসানুদাস বা হিংস্র ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী হতে প্রলুব্ধ হতে বাঁধা না থাকায় তদানুরূপ করবেন।

তবে,ইতোমধ্যে স্বীয় ক্ষমতা অবসানে বলা চলে স্বয়ং "সংসদ" আত্মহত্যা করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির সরকার প্রতিষ্ঠা তথা ৪র্থ সংশোধনীটি মাত্র কয়েক মিনিটে পাশ করেছে বা দ্বিতীয় সংশোধনী দ্বারা রাষ্ট্র নিজেই কতিপয় মৌলিক অধিকার বিরোধী আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা গ্রহণ করার মাধ্যমে জনগণকে যেমন,কেবল করদাতা "প্রজা" নয়, বরং সংগঠন ও সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান দন্ডযোগ্য অপরাধ গণ্যে "স্বাধীন" বাক-বুদ্ধি ও বিবেক বর্জিত জন্তুতূল্য দাসে পরিণত করেছে, তেমন নির্বাহী বিভাগের প্রধান ব্যক্তি খোদ রাষ্ট্রকে নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিগণিত করেছে।

অথবা,সংসদ ছিল না, তবু যেমন "সংসদে প্রণীত হয়েছে" রূপ শব্দরাজির অপব্যবহার ও সংযুক্তির ব্যঞ্জণায় সেনাশাসকের জারীকৃত সামরিক আইন-অধ্যাদেশ, হত্যা,খুন-জখমের আদেশ, অনুরূপ হত্যাকে দায়মুক্তি প্রদান, বিচার-আইন ও নির্বাহী বিভাগের একক ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব গ্রহণ ও অনুরূপ কর্তৃত্ব ব্যবহার করা সম্পর্কিত আদেশ, হুকুম-নির্দেশ ইত্যাদি সকল কিছু সংবিধানভুক্তকরণের ৫ম বা ৭ম সংশোধনী সমুহ সংসদ সদস্য নামীয় অনুরূপ দাসনুদাসদের সমর্থণে সংসদেই গৃহীত হয়েছে।

তদপুরি, সংসদ ও সংসদ সদস্যগণ সাংবিধানিকভাবে অভিজাতশ্রেণীভুক্ত গণ্য হওয়ায় প্রজাতন্ত্রের অপরাপর 'প্রজাগণ' শূদ্র হিসাবে চিহ্নিত ও গণ্য হয়েছে। অনুরূপ 'ব্রাহ্মণ-শূদ্র' সম্পর্ক, এমনকি লোকতান্ত্রিকতারও যেমন বিরোধী তেমন অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৭, এর পরিপন্থী।সংসদের দাফতরিক ক্রিয়াদি প্রজাতন্ত্রের কর্ম হওয়া হওয়া সত্ত্বেও অুনচ্ছেদ-৭৯ দ্বারা আলাদাভাবে "সংসদ সচিবালয়" সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ, উক্ত দপ্তরের পরিবর্তে জাতীয় সংসদের দাপ্তরিক কার্যাদি সরকারী "কর্ম বিভাগ" সম্পাদন করলে রাষ্ট্রিক ব্যয় সাশ্রয় হওয়া এবং স্থায়ী স্পীকারের মতো কেবলমাত্র এক বা একাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিজ্ঞতা-যোগ্যতা বৃদ্ধি ও কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার মাধ্যমে কার্যত অপরাপর সদস্যগণের সহিত স্পীকারের সৃষ্ট বৈরীতা ও বৈষম্য অবসান এবং প্রত্যেক সদস্যকে দায়িত্ব পালন ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সুযোগদানের মাধ্যমে প্রত্যেককে আনুপাতিকহারে অভিজ্ঞ ও দক্ষ হিসাবে গড়ে উঠার সুযোগ নিশ্চিত করা যেত। ব্রিটেন ও ভারতের অনুগামিতায় সৃষ্ট স্পীকার কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং সম্মিলিত সম্মতিতে সদস্যগণের কার্যক্রম সমন্বয় সাধনে কেবলমাত্র অধিবশেনকালীন তবে পরবর্তী অধিবেশনে অযোগ্য- এক বা একাধিক ভাইস সহ একজন সমন্বয়কারীর পদ সৃষ্টি করা ঘোষিত রাষ্ট্রিক নীতিমালার না হোক অন্তত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সহিত সাযুজ্য বিধানে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিসংগত ছিল।

জ) আইন প্রণয়ন এবং আইনানুযায়ী রাষ্ট্রিক কর্ম সম্পাদন ও আইনানুগ তূলনা বা তূল্যকরণ তথা বিচার কার্য সম্পন্নকরণ সমার্থক নয় বা ল' মেকিং এবং ল'এক্সিকিউশন ও ল' জাষ্টিফিকেশনও সমরূপ কার্য নয়, যেমন নয় পাঠ্যক্রম প্রণেতা এবং পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষকের কর্ম বলেই সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা আইনানুগ কর্ম আইনানুগভাবে

রাষ্ট্রের যে বিভাগ সম্পদন করে থাকেন সে বিভাগ হচ্ছে " নির্বাহী বিভাগ", এবং যে বিভাগ স্বীয় বিভাগ সহ নির্বাহী বিভাগ এবং সংসদ ও অপরাপর প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ আইনানুগভাবে আইনানুগ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পদন ও পালন করছে কি না তা নির্ণয় ও নির্ধারণ করে থাকেন সে বিভাগই "বিচার বিভাগ" এবং আইন প্রণেতা বটে সংসদ । আইন প্রণয়ন বিষয়ে অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৬৫ দ্বারা সেরূপ নির্দিষ্ট করা হলেও অনুচ্ছেদ-৯৩ দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে "অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা" প্রদান এবং অনুচ্ছেদ-১১১ দ্বারা সুপ্রিমকোর্টের রায়কে " ঘোষিত আইন" বলে বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় নির্বাহী কর্তৃত্ব ও আইন তুল্যকরণ কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়নকারী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের কারণে নিছক ব্যক্তিগত , গোষ্ঠীগত ও সংকীর্ণ বা ক্ষুদ্র স্বার্থে ঐ প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ স্বীয় নামকরণের সহিত সামঞ্জস্যহীন কর্ম সম্পাদন ও সম্পন্নকরণে ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও অনুচ্ছেদ-৭ মূলে -"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক", এবং "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি"-র প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন যে সংবিধান, সেই সংবিধান জনগণকে কেবমলমাত্র সংসদ সদস্য নির্বাচনে ভোট দান ব্যতীত আর কোনভাবেই আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়নি অথবা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী আইন প্রণীত হলে , এবং ইত:মধ্যে সেরূপ "আইন" নামক বহু গণবিরোধী বিধি-বিধান জারী হয়েছে, তা বাতিল বা রদ-রহিতকরণে বা বিদ্যমান আইন যা জনস্বার্থের পরিপন্থী বা সাংবিধানিক হেতুবাদে অচল ও বাতিলযোগ্য তা বাতিল করার ক্ষমতা "প্রজাতন্ত্রের" মালিক জনগণের নাই বলেই কার্যতই এবং সত্যি সত্যি জনগণ করদাতা প্রজা বটে ক্ষমতাসীন কর্তৃত্বের বলেই কার্যত জনগণ নয়, বাংলাদেশের মালিক বটে জনকরের সুবিধাভোগী প্রকৃতার্থে শ্রমজীবী মানুষের শ্রম বা শ্রম দ্বারা সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা সমেত অর্থ বা বেতন-ভাতা ও সন্মানী ভোগী সাংবিধানিক বা অসাংবিধানিক পদাধিকারী তথাকথিত "গণসেবক"।

অথচ, মর্গান " প্রাচীন সমাজ"-এ আবিস্কার করেছেন- আমেরিকার "ইরকোয়াস" গোত্রের সমস্ত পূর্ণবয়স্ক নারী-পুরুষদের নিয়ে সমান অধিকারের ভিত্তিতে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সভা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতো তাদের "এগোরা" বা "জনসভা"। অনুরূপ জার্মানদের "মার্ক"। "গ্রীসের প্রাচীন কথায়" শ্যেমান জানিয়েছেন- জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জনগণকে জোর করা হত না এবং জনগণকে নিয়ে যে কাজ করতে হত সেকাজের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত জনগণকে না জানিয়ে গ্রহণ করা হত না। " পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" গ্রন্থে ফে. এ্যাংগেলস জানিয়েছেন-এথেন্সের সমৃদ্ধিকালে প্রত্যেকে গড়ে প্রতি ১৮ জন দাসের মালিক হিসাবে মোট ৯০ হাজার স্বাধীন নাগরিক তাদের " জনসভায়" বক্তব্য -ভোট দিত। এথেন্সের পদাধিকারীগণ নিজেদের কাজের জবাবদিহী করতো ও নির্বাচিত হত জনসভায়। জনসভায় সকল আইন তৈরী হত এবং জনগণ ছিল প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। অনুরূপ,জনগণ চাইলে আংশিক বা সম্পূর্ণ সংবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করার বিধান ও বিহীতাদি, অনুচ্ছেদ-১১৮ দ্বারা নিশ্চিত করেছিল সুইটজারল্যান্ডের ১৮৭৪ সালের সংবিধান এবং উক্ত অনুচ্ছেদ মূলে ১৯৯৮ সালে পরিগৃহীত এবং ২০০০ সাল হতে কার্যকর সুইজারল্যান্ডের সংবিধানেও অনুরূপ গণক্ষমতার অনুচ্ছেদ বহাল আছে। অত:পর, অত্র সংবিধান নিদেনপক্ষে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সুইটজারল্যান্ডের সংবিধানের নিকটবর্তীও নয় বলেই "গণতান্ত্রিক " হওয়ার প্রশ্ন নিতান্ত:তই অবান্তর।

ঝ) স্বীয় রাজ্য রক্ষা বা বিস্তারে বর্হি আক্রমন পরিচালনা ও শত্রু মোকাবেলায় প্রতিরক্ষা ব্যয়, রাজা ও রাজন্যের রাজসিক জীবন ধারার অপচয়মূলক ব্যয় বা রাজাজ্ঞা পালনে বাধ্যকরণে অর্থাৎ প্রজা শাসনের নিমিত্তে কোতোয়াল-লাঠিয়াল ও কোচওয়ান-দেওয়ান বা কাজী - ব্রাহ্মণ ইত্যাকার পরজীবীগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা বা বেতন-ভাতা তথা রাজকার্যের খরচ, আদায় করা হত প্রজা তথা ভূমি ব্যবহারকারী ও ভূমিদাস-জলদাস হতে বলেই সম্ভবত "কর" ইত্যাদিকে রাজার আয় বা "রাজস্ব" বলা হয়ে থাকে। বক্সার যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সুবে বাংলায় সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ১৭৬৪ সালে দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সহিত চুক্তি মুলে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার "দেওয়ানি" তথা খাজনা-কর বা "রাজস্ব"আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করেই ভূমিকর ৫ গুণ বৃদ্ধি করেছিল। ফলে,প্রথম বছরেই কোম্পানির ভুমি রাজস্ব আয় দ্বিগুণ হয়েছিল। অনুরূপ কর বৃদ্ধি ও খরার কারণে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ বাংলা সাল ১১৭৬ এর মন্বন্তরে বাংলার মোট ৩ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১ কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। অথচ, ঐ দুর্ভিক্ষের বছরেও কোম্পানি ভূমিকর ১০% বৃদ্ধি করেছিল। শাসক-শাসিতের এমনটাই সম্পর্ক। কিন্ত সমাজতান্ত্রিক নয় গণতান্ত্রিক বোধেও কেউ রাজার মতো শাসক আর কেউ ভূমিদাসের মতো শাসিত হওয়ার যোগ্য হতে পারে না হেতু রাজকীয় বোধের রাজস্ব বা প্রজার নিকট হতে কর আদায় করার অবকাশ নাই।

তাছাড়া- রাষ্ট্রিক ও রাষ্ট্রকেন্দ্রীক পেশা বিলুপ্ত করাই সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রারম্ভিক ও প্রধানতম কর্ম বলে অনুরূপ কর্ম সম্পাদনে রাষ্ট্র নয় বরং সমাজের সাংগঠনিক ব্যয় ইত্যাদি ক্রমেই নিম্নগামি হতে হতে শূন্য পর্যায়ে উপনীত হবে।

অত:পর, লেনিনীয় রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র মতো রাষ্ট্রে হয়তো রাষ্ট্রিক কর্তৃত্ব বিশেষ যখন যেমন খুশি কর ইতাদি আদায়-উসূল করতে পারেন। কিন্তু সমাজতন্ত্রে -শিশুর ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাকার সামাজিক খাতের ব্যয় নির্বাহে প্রত্যেকে রাজস্ব নয়, বরং অংশ হারে খরচ প্রদান করবেন মাত্র । আবার, বুর্জোয়াদের গণতন্ত্রেও ভড়ং করে ক্রম বর্ধিতহারের করকাঠামোকে প্রগতিশীল করব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। কাজেই, বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রিক নীতি যেমন, নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দুর করা, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা, জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হতে মুক্তি দানের মতো যে সকল মনভোলানো-চমৎকার শব্দরাজি তা সামান্যতমভাবেও যদি কার্যকরী করতে হয় তবে - ইত:পূর্বেকার আইন-বিধি বিশেষত, দেশী-বিদেশী রাজা-বাদশা ও সম্রাট এবং ভারত দখলদার " দি গ্রেট আলেকজান্ডার" ও জোর-জবরদস্থিতে নীল চাষ ও আফিম চোরাকারবারী ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বা দুর্বৃত্ত ব্রিটিশ রাজ ও পাকিস্তানী বর্বর-সেনা শাসক কর্তৃক প্রণীত আইন-বিধি সমেত ও তদমুলে শোষণমূলক দৃষ্টিভংগি প্রসূত তৈরীকৃত গতানুগতিক "বাজেট" নয়,বিপরীতে বৈরীতা-বৈষম্যের নিমিত্তে সৃষ্ট জোর-জবরদস্তির রাষ্ট্রিক উপাদান পুলিশ-সেনাবাহিনী সহ অনরূপ সকল সংস্থা-বিভাগ দ্রুত বিলীন ও বিলুপ্তকরণে তদসংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রায় শূন্য সীমায় ব্যয় বরাদ্ধ নির্ধারণের লক্ষ্যমাত্রা সহ গণউন্নয়ণে-জ্ঞান,বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির একাধিপত্য, উৎপাদনী ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তি নির্ভরতা কমানো ও পেশাগত ঝুঁকি হ্রাসকরণ সহ শ্রমসাশ্রয়ী ও আধুনিক উৎপাদন

উপকরণ-শক্তির বিকাশ- উন্নয়ণ ও প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তদনিমিত্তে শিক্ষা-গবেষণা কাযক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান ও উক্তখাত সমুহের ব্যয় এবং উক্তরূপ গণকার্যক্রম সমন্বয় সাধনে কর্মকর্তার ভারাধিক্যমুক্ত রাষ্ট্রীক কার্যক্রম পরিচালন ব্যয় নির্বাহার্থে-রাষ্ট্রায়াত্তখাতের আয়, উদ্বৃত্ত সামাজিক মূল্য সহ প্রত্যেকের নিজস্ব আয় হতে প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত 'রাষ্ট্রিক ব্যয় খাতে'র আয় ও অপরাপর খাত হতে প্রাপ্ত আয়ের সমন্বয়ে সরকারের আয় ও ব্যয় বিষয়ক তহবিল গঠন এবং সে সম্পর্কিত বিধি বিধান সংবিধানে বিবৃত হওয়াই ছিল যৌক্তিক।

কিন্তু, গোলামী আমলের ধ্যান-ধারণা প্রসূত সাবেকী আমলের মতোই অনুচ্ছেদ-৮৪ ও ৮১, তে যথাক্রমে " রাজস্ব", "কর" ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে এবং " জরিমানা" , "অর্থদন্ড" ইত্যাদিকে আয়ের খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হলেও রাষ্ট্রায়ত্তখাতের আয়কে "আয়" হিসাবে গণ্য করা হয়নি। অনুরূপ দৃষ্টিভংগিজনিত কারণেই রাষ্ট্রায়ত্তখাতকে সংবিধানের প্রথম তফসিল ভুক্ত পি.ও.২৭-১৯৭২ সহ বিভিন্ন আইন দ্বারা "ব্যবসা" হিসাবে গণ্য করে "প্রফিট-লস" এর ব্যালান্সশীট সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ১৯৬১ সালের চার্টার্ড একাউন্টস আইনের মর্ম মতে একাউন্টেন্সি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করার বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে।

অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৮ হতে ২৫ পর্যন্ত বর্ণিত নীতিমালা বাস্তবায়ন ও রূপায়নে ব্যয় বরাদ্ধ বর্ণিত না হলেও ব্যয়ের খাত বা "দায়"হিসাবে অনুচ্ছেদ-৮৮, দ্বারা সাংবিধানিক পদাধিকারী হিসাবে রাষ্ট্রপতি হতে প্রজাতন্ত্রের সেবক বলে গণ্য কার্যত বাংলাদেশের রাজা ও রাজ আমত্য সমেত বিচারপতি-হিসাব নিরীক্ষক, নির্বাচন কমিশনারগণ এবং সংসদ, সুপ্রিমকোর্ট সহ রাষ্ট্রিক যন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পারিশ্রমিক-বেতন/ভাতা এবং রাষ্ট্রের ঋণ-সুদ ও জরিমানা ইত্যাদি খাতের খরচ চিহ্নিত ও নির্ণিত হয়েছে। এথেন্সের থিসিউসের সংবিধানে যেমন "ইউপেট্রাইডিস বা অভিজাত" বর্গকেই সরকারী পদাধিকারী তথা শাসক,নগরপাল ও বিচারক গণ্য করা হয়েছে তেমন বাংলাদেশের সাংবিধানিক পদাধিকারীগণকে রাষ্ট্রিক অভিজাতরূপ গণ্যে প্রজাতন্ত্রের ব্যয়খাতের প্রধানতম সুবিধাভোগি গণ্য করার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী বা উৎপাদনের সহিত যুক্ত-জড়িত কৃষক সহ অপরাপর শ্রমজীবী মানুষের আয়-ব্যয়ের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণে রাষ্ট্রকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি ।

ঞ) জোর যার মুল্লুক তার, নীতিতে প্রতিষ্ঠিত সামন্ততন্ত্রে রাজদ্রোহীতা বা রাজাজ্ঞা অমান্যে-ভংগে বা দস্যুতা-লুণ্ঠন, অপহরণ-খুন, গুম-আটক ও আঘাত প্রদানের মতো বিষয়াদিকে অরপাধ গণ্যে সম পরিমান প্রত্যাঘাত বা কষ্ট-যন্ত্রণা প্রদানে মৃত্যদন্ড সহ নানান দন্ড দিতেন রাজা স্বয়ং বলেই "কোর্ট" শব্দের বংগানুবাদ-রাজ দরবার । দন্ড-মুন্ডের কর্তা বলেই বিচারার্থীর মতোই বিচারধীন ব্যক্তিও রাজার নিকট আবেদন-নিবেদন, দয়া-করুণা প্রার্থনা করতো।মোগল সম্রাট আকবর প্রতি বুধবারে বিচার কার্য করতেন। রাজ্যের বিস্তার বা প্রসার বা অন্যান্য কর্মে ব্যস্থতার কারণে স্বীয় কর্ম লাগবে কালে কালে রাজা-বাদশাগণ রাজকীয় কার্যের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন বিচার বিভাগ।বিচারপতিও রাজার রাজকীয় কার্যের অংশীদার বিধায় রাজকীয় বিশেষ পোষাকে আবৃত বিচারপতিগণকে লর্ড গণ্যে আচরণ করাই প্রথা ছিল ব্রিটিশ-ভারতসহ সামন্ততন্ত্রে।

অনুরূপ প্রথা সমেত প্রাচীন ভারতের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ঋগভেদ, মহাভারত, রামায়ন, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, নারদ নিদান, আইন-ই-আকবরী ইত্যাদিতে বিশদ বর্ণনা বিবৃত আছে। ইউরোপের রাজতন্ত্রও প্রায় অনুরূপ বিচারিক ব্যবস্থা বহাল করেছিল। জবরদস্তির সামন্ততন্ত্র উৎখাত করে আইনী আবরণে কেতা-দুরস্ত কায়দায় বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনে, শ্রম শোষণকে পুঁজিবাদ- আইন সংগত গণ্যে সাংবিধানিক দলিলমূলে নাগরিকগণের মূলত পুঁজিওয়ালাদের মালিকানাধীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তবু, পুঁজিবাদ তথা মধ্যস্বত্ব ও মুনাফার বাইপ্রোডাক্ট - ব্যক্তিবিশেষের ভান,ভনিতা, প্রতারণা,জালিয়াতি,নকল,ভেজাল ও মিথ্যাচার ইত্যাদি সহ পুঁজি গঠন ও বিকাশের স্বাভাবিক অনিবার্যতায় সৃষ্ট শ্রেণী বিরোধ-বৈষম্য ও বৈরীতাকে কৃত্রিমভাবে আড়াল করার জন্য "প্রত্যেকে আইনের দৃষ্টিতে সমান" মর্মে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় পরস্পরের থেপ্ট-ফ্রড-সিট, ইনজুরি ইত্যাদিকে অপরাধ গণ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেককে অবিশ্বাস করে বিধায় ব্যক্তিগত মালিকানা তথা সম্পত্তি রক্ষায় প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিষ্টার সহ প্রত্যেকের নিরাপত্তার নামে পুলিশী ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা-মেটাল ডিটেক্টরের বেষ্টনী মুক্ত নয় কেউ এবং রাস্তা-ঘাটে যখন-তখন মাথার উপর হাত উঠিয়ে পুলিশী তল্লাশী করার মাধ্যমে সন্দেহমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেককে সন্দেহভাজন অপরাধী গণ্য করার প্রক্রিয়ায় কার্যত মানুষকে অমর্যাদা করার পুঁজিবাদী আইনী ব্যবস্থা সমেত বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের নামে গ্রীক জুরিষ্ট এ্যারিষ্ট্যাটলের মতের প্রতিধ্বনিতে- ব্যক্তির নয়, আইনের শাসনের কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণের মানদন্ডে দেশ বিশেষের উন্নয়ন-উন্নতি সমেত সভ্যতার স্মারক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

অথচ, অনুরূপ মতামত দ্বারা ভবিষ্যতে আইনের অপ্রয়োজনীয়তাকে অর্থাৎ অধীনতাহীন,শাসনহীন এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বমুক্ত সাম্যবাদী সমাজের অনিবার্যতাকে যেমন অস্বীকার করা হয় তেমন মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট "আইন"কে মানুষ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিমান গণ্যে আইন বা ব্যক্তির শাসনের যোগ্য ব্যক্তি বিশেষ যে পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক মানুষ নয় বা শাসক ও শাসিত-এরা কেউ নয় স্বাধীন মানুষ , তাও উপলব্ধি-আন্দাজে অক্ষমতা হেতু কেবলমাত্র কতিপয় ব্যক্তির প্রণীত আইনের চিরকালীন অনুগামী মর্মে ভীরু-বোকাগণকে সিভিল বা 'ভদ্র' গণ্যে, কালিক প্রয়োজনে সামাজিক প্রগতি নিশ্চিতকরণে এবং শাসন শব্দকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিপতিত করার ব্রতে শাসনের জোয়াল মুক্ত স্বাধীন মানুষের সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণে প্রত্যয়ী সমাজ বিপ্লবীকে 'অ-ভদ্র'বা দুষ্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষ সামন্ততন্ত্র বা বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিনির্মাণে নিরত ব্যক্তিবিশেষকেও দুষ্ট বলা হয়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন নিশ্চিতকরণের নামে " চোখের বদলে চোখ" রূপ সাজা বিষয়ক দাসতান্ত্রিক- সামন্তবাদী নীতি-দৃষ্টিভংগি ও মূল্যবোধের মানবিক অমর্যাদার দন্ডনীতির সূত্রমতো জেল-জরিমানা সহ নানান রূপ দন্ডের কিঞ্চিত পরিবর্তনসহ অনুরূপ দন্ডাদির ব্যবহার ও বিহীতকারী পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সাম্প্রতিক কালে মানুষের অমূল্য জীবন সংরক্ষা অর্থাৎ বেঁচে থাকার অধিকার কবুল বা স্বীকার করে হিংস্র-জঘন্য ও বর্বর মৃত্যুদন্ডের বিধান রহিত করেছে।

উল্লেখ্য, খ্রীষ্টাব্দ -৭৪৭ হতে ৭৫৭ সালের মধ্যে চীনে সাময়িকভাবে মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধ হয়েছিল। থমাস মূর ১৫১৬ সালে "ইউটোপিয়া"য় এবং ১৭৬৪ সালে বেক্কারিয়া " অন ক্রাইমস এন্ড পানিশমেন্টস" গ্রন্থে মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। মন্টেস্কো, ভলতেঁয়ার প্রমুখ লেখালেখির মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড রহিতকরণের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৪৯ সালে রোমান রিপাবলিক, ১৮৬৩ সালে ভ্যানিজুয়েলা, ১৮৬৫ সালে সাম মারুনো মৃত্যুদন্ড রহিত করেছিল। সুইটজারল্যান্ডের ১৮৭৪ সালের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৬৫ দ্বারা রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুদন্ড রহিত করা হয়। সেপ্টেম্বর-২০০৭ সাল পর্যন্ত দুনিয়ার মোট ৯২ টি রাষ্ট্র মৃত্যুদন্ড রহিত করেছে। তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কতিপয় ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ডের বিধান চালু রেখেছে মাত্র ১০ টি রাষ্ট্র। বিধান থাকলেও বিগত ১০ বছর যাবত মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেনি ৩২ টি রাষ্ট্র।

তবু, চীন, সৌদি আরাবিয়া, ইরান, ইরাক ও বাংলাদেশ সহ অনেকগুলো দেশ মৃত্যুদন্ডের বিধান চালু রাখলেও জাতিসংঘ ১৯৭৭ সালে মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ এবং ২০০৭ সালে সাধারণ পরিষদের ৬২তম অধিবেশনে বিশ্বজনীনভাবে মৃত্যুদন্ড নিষিদ্ধকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

উৎপাদন উপকরণের মালিকানা ও উৎপন্ন বিষয়াদি বন্টন ব্যবস্থাকে বিবেচনায় না নিয়ে ক্রমবর্ধিত হারে উৎপাদন বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মাথাপ্রতি আয় বাড়াতে সক্ষম হলে এবং আইনানুগ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা হলে- দন্ডের কঠোরতার ভয়ে দরিদ্রজনগোষ্ঠীর অপরাধ প্রবনতা হ্রাস পাবে এবং দুর্নীতি ও অপরাধ মুক্ত সমাজ নিশ্চিত না হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকবে- অপরাধ; এমনটাই-পুঁজিবাদী জুরিস্প্রুডেন্স। ব্যক্তিমালিকানার সুবাদে শ্রম শোষণের মাধ্যমে পুঁজি অর্জন করাটাই যে সবচাইতে বড় অপরাধ বা ব্যক্তিমালিকানাই যে সকল দুস্কর্ম সমেত সকল অনিয়ম-দুর্নীতি ও অপরাধের মৌল কারণ তা আড়াল করতে সদা তৎপর পুঁজিবাদী আইন শাস্ত্র। যাদের শ্রম চুরি করে পুঁজিপতি-পরজীবী সকলেই বিত্তবান-ধনবান সেই শ্রমজীবী মানুষকে দুর্নীতি ও অপরাধের জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে দায়ী করাই স্বভাব বটে বজ্জাত-দুশ্চরিত্র বুর্জোয়া আইন বিশারদ সমেত ন্যায়নীতির চরম শত্রু ভন্ড নীতি শাস্ত্রবিদদের।

অথচ, ওয়ার্ল্ড ওয়াছের ব্রিয়েন হলওয়েলের গবেষণা মতে-২০০০ সালে জনপ্রতি খাদ্য শষ্য উৎপাদনের হার: আমেরিকা-১২৩০ কেজি , চীন-৩২৫ কেজি, জিম্বাবুয়ে-৯০ কেজি । ঐ রিপোর্টে নাম না থাকলেও খাদ্য উৎপাদনে চীনের সমান নয় বাংলাদেশ । কিন্তু, প্রাপ্ত তথ্যে অক্টোবর- ২০০৭ সালে আমেরিকায় প্রাপ্তবয়স্কদের ১% জন , তবে যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক সংখ্যক মানুষের বাংলাদেশে ঐ সময়ে .৬২% জন হারে মোট প্রিজনার ছিল মাত্র ৮৭,০০০ জন। অবশ্য, ২০০৮ সালে কয়েদী সংখ্যা ৭৫ লাখ ছাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে । অত:পর, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে অপরাধ সংঘটন ও অপরাধ প্রবণতায় উর্বর রাষ্ট্র কোনটি?

নিরাপদ জীবন নিশ্চিতকরণ ও উত্তরাধিকার সহ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধানে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রত্যেকের নির্ভরশীলতা হেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভে প্রতেকের

সহিত প্রত্যেকের প্রতিযোগিতায়, মুলত প্রত্যেককে, প্রত্যেকে ঠেকানো-ঠকানোর অসম প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকে বিরামহীনভাবে লিপ্ত থাকায় বিশেষত অধিকতর হারে শোষণের মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগণকে কেবলই দ্রারিদ্রতায় নিক্ষেপ ও অন্যান্যদেরকে সম্পত্তিহীন করার উদগ্র প্রতিযোগিতায় অতি উৎপাদন সংকটে পতিত হয়ে সংকটোত্তরণে সামগ্রীক অবস্থা বিবেচনায় অক্ষম জন্মান্ধ পুঁজিবাদী নীতিবোধে বা স্বার্থান্ধতায় অনুসৃত পন্থা ও কৃতকর্মে বা গৃহীত ব্যবস্থাবলীর হেতুবাদে আরো অধিকতর সংকটের গহবরে পুন: পুন পতন তথা মন্দা-শেয়ারবাজার ধস, মুদ্রাস্ফীতি, তারল্য সংকট, সুদের হার হ্রাস ,বিনিয়োগ হ্রাস, খেলাপি ঋণচক্রের আধিক্য, ব্যাপক ছাঁটাই-কর্মচ্যুতি, বেকারত্ব বৃদ্ধি, সামাজিক বিশৃংখলা-নৈরাজ্য প্রসার, ক্ষোভ-বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের বিকাশ, রাজনৈতিক সংকট এবং যুদ্ধ ও যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিস্থিতি বা যুদ্ধোন্মদনা ইত্যাদি অনিবার্যভাবে দেখা দেওয়ায় এবং তজ্জনিত কারণে পুন:পুন সংঘটিত অনুরূপ চেইন অব প্রোবলেমসের সুলিয়্যশনে অক্ষম পুঁজিবাদ চক্রাকারে অধিকতর সংকট ও সমস্যায় নিপতিত হয় বলে বিলিয়নিয়ার /মিলিয়নিয়ারও যখন-তখন দেউলিয়ায় পরিণত হয় বা নিখোঁজ-ফেরার ও দেশান্তরিত হয় বিধায় সম্পদের পাহাড়ের উপর অবস্থান করেও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা লাভে অক্ষম পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদী বা পুঁজিবাদীর সহযোগী লুম্পেন চক্র পুঁজিবাদের অংগ ও অনুসংগ হিসাবে অনিয়ম,ঘুষ-দুর্নীতি, প্রতারণা-জালিয়াতি, নকল-ভেজাল, হত্যা-খুন-গুম, আঘাত-অপহরণ-ছিনতাই-ডাকাতি-সন্ত্রাস, ভোট কারছুপি, দলবাজি-স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি কর্ম বা অপরাধ সংঘটন করার কারণেই ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বা সংগঠনের সহিত সংগঠনের বা সংগঠনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত অন্যান্য ব্যক্তির বা রাষ্ট্রিক বিভিন্ন শাখা-কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের সহিত অপরাপর বিভাগ ,কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষের বিরোধ- বৈরীতা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের আন্ত:মূলে উত্থিত আবিশ্যিক বৈশিষ্ট। অনুরূপ বিরোধ নিস্পত্তিকরণে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৩ দ্বারা বিচার বিভাগ গঠন এবং উক্ত অনুচ্ছেদের সেকসেন-২ এ আমেরিকার সংবিধান ও আইন অনুযায়ী আমেরিকার প্রত্যেক ব্যক্তি, আন্ত:রাষ্ট্র ও বর্হি:রাষ্ট্র এবং কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃত্বের সহিত যে কারো সৃষ্ট বিরোধ নিস্পতিকরণে আইনানুগ ক্ষমতা-এখতিয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কিন্তু , শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগ নাই বিধায় মজুরি শ্রমের সুযোগ নাই বা শ্রমশক্তি বিক্রেতা শ্রমিক যেমন নাই তেমন শ্রমশক্তি ক্রেতা পুঁজিপতিশ্রেণীও নাই হেতু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষ কর্তৃক উদ্বৃত্ত-মুল্য আত্মসাতের সুযোগ-অবকাশ নাই। অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা যেহেতু সামাজিক সেহেতু ব্যক্তিগত পর্যায়ে উৎপাদন উপকরণ ক্রয়-বিক্রয়েরও সুযোগ নাই বিধায় পণ্য-তা হোক শ্রম শক্তি বা উৎপন্ন বিনিময় জাত মুনাফা ও মধ্যস্বত্ব গ্রহণের সুযোগ- অবকাশ নাই। অত:পর, ব্যক্তিমালিকানাহীন অর্থাৎ উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত দখলদারিত্বের সুযোগহীন সমাজিক মালিকানাধীন ব্যবস্থায় মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের সুযোগ নাই বিধায় কেউ কাউকে শোষণ-লুন্ঠন বা ক্ষতিগ্রস্ত করার যেমন অবকাশ নাই তেমন আবশ্যকতাও নাই।

ফলে- ব্যক্তিমালিকানা জনিত কারণে সৃষ্ট বা ব্যক্তিমালিকানাধীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যে সকল অনিয়ম-দুর্নীতি সহ অপরাধ বা অপরাধমূলক কার্যক্রম সংঘটিত হয় বা বুর্জোয়া কর্তৃত্ব বোধে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে ধরণের রেষারেষি বা বিরোধ-বৈরীতা সৃষ্টি হয় সে ধরণের বিরোধী-বৈরীতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ-অবকাশ সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাধারণভাবে হওয়ারই সুযোগ নাই। আবার কর্মক্ষম সকলেই যেহেতু সামাজিক উৎপাদনী ব্যবস্থায় স্বক্রিয় অংশীদার এবং শিশু-বৃদ্ধ ও অসুস্থ-অক্ষমদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যয়ভার যেহেতু সমাজই বহন করবে সেহেতু আজীবন কারোই অনিশ্চয়তা-দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হওয়ারও সুযোগ নাই।

উপর্যপুরি, সকল মানুষই যেহেতু শিশুকালে সামাজিক ব্যয়ভারে ও বৈষম্যহীনভাবে শিক্ষা -দীক্ষার সুযোগ লাভ করবে সেহেতু প্রত্যেকেই সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায় নিজ নিজ গুণ-দক্ষতা সর্বাধিক ব্যবহার করে সমাজের সর্বাধিক মংগলে সর্বসময়ে স্বক্রিয় থাকবে । ফলে- সমগ্র সমাজের প্রয়োজনীয় সকল ভোগ্য-ব্যবহার্য সামগ্রী কেবল প্রচুরই নয়, বরং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সামাজিক পরিকল্পনামতো প্রাচুর্যের জীবন যাপনে সকল প্রকার সামগ্রী উৎপন্নকরণেও সমাজতন্ত্রের শুরুতেই দৈনিক ৮ ঘন্টা নয় বরং খুব সম্ভবত ২ ঘন্টাও শ্রম প্রয়োগ করতে হবে না।

অত:পর, কায়িক ও মানসিক শ্রমের সুসামঞ্জস্যকরণ এবং প্রত্যেকের ক্ষমতা-যোগ্যতার সর্বাধিক সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণের সম্মিলিত প্রয়াশে সংঘটিত পরিকল্পিত সামাজিক উৎপাদনের বৈশিষ্ট ও লক্ষ্য অনুযায়ী- তথাকথিত প্রতিযোগিতা বা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বৈরীতা-বিরোধীতা ও বৈষম্য শূন্য (০) মাত্রায় নিশ্চিতকরণে প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রায়োগিকভাবে সহযোগিতা করাই সমাজের সাধারণ রীতি-নীতি ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে অনুশীলিত হবে।

তাছাড়া- যেহেতু পুঁজি ও পণ্য উৎপাদনের বিপরীতে কেবলই সমাজের প্রয়োজনে সামাজিক চাহিদা মতো পরিকল্পিতভাবে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে সেহেতু পুঁজি-পণ্য পাহারার নিমিত্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সেনা-পুলিশ এক্কেবারেই অপ্রয়োজনীয় বলে সাধারণভাবে সকলে যুদ্ধ ও যুদ্ধভীতি মুক্ত বলে সকলেই ভয়-ভীতিমুক্ত বলেই শাশ্বত শান্তির সমাজই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ।

তবে, সূচনা পর্বে দুনিয়ার কোন কোন অঞ্চলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অবশিষ্ট থাকলেও স্থায়ী সেনা বাহিনী নয় বরং সমাজের সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বশস্ত্র জনগণই শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ করবে। দুনিয়া হতে পুঁজিবাদ ঝাড়ে-বংশে নির্মূলীকরণে অনুরূপ যুদ্ধ বা তদার্থে কয়টি যুদ্ধ করা লাগতে পারে তা আগে হতেই অনুমান করা সময়ের অপচয় মাত্র। অত:পর, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেনা-পুলিশ মুক্ত এবং সাধারণভাবে যুদ্ধমুক্ত এবং চূড়ান্তভাবে যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ত্র মুক্ত সমাজের ভিত্তি বিধায় সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সাধারণভাবে সকলেই অনিশ্চয়তা-আশংকাহীন এবং ভয়- ভীতি মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ শাশ্বত শান্তিতে সকলেই বসবাস করতে পারবে ।

কাজেই, প্রকৃতি বিজয়ে এমনকি মৃত্যু ঠেকাতে সদা তৎপর এবং বিজয়ের আনন্দ ও প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ তথা মানবিক সংকটহীন-দুশ্চিন্তা হীন ও যুদ্ধহীন এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বমূলক ব্যক্তি বা কর্তৃত্বকারী সংগঠনহীন, রাষ্ট্রীয় কাঠামোমুক্ত ও রাষ্ট্রিক গন্ডীহীন এবং রাষ্ট্র রক্ষক বৈশ্বিক সংস্থা বা দি ফান্ড ধরণের মহা প্রভুহীন এক মুক্ত বিশ্ব স্থাপন তথা স্বাধীন মানুষের স্বাধীন বিশ্ব অর্থাৎ একটি বিশ্বে একটিমাত্র মানব জাতি তথা শ্রেণীহীনতার **সাম্যের সমাজ** প্রতিষ্ঠায়

যথোপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ-বাস্তবায়ন ও উপযুক্ত পদক্ষেপ-ব্যবস্থাদি ও কার্যক্রম নিশ্চিতকরণসহ উক্তরূপ কর্মসূচী-কার্যাদি সামষ্টিকভাবে বাস্তবায়ন-সম্পাদনে,তদোপযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রায়োগিক কাঠামো সম্পন্ন নানান অর্থনৈতিক-সামাজিক ফোরাম ও সংগঠন সমন্বয়ে গঠিত একটি সমাজই সমাজতান্ত্রিক সমাজ হেতু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইত:পূর্বেকার অপরাধ বা দুস্কর্ম সহ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈরীতা-বৈষম্য ও বিরোধ সৃষ্টি ও প্রসারের যেমন সুযোগ নাই তেমন ঐরূপ ক্ষতিকর কর্ম ইত্যাদি করার আদৌ প্রয়োজন নাই। কারণ-

(১) পুঁজির কবল হতে শ্রম ও সমাজ মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কর্মক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির যোগ্যতা ও দক্ষতার সর্বাধিক কার্যকারতা নিশ্চিত হবে;

(২) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বাধিক বিকাশ সাধন করার মাধ্যমে পরিকল্পিত ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করা হবে;

(৩) বসবাসের জন্য অনুকুল নয় বা অতীব শীতার্ত অঞ্চল, সাগরপাড় বা পাহাড়-উপত্যকার দুর্যোগময়তা ও ঝুঁকিপূর্ণতায় নিত্য বিপদাপন্ন জীবন-যাপনের বিড়ম্বনা হতে নিরাপদ ও অনুকুল পরিবেশ বা উৎপাদন সহায়ক ভৌগোলিক পরিবেশে বা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিতকরণে ধরিত্রীর জনবসতির আবশ্যকীয় পুনর্বিন্যাস হবে;

(৪) মিথ-প্রথার সকল প্রকার অনাচার-কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভাববাদিতা পরিহার ও পরিত্যাগ করার মাধ্যমে কেবলই ইহজাগতিক জীবনবোধের সমাজ বলেই সমাজতন্ত্র একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ । তাই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার অবারিত সুযোগের হেতুবাদে সমাজের কর্মক্ষম সকলেই সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনের সুযোগ পাবে। ফলে-দৈহিক ও মানসিক শ্রমের দুরত্ব বিলীন হবে। সকলেই বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান মনষ্ক ব্যক্তি বিধায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ জীবন-ধারণের জন্য যেমন প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী উৎপন্নে খুব একটা সময় ব্যয় করতে হবে না এমনকি তদার্থে মাসেও হয়তো ১০ ঘন্টা শ্রম করতে হবে না ।

অত:পর, কর্মক্ষম সকলে সামান্যতম সময় উৎপাদনের জন্য ব্যয় করলেও সমাজে উৎপাদনের বন্যা বেয়ে যাবে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ কার্যত একটি প্রাচুর্যের সমাজ। তাছাড়া- দৃশ্যমান বিশ্বের ৯৫% এখনো ড্রার্ক এনার্জি ও ড্রার্ক মেটার। কাজেই, অফুরন্ত ড্রাক এনার্জি ও ড্রাক মেটার যেমন মানুষ ব্যবহার করার সুযোগ পাবে তেমন কেবলমাত্র পৃথিবীর অভ্যান্তরের অব্যবহৃত এনার্জি ও মেটার ব্যবহার করা সহ এসকল এনার্জি ও মেটারের বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে যা যা উৎপন্ন হবে তার হিসাব বা পরিমাণ এখনো কেবলমাত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণেই স্থির করা সম্ভব না হলেও সমাজতন্ত্রে মানুষ এসকল বিষয়ে আরো বেশী মাত্রায় মনোযোগি হবে।

উপরন্ত এখন মানুষ যা যা ভোগ-ব্যবহার করে ঠিক তা তা ভোগ-ব্যবহার করার আবশ্যকতা যেমন ঐতিহাসিক কারণেই নাই তেমন বিজ্ঞান নিত্য নৈমত্তিক নতুন নতুন উপকরণ তা যেমন উৎপাদনের তেমন জীবন-যাপনের তৈরী করবে বলেও সমাজতন্ত্র প্রকৃতই কেবলই প্রাচুর্যের এবং প্রাচুর্যের সমাজ;

(৫) সমাজিক মালিকানাধীন সকল খাত-উপখাত ইত্যাদি প্রতিটি সম্পত্তিতে প্রত্যেকেই যৌথভাবে মালিক বিধায় সমাজের সকল বিষয় সকলের সম্মিলিত সম্মতিতে সম্পাদিত হবে হেতু অনুরূপ বিষয়াদির ক্ষেত্রে উদ্ভুত-সৃষ্ট বৈরীতা সংশ্লিষ্ট স্তরে-পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সম্মিলিত সিদ্ধান্তে নিস্পত্তি-নিরসন বা সমাধান হবে;

(৬) শিশু, পংগু, বিকলাংগ-প্রতিবন্দি, দু:স্থ-কর্মাক্ষম ও বৃদ্ধ সহ অনরূপ ব্যক্তির দায়িত্ব যৌক্তিক কারণেই সমাজ বহন করবে বলে এতদ্বিষয়ে কারো অনিশ্চয়তা বা দু:শ্চিন্তা করার প্রয়োজন নাই;

(৭) সামাজিক শান্তি-শৃংখলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলে তবেই কেবলমাত্র ব্যক্তির জীবন-মর্যাদা তথা মানব সত্ত্বার মর্যাদা নিশ্চিত হবে বিধায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকেই প্রত্যেকের শান্তি ও মর্যাদা সুনিশ্চিতকরণে স্বেচ্ছায় সক্রিয়ভাবে নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালন করবেন;
(৮) বংশ লতিকা -পৈত্রিক আভিজাত্য ও স্বীয় রূপ-লাবন্যের নিরিখে কিঞ্চিত ফি সহ ভরণ-পোষণের বিনিময়ে ভোগ-সম্ভোগের বস্তু বা সন্তান জন্মানোর কারখানা বা "পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা" রূপ বিনামজুরীর ঘরকন্যার চিরকালীন দাস পোষণের সুযোগ সমাজতন্ত্রে নাই বিধায় শিশ্নের প্রাধান্যবোধে "ম্যান" অর্থে কেবল পুরুষই, মানুষ গণ্য বলে তেমন "মানুষ্য" রূপী পুরুষের সমান অধিকারী হিসাবে নারীকে তদানুরূপ অবস্থানে প্রতিষ্ঠত করার নিমিত্তে বুর্জোয়া নিদানের জেন্ডার সমতা নয়, বরং পুরুষকে অনুরূপ বর্বর বোধ হতে মুক্তকরণে 'ম্যানকাইন্ড' অর্থে নারী ও পুরুষ,সকলেই কেবলমাত্র মানুষ হিসাবে গণ্য হবে হেতু নির্লজ্জ পুরুষালী অসভ্যতার যেমন অবসান হবে তেমন মধ্যযুগীয় অবলা-অসহায় নারী আধুনিককালে হয়ে উঠবে কেবলই পরিপূর্ণ মানুষ বলেই "মনু"র পুত্র "মানুষ্য" হিসাবে হাল আমলেও গণ্য না হলেও বা হিউম্যান ম্যানকাইন্ডের সদস্য সত্ত্বেও বংশ বিস্তারের অংগহীন হিজড়াও স্বীকৃত হবে "হিউম্যান বিয়িং" অর্থে মানুষ বলেই দীর্ঘদিন হতে চলে আসা জেন্ডারকেন্দ্রীক নোংরামি-অসভ্যতা ও বর্বরতার অবসান অনিবার্য বলেই ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তি ও সম্পত্তি গণ্য "নারী" কেন্দ্রীক কুকর্ম বা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ-সমাজতান্ত্রিক সমাজে নাই । অনুরূপভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক ক্ষমতার চির অবসানে সকলেই কর্মরত বিধায় কেহই বক্তি বিশেষের খবরদারী-নজরদারী ও কর্তৃত্বের অধীনস্ত হওয়ার আবশ্যকতা নাই বিধায় সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতাকেন্দ্রীক বিরোধ বা বৈরীতার সুযোগ নাই হেতু সামান্ত তান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বিরোধীতা-বৈরীতা নিরসনে ঐ সকল পরিত্যক্ত ব্যবস্থাবলীর আইনী দর্শন অর্থাৎ বুর্জোয়া কাম ফিউডাল জুরিস্প্রুডেন্স সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিত্যাজ্য বৈ প্রয়োগযোগ্য নয় বরং অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর ।

কাজেই, ঐ সকল জুরিস্প্রুডেন্সের ফতোয়ামতো সৃষ্ট জুডিশিয়ারী বা "বিচার বিভাগ" সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সামঞ্জস্য ও সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া- "বিচার" ও "বিচারপতি" শব্দগুলো মানুষের স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার প্রতি অবমাননাকর এবং এসকল প্রথা-নিয়ম ইত্যাদির সৃজন-উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়েছে মানুষ কর্তৃক মানুষকে পরাধীন ও পরাভূতকরণের মাধ্যমে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক অপরাপর সকল ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব-প্রভুত্ব নিশ্চিত করার জন্য।

আবার, সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার ইত্যাদিকে " সিভিল রাইট" বা " দেওয়ানী স্বত্ব" গণ্যে পূর্বতন জুরিস্প্রুডেন্সে - "দেওয়ানী আইন" , " দেওয়ানী কার্যবিধি" ও "দেওয়ানী আদালত" ইত্যকার বিষয়াদির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের কারণে বা সামাজিক মালিকানাধীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে অপ্রয়োজনীয় হওয়া বৈ কোন কার্যকারিতা নাই। তবে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রারম্ভিক অবস্থায় সমাজতন্ত্র বিরোধী শ্রেণী বিলীন বা বিলুপ্ত হয় না বলে অনুরূপ শ্রেণী বৈরীতা অবসানে বা সাবেকী আমলের পরজীবী বা

অশ্রমজীবি শ্রেণী প্রতিনিয়ত পরজীবীতার সুযোগ-সুবিধা সমেত হারানো ক্ষমতা ও মালিকানা ফিরে পেতে সচেষ্ট থাকে বলে অনুরূপ অপচেষ্টা প্রতিহতকরণে অথবা শ্রেণী বিভাজনের অমানবিক ঘৃণ্য ধারণায়-ব্যবহারে অভ্যস্ত মানুষজনের বহু শতাব্দি হতে রপ্ত-প্রাপ্ত অমানবিক গুণাবলী বা দৃষ্টি ভংগির সীমাবদ্ধতা দুরীকরণে এবং সামগ্রীকভাবে সাম্যবাদী দর্শন বা জীবনবোধ কার্যকরণ ও বাস্তবায়নে সমাজতন্ত্রের কাল পর্বে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ও সমাজের সহিত ব্যক্তির সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সুনিশ্চিতকরণে ক্রমোন্নত ও পরিবর্তন সাপেক্ষ সামাজিক জীবনে ***ব্যবহারিক বিধানাবলী*** অর্থে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা আবশ্যক ।

তাছাড়া- "সাম্য " প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তির ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রান্তি বা মানবিকতা বিরোধী পুরানো বদাভ্যাসের পুনরাবৃত্তি রূপ কার্যাদি হতে ব্যক্তিকে মুক্তকরণে প্রয়োজনীয়-উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করে বা ভ্রান্তি নিরসন ও দোষ-ত্রুটি স্খালন ও সংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে উন্নততর সামাজিক-মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী ব্যক্তি ও অনুরূপ বোধের বিকাশ সাধনের সুযোগ সুনিশ্চিত করার পরিবর্তে মানুষকে সাবেকী আমলের জুরিস্প্রুডেন্সের ব্যাখ্যা-বিবৃতি ও নিদান মতো অপরাধী গণ্যে দন্ড প্রদান বা বিচার করা সমাজতান্ত্রিক নীতি হতে পারে না। অথবা সাবেকী আমলের বিচার বা অনুরূপ ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে স্বীয় কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমেত স্বীয় কার্যাদি মুল্যায়ণে অক্ষম-অপরাগ বা স্বীয় বিষয়ে স্বয়ং পর্যালোচনায় অক্ষম বা তদানুরূপ বিষয়ে স্বয়ং অনুভুতিতে অযোগ্য এবং কেবলই ব্যক্তিকেন্দ্রীক স্বার্থান্ধ বা নিছক ভোগবাদী প্রাণী গণ্যে অমর্যাদা ও অসন্মানিত করার কারণে মানুষকে অসন্মান-অমর্যাদা করার সকল কার্যাদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিত্যাজ্য । মানুষ জন্মগতভাবে অপরাধী নয় বা অপরাধ প্রবন প্রাণী নয়, কেবলই শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী বৈষম্যের ব্যবস্থা বিশেষের হেতুবাদে কেউ কেউ অপরাধ করে বটে বা ঐ সকল ব্যবস্থাদির সুবিধাভোগীদের নিদান-বিধান অমান্য ও ভংগ করে বলে প্রচলিত নিয়ম-নীতি বা প্রথা ভাংগার দায়ে কেউ কেউ অপরাধী হিসাবে গণ্য হয় সুবিধাভোগীদের প্রতিক্রিয়াশীল নিদানে।

অত:পর, সমাজতন্ত্র যেহেতু শান্তির সমাজ সেহেতু সমাজের সকলের শান্তি নিশ্চিত করার পরিবর্তে গোত্র প্রথার জিগাংসা বা প্রতিশোধস্পৃহার বা খুনের বদলে খুনের অমানবিক-অশান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভংগি যা দাসতন্ত্রে রাজকীয় বিধানে দন্ডনীতি হিসাবে গৃহীত হয়েছিল সেই রূপ খুন-খারাবির জঘন্য দন্ডনীতি য'দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে সামন্তবাদী-পুঁজিবাদী জুরিস্প্রুডেন্স তার অনুসরণ -অনুগমন করা সমাজতন্ত্রের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করারই নামান্তর।

অথবা,স্বীয় প্রতিষ্ঠিত নিজ সাম্রাজ্য সহ স্বীয় কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণে সূর্য দেবতা বকলমে বিচারের দেবতা "শামাশ" এর নিকট হতে প্রাপ্ত হয়ে "হাতের বদলে হাত" বা "মাথার বদলে মাথা" কর্তনের কথিত বিচারিক নীতি ভিত্তিক লিখিত সংবিধান, খ্রীষ্ট পূর্ব ১৭৬০ সালে প্রণয়ন করেছিলেন হালের গণতান্ত্রিক আমেরিকায় এখনো ন্যায়দন্ডের প্রতিক মর্মে পুঁজিত ও প্রতিমূর্তি রূপে সেখানকার কোর্ট কাছারীতে প্রতিস্থাপিত ব্যাবিলনের সম্রাট হাম্মুরাবী। ঐরূপ দন্ডনীতি হিব্রু বাইবেলে এক্সুডাস-২১ এর ২৩ এ প্রতিফলিত হয়েছে।

অনুরূপ জংলী দৃষ্টিভংগি প্রসূত পক্ষপাতহীনভাবে ব্যক্তি বিশেষের অপরাধ নিরূপন ও সমপরিমান দন্ড নিশ্চিতকরণে-বামহাতে পাল্লা, ডান হাতে খোলা তলোয়ার এবং চোখ বাঁধা রোমান দেবী " লেডি জাষ্টিস" এর প্রতিমূর্তি বা কিঞ্চিত পরিবর্তনসহ ঐ দেবীমূর্তির প্রতিমূর্তি এখনো বহু দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সংরক্ষণ এবং ন্যায় বিচারের প্রতিক বা দেবী "লর্ড জাষ্টিস" এর প্রতি আনুগত্যে ও অনুকরণে তৎকালীন যুগের আচার-আচরণ ও ব্যবহার করা সহ বিচারক পদবীর নামকরণ "জাষ্টিস" করার মাধ্যমে কার্যত অনুরূপ প্রতিহিংসামূলক বা রিটেলিয়েশনের নীতি ভিত্তিক প্রণীত রোমান আইনের অনুসরণ এবং একই সংগে রোমান মাইথলজির অন্ধ অনুকরণ করছে সভ্যতা-গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের দাবীদার মূর্খ-মূঢ় ও ভন্ডরা ।

অথবা, মহাভারতের আদি পর্বের বর্ণনা মতে দেবতা বিষ্ণুর নাতি এবং রাজা দুসয়ন্তের পুত্র "রাজা ভারত" সর্বপ্রথম সমগ্র ভারত বিজয় এবং ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন । রাজকীয় কর্তৃত্ব বহাল ও বজায় রাখতে চাতুর্বর্ণের অর্থাৎ ব্রক্ষার অংশ এবং মনুর মাথা বলে বুদ্ধিজীবী তবে নিষ্কর্মা ব্রক্ষণ, রাজ্য-পাট বেদখল-দখল ও রক্ষাকারী পেশাগত খুনি বা যুদ্ধা ক্ষৈত্রিয়, পরস্পহরণে কৌশলী ব্যবসা-বাণিজ্য পেশার বৈষ্য এবং সকল উৎপাদনশীল কর্মের কর্মী এবং উপরোক্ত ৩ গোত্রের হুকুমের গোলাম বা চাকর বলে অস্পৃশ্য- শূদ্র , এইরূপ শ্রেণী বিভাজনের ব্রাক্ষণ্যবাদী রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ও কাঠামোর পত্তন করেছিলেন।

কিন্তু বৈদিক ভারতের অনুরূপ কাঠামো কালক্রমে বহুবিদ কারণে বিপদাপন্ন হয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য -

(১) ব্রাক্ষণ্যবাদের "আত্মা ও পুন:জন্ম" বিষয়ক তত্ত্ব বা বক্তব্য সত্য নয়, কেবল ব্যথা-যন্ত্রণা নয় বরং আনন্দের জন্য "কর্মময় জীবন" এবং পেশাগত স্বার্থ রক্ষায় মানবিক বোধহীন "ভন্ড,বদমাস ও ভাঁড়" ব্রাক্ষণদের কর্তৃত্ব মুলক চাতুর্বর্ণের বর্ণভেদী কাষ্ট প্রথা অস্বীকার করে বস্তুবাদী বোধে বর্ণবৈষম্যহীন সমতাবাদী মিষ্টি ভাষের "চারুবাক" দর্শন তথা "বৃহস্পতি সূত্র" রচিত হয়েছিল খ্রীষ্ট পূর্ব ৬০০ সালে । প্রভাব পড়েছিল সমাজের নিম্ন বর্ণে।

(২) কপিলাবস্তুর প্রিন্স গৌতম (জীবনকাল- খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৬৩ হতে খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৮৩ সাল) কর্তৃক জাত-বর্ণ ও গোত্রহীন নিরশ্বরবাদী "বুদ্ধ"ধর্মের পত্তন । মগদ সম্রাট রাজা বিম্বিসরা (খ্রীষ্ট পূর্ব-৫৪৩ হতে খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৯১ সাল) , সম্রাট চন্দ্র গুপ্তের দৌহিত্র মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সম্রাট অশোক (খ্রীষ্ট পূর্ব -২৭৩ হতে খ্রীষ্ট পূর্ব ২৩২ সাল) , ইন্ডো-গ্রীক কিংডম (বর্তমান পাকিস্তান) এর শাসক মিনান্ডার-১ (খ্রীষ্ট পূর্ব -১৬৫ হতে খীষ্ট পূর্ব ১৩০ সাল) প্রমুখ বুদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতের সীমানা পেরিয়ে মধ্য এশিয়ায় বুদ্ধ ধর্মের প্রসার সাধিত হতে থাকে।

(৩) আরেক নিরশ্বরবাদী ধর্ম, বলা হয়ে থাকে ইন্ডাস ভেলী সভ্যতা (খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০০ হতে খ্রীষ্ট পূর্ব ১৫০০ সাল) হতে চলে আসা জৈন ধর্মকে আরো উন্নততর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ ৮টি নীতি সমেত সূত্রায়ন করেন প্রচীন ভারতের লুসিয়ানা (বর্তমান বিহার)

রাজ্যের প্রিন্স সিদ্ধার্থ বা মহাবীর (জীবনকাল-খ্রীষ্ট পূর্ব ৬১৫ হতে খীষ্ট পূর্ব ৫৯৯ সাল)। সমাজতান্ত্রিক মালিকানার সন্ধান তিনি পাননি এবং পাওয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু ব্যক্তিমালিকানা যে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তি সৃষ্টি করে তা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন বলে তিনি যেমন রাজা হননি তেমন সম্পত্তির ব্যক্তিগত দলখীমুক্ত থাকতে স্বীয় বস্ত্র পরিত্যাগ করে দিগম্বরী থেকেছেন আমৃত্যু। গৌতম বুদ্ধ নারী-পুরুষের সমতায় আস্থাশীল ছিলেন না কিন্তু জৈন ধর্মের ২৪তম তিরথ্রনংকার মহাবীর কোন ধরনের বৈষম্যের পক্ষে ছিলেন না । তিনি সম্পত্তির দখলীহীনতা মুক্ত নারী-পুরষের সাধু-সন্যাস ব্রত গ্রহণ করার বিধান সহ অহিংসা-সত্যান্বেষণ বা সত্যবাদিতা সমেত জাত-বর্ণ হীন মানবিক সমতা সাধনে ৮টি মূলনীতি প্রণয়ন করেছিলেন।

অত:পর, নীচু বর্ণের তবে রাজবাড়ীর চাকরানী "ময়ুর" এর গর্ভজাত এবং নান্দ ডাইনেষ্টীর রাজা মহাপডমা ধনা নন্দার-বৈবাহিক সম্পর্কহীন/অবৈধ পুত্র স্বীয় পিতাকে পরাজিত করে খ্রীষ্ট পূর্ব ৩২২ সালে মায়ের নামে "মৌর্য্য" সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিনা অভিষেকে রাজ সিংহাসন আরোহন করেছিলেন সম্রাট চন্দ্র গুপ্ত। রাজা ভারতের পরে তিনিই একমাত্র সম্রাট যিনি সমগ্র ভারত ব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় বানপ্রস্ত গ্রহণ করে জৈন ধর্মের রীতি মোতাবেক স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থায়ীকরণে রাজা চন্দ্রগুপ্তের পালক পিতা ও প্রধানমন্ত্রী এবং ঐ সাম্রাজ্যর স্থপতি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সংমিশ্রিত নাস্তিক্যবাদী "আজিবেক" ধর্মের অনুসারী ও গ্রীক ইনভেডার আলেকজান্ডারের ভারত দখলে তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে বিদেশী দখলমুক্ত ভারত প্রতিষ্ঠায় ব্রতগ্রহণকারী এবং ভারতের প্রথম এবং বলা হয়ে থাকে বিশ্বের পাইওনিয়ার অর্থনীতিবিদ চানক্য রচনা করেছিলেন "অর্থশাস্ত্র"যা বস্তুগত স্বার্থের বিজ্ঞান বা রাজনৈতিক বাস্তবতার পুস্তক বলে পরিচিত । আদর্শ রাজার দায়িত্ব - কর্তব্য সহ বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে অনাথ অর্থাৎ বিবাহ বহির্ভূত সন্তান ও মাতা-পিতাহীন শিশুদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যয় রাষ্ট্রায়ত্ত খাত হতে বহন এবং খনিজ-শিপিং, ও বস্ত্র শিল্প ইত্যাদি সমেত রাষ্টায়ত্তখাত ও অনুরূপ রাষ্ট্রীয় বস্ত্র শিল্পে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানে গড়িমসি এবং নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে কোন রূপ বৈরীতা বা বিরূপ আচরণ বা পুরষ শ্রমিকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দন্ডযোগ্য অপরাধ গণ্য করে নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীর অগ্রাধিকার এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে ইতিহাসে প্রথম গোয়েন্দা বাহিনী গঠন, ব্যবসা-বাণিজ্যে জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণ ও রাজস্ব নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক শৃংখলা সুনিশ্চিতকরণে কঠোর দন্ডদানের বিধানাদি সমেত মোট ১৫ খন্ডে অর্থশাস্ত্র প্রণীত হয়েছিল।

কিন্তু, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিশৃংখলার যুগে " সত্যভহনা" সাম্রাজ্যের (খ্রীষ্ট্র পূর্ব ২৩০ হতে ২২০ খ্রীষ্টাব্দ) পত্তন এবং ইতিহাসে প্রথম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় কলোনী স্থাপনকারী ঐ ডাইনেষ্টীর কালে বিশেষত ঐ বংশের গৌতমীপুত্র শতাকরনির আগ্রহ ও সমর্থনে চাতুর্বর্ণের "হিন্দুজম" ভারতে পুন:প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কুশান সাম্রাজ্যের (১০৫ হতে ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পৃষ্ঠপোষকতায় ও গুপ্ত সামজ্যের (২৮০ হতে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রত্যক্ষ মদদে হিন্দুজমের রেনেঁসাস বা পুন:র্জাগরণ হয়।বিজয়ী হিন্দুজমকে স্থায়ীকরণে- ধারণা করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ হতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে "মনুস্মৃতি" বা কোর্ড অব মনু বা "মানব ধর্ম" বা "ধর্মশাস্ত্র " প্রণীত হয়েছে।

মাৎস পুরানের মতে আদি মানব মনুর সপ্তম রূপ দ্রাবিঢ় রাজ সরড্ডাদেব মনু । মনু সংহিতায়- চাতুর্বর্ণের বাহ্মণ্যবাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অক্ষয়করণে অনুচ্ছেদ ১.৩ দ্বারা ব্রাহ্মণকে সকল শ্রেণীর লর্ড গণ্য করা হয়েছে এবং দশম ভাগ, অনুচ্ছেদ -৯২, এ মাংস ও লবন বিক্রির দায়ে খোদ ব্রাহ্মণের বর্ণচ্যুতি ও ৩ দিন মাছ বিক্রির দায়ে শূদ্র বর্ণে নির্বাসনের দন্ড দান এবং শ্রেণী বা বর্ণবিন্যাস অক্ষুন্ন রাখার প্রযোজনে - সম্রাট চন্দ্র গুপ্তের মাতার মতো নীচুজাতের রমনীর সন্তানরা যাতে ভবিষ্যতে রাজা হতে না পারে সেজন্য অসমবর্ণের বিবাহ বা ব্যভিচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও অনুরূপ কারণে উৎপাদিত সন্তান সমূলে নির্বংশ করার ৭মভাগ অনুচ্ছেদ-৩৫২ ও ৩৫৩ সংযোজিত হয়েছে। রাজধর্ম পালনে অক্ষম ও অযোগ্য রাজাকে "পাগলা কুকুরের মত হত্যা"এবং বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ ঘুষ গ্রহণসহ স্থিরকৃত অনৈতিক ক্রিয়ায় যুক্ত হলে দোষী জর্জকে "নিশ্চিহ্ন" করার বিধান দেওয়া হয়েছে। প্রতিশোধ নিতে ভুল করেনি মনু , তাইতো মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে আগুনে পুড়িয়ে জীবন্ত হত্যা করা হয়েছে -দুর্যুধনের বন্ধু চার্বাককে।

অত:পর, জাগতিক,লৌকিক ও বৈষয়িক স্বার্থ রক্ষায় রাজনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিতকরণে তথা মানুষের উপর মানুষের শোষণ, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখতে অলৌকিক দেব-দেবতার দোহাই দিয়ে রাজা স্বয়ং দেবতার উত্তরাধিকার বা প্রতিনিধি সেজে বিচারের নামে সৃষ্ট অনুরূপ ভয়-ভীতি, ত্রাস-সন্ত্রাস ইত্যাদি জারি ও বহাল রেখে তথাকথিত ন্যায় বিচার ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার অজুহাতে কার্যত মানুষকে রাজা-বাদশা নামক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনস্ত রাখার বিধানাবলীর জুরিস্প্রুডেন্স দাস ও সামন্ততন্ত্রের আন্ত:মুল-দর্শন হতেই উৎসারিত বলেই সেকালে রাজা-বাদশাগণ, দাস ও প্রজাদেরতো বটেই নিজেদের পরস্পরের গলা-মাথা কাটা-কাটি করেই নিজ নিজ কর্তৃত্ব বা শাসন প্রতিষ্ঠা করতেন এবং অনুরূপ সাম্রাজ্য-রাজ্য সমেত স্ব-স্ব কর্তৃত্ব বহাল রাখতেন,বাদ থাকেনি সভ্য হিসাবে দাবীদার বুর্জোয়া শ্রেণীও ।
এতদমর্মে উল্লেখ্য-
(ক) দুনিয়ায় ২২% ভূমিতে মোংগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী চেংগিস খান (জন্ম-১১৬২, সাম্রাজ্য-১২০৬-১২২৭) স্বীয় ভাইকে হত্যা করে স্বীয় পরিবারের কর্তৃত্ব লাভ করেন, অপহৃত স্ত্রীকে উদ্ধার করে গোত্রাধিপতির কর্তৃত্ব লাভ ও তা নিশ্চিতকরণে এবং অপহৃত স্ত্রীর গর্ভজাত বিদ্রোহী প্রথম পুত্রকে অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত ২য় পুত্রের মাধ্যমে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য সুরক্ষায় - প্রিন্স সহ অন্যান্য ভোটারগণের ভোটে নির্বাচিত না হয়ে কেউ নিজেকে রাজন্য ঘোষণা, চুরি-অপহরণ, পলাতক দাসকে অন্ন-বস্ত্র বা অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করা এবং সেনাবাহিনীতে যোগদানে অস্বীকৃতি ইত্যাদিকে মৃত্যদন্ডযোগ্য অপরাধ গণ্যে নিজেকে "এম্পারার অব অল ম্যান" স্থির ও স্থায়ীকরণে "ইয়াস্সা" নামে লিখিত আইন বা কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন করেছিলেন।

(খ) চেংগিস খানের উত্তর পুরুষ , ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী সম্রাট বাবরের পূর্ব পুরষ এবং হালের উজবেকিস্তানের জাতীয় বীর তৈমুর লং- ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ হত্যা করে টিমরূদ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে ১৭ ডিসেম্বর-১৩৯৮ সালে সুলতান মাহমুদকে পরাজিত করে দিল্লীতে প্রবেশ করে ১ ঘন্টায় ১০,০০০ এবং ১দিনে ১লাখ লোকের গলা কেটে ছিল এবং লুণ্ঠনকৃত মূল্যবান হিরা-জহরৎ দখলীভুক্ত ৯০টি হাতিতে

বহন করে সমরকন্দে "বিবি কানওয়াইন" মসজিদ নির্মাণ করে ধর্ম বিশেষের প্রসার ও আনুগত্যের অজুহাতে কার্যত সেন্ট্রাল এশিয়ায় স্বীয় কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

(গ) মোগল সম্রাট আকবর, ৫ নভেম্বর, ১৫৫৬ সালে দিল্লী পুনর্দখল করে পরাজিত ও ধৃত রাজা বিক্রমাদিত্যকে কেটে টুকরো টুকরো করে তার কাটা মাথা দিল্লীর দরওয়াজায় টানিয়ে রেখেছিলেন এবং পরাজিত ও বন্দী সৈনিকদের কাটা মাথা দিয়ে দিল্লীতে বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে দিল্লী দখল প্রত্যাশী বা আক্রমন ও পুনাক্রমনকারী বা সাম্ভাব্য বিদ্রোহীগণকে অনুরূপ ভয়াণক পরিণতির বিষয় নিত্য জানিয়ে দেওয়ার স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে ঐ স্তম্ভের হিংস্রতা সমেত সানে-নজুল ও স্বীয় নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার কীর্তি চিরজাগরুক রাখতে ও স্থায়ীত্বের মাধ্যমে স্বীয় বিজয়কে স্থায়ী করার বিহীত করেছিলেন । অনুরূপ বর্বর- হিংস্র কার্যাদির মাধ্যমে ভারতীয় জনগণকে মোগল কর্তৃত্ব মানতে ও মানাতে বা বাধ্যকরণে সিদ্ধহস্ত আকবর তাঁর প্রধানমন্ত্রী আবুল ফজলকে দিয়ে "আইন-ই-আকবরী" প্রণয়ন করেছিলেন।

(ঘ) কোম্পানী শাসন ও কর্তৃত্বকে অমান্য করায় ঝাঁসির রানী সহ অনেককেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা এবং শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ্ জাফরের পুত্র প্রিন্স মির্জা আযম সহ ৩ জন শাহজাদাকে হুমায়ুন টম্বের খুনি দরওয়াজায় গুলি করে হত্যা করেছিল কোম্পানী মেজর হডসন। শাহজাদাগণের লাশ প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়েছে । হত্যা করা হয়েছিল সম্রাটের পরিবারের আরো বহু সদস্যকে এবং রেংগুনে নির্বাসিত হয়েছিলেন স্বয়ং সম্রাট। অত:পর, ভারতীয়রা যেন অনুগত থাকে ব্রিটিশ রাজের সে জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রণীত হয়েছিল "দি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট-১৮৫৮"।

(ঙ) বিশ্ববাসী যাতে পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব মান্য করে সে জন্য ২০০৫ সালে ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশ্ব সামরিক ব্যয়ের ৪৮% একাই খরচ করেছিল আমেরিকা। ২০০৫ এর বাজেটের সামরিক -৫১%, শিক্ষা -৭% এবং স্বাস্থ্য খাতে ৬.১% ব্যয়ের তুলনায় আমেরিকার ২০০৮ সালের বাজেটে সামরিক -৫১.৮%, শিক্ষা -৬.৫% এবং স্বাস্থ্য খাতে ৫.৬.% ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। আমেরিকাই পারমানবিক বোমা হামলা করে ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট জাপানের হিরোশিমায় ১,৪০,০০০ জন এবং ৯ আগষ্ট নাগাসাকিতে ৯০ হাজার নিরস্ত্র মানুষকে নিমিষে হত্যা করেছিল। অত:পর, আমেরিকার উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে প্রণীত হয়েছিল- " বিশ্বজনীন মানবাধিকার সনদ।" বিধায় মর্মমূলে একই ধারণা প্রসূত তবে কালিক ও ব্যবস্থার পরিবর্তনে কিঞ্চিত তারতম্য বা পোষাকী পরিবর্তন সহ ভয়-ভীতির দাসতান্ত্রিক-সামন্তবাদী জুরিস্প্রুডেন্স পুঁজিবাদ অনুসরণ করে আসছে ।

কিন্তু, ভয়-ভীতি হীন সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ সামাজিক মুক্তি সুনিশ্চিতকরণের শর্তে প্রত্যেক মানুষ স্বীয় স্বাধীনতা , মুক্তি ও শান্তি অর্জনে সক্ষম বিধায় সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষ স্বীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি নিশ্চিতকরণে স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে সামাজিক শৃংখলা সুনিশ্চিতকরণে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংগঠনের কর্তৃত্ব নয়, বরং মানুষ হিসাবে নির্ভয়ে প্রত্যেকের কার্যকর অংশগ্রহণে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে প্রণীত সামাজিক বিধি-বিধান, রীতি-

নীতি ও সিদ্ধান্ত সমুহ প্রত্যেকেই স্ব:তপ্রণোদিতভাবে পারস্পারিক সযোগিতায় কার্যকর ও মান্য করাই সামাজিক নীতি ও বৈশিষ্ট হেতু দাস-সামন্ততন্ত্রের তৈরীকৃত ও পুঁজিবাদের অনুসৃত ভীতিকর-অমানবিক এবং অমর্যাদাকর জুরিস্প্রুডেন্সের বিপরীতে চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রেণীহীন -রাষ্ট্রহীন মর্মে বাউন্ডারী হীন ধরত্রীর সম্পদ ও সম্পত্তির সার্বজনীন সাধারণ মালিকানা সমেত একটি মানব জাতি এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী মুক্ত ও নিরাপত্তা প্রহরীহীন অর্থাৎ শূন্য সংখ্যক পুলিশ - সামরিক বাহিনী ও অনুরূপ খাতের ব্যয়হীন প্রাচুর্যের সাম্যবাদী সমাজ বিনির্মাণের উপযুক্ত ও কার্যকর সংগঠন ও ব্যবস্থাবলী তথা শংকামুক্ত ও মানবিক মর্যাদার জীবনবোধের সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী সামাজিক নীতিমালা প্রণয়ন করা অতীব আবশ্যিক।

তাছাড়া-সামন্ততন্ত্রে সাধারণ্যের ভোটাধিকার নাই বলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পর্কিত অনিয়ম-কারছুপি- জালিয়াতি সমেত এতদসম্পর্কিত অপরাধাদি ও তজ্জনিত দন্ড ইত্যাদি বা অনুরূপ কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক সংকট সামন্ততন্ত্রে সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ ছিল না।অথবা, শিল্পায়নের প্রয়োজনে সামন্ত তন্ত্রের উৎখাতসহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনে ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা-লাভ, অর্জন বা গ্রহণ অন্যায় বা অনৈতিক নয়, বা স্বীয় সন্তানের শিক্ষা-চিকিৎসা সহ ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব -কর্তব্য কেবলমাত্র বা প্রধানত পিতা-মাতার এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারসহ দান-বিক্রি হতে উদ্ভুত সমস্যা এবং অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকারের জুট-ঝামেলায় সৃষ্ট ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির বিরোধ-বৈরীতা অথবা বার্ধক্যে কর্ম অক্ষম পিতা-মাতার ভরণ -পোষণের দায়-দায়িত্ব সামন্তবাদী বিধান ও প্রথাগতভাবে সন্তানের উপর বর্তায় বলে অনুরূপ বিষয়াদিতে কোন অনিয়ম ইত্যাদি অন্যায় হিসাবে গণ্য।

কিন্তু, সমাজতন্ত্রে ভূমি সহ উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদিকা শক্তির ব্যক্তিমালিকানা বিলোপের নিমিত্তে উত্তরাধিকার-অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিধি-বিধান বিলোপ হয় বিধায় পিতা-মাতা বা সন্তানের দায়-দায়িত্ব, ভূত-ভবিষ্যত তাবৎ বিষয়াদি সমাজের অর্থাৎ বিশ্ব মানব জাতির সদস্য হিসাবে প্রত্যেকে শিশু-বৃদ্ধ সহ নানান কারণে স্বীয় জীবন নির্বাহে অক্ষম জনের দায়-দায়িত্ব সমাজের। এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিত অবহেলা-অবজ্ঞার সুযোগ নাই বলে সমাজের যেকোন সদস্যের অনুরূপ বা কিঞ্চিত বৈষম্যপূর্ণ আচরণ-অনৈতিক ও ক্ষতিকর কর্ম হিসাবে যেমন গণ্য তেমন ব্যক্তিমালিকানা পুন:স্থাপনের প্রচেষ্টা বা মানুষকে শোষণের অপচেষ্টা করা বা তদ্রুপ প্রয়াশ ক্ষতিকর কার্য বলেই স্বীকৃত।

ফলে- কিঞ্চিত তারতম্য সমেত দাসতান্ত্রিক-সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজের সাধারণ নীতিবোধ-মুল্যবোধ, নাগরিকের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিশু-বৃদ্ধের প্রতি দৃষ্টিভংগি ও সাধারণ নীতিবোধ ইত্যাদি প্রায় সমার্থক হলেও শিশু-বৃদ্ধ ও অক্ষম মানুষজনের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের অনুরূপ দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সমেত সাধারণ নীতিবোধ সম্বলিত পুঁজিবাদী মুল্যবোধ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয় বা অনুরূপ মুল্যবোধ ধারণ ও লালন-পালনের অবকাশ নাই বিধায় নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে মৌলিকভাবে বৈপরীত্যের দুই সমাজ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি

সন্দেহাতীতভাবে পরস্পর বিরোধী ধরনের বলেই অপরাধ ও দন্ড ইত্যাদি বিষয়ে পুঁজিবাদী জুরিস্প্রুডেন্সের সংজ্ঞা বা তদ্বিষয়ে প্রতিকার বা ব্যবস্থা ইত্যাদি কোনক্রমেই সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা ভুক্ত বা স্বীকৃত ও অনুমোদিত হতে পারে না।

সেজন্যই, অপরাধ, আসামী-ফরিয়াদি, বাদী-বিবাদী, আর্জি, মঞ্জুর,খারিজ, জামিন, শপথ, রায়-আদেশ, ডিক্রি, সাজা বা দন্ড, জরিমানা, কারাগার, কারা বিধি, দন্ড মওকুফ, বিচার ও বিচারপতি এবং কোর্ট ইত্যাদি রূপ শব্দ সমূহ সমাজতান্ত্রিক নীতিমালায় যুক্তিসংগত কারণেই স্থান পাওয়ার সুযোগ নাই। তবে, সমাজতন্ত্রের শুরুতেই শ্রেণী বৈরীতা অবসান হওয়া সম্ভব নয় বিধায় নানান ধরনের অনিয়ম, বিশৃংখলা ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর কর্ম সংঘটিত হওয়া অস্বাভাকি নয় হেতু সৃষ্ট বিরোধ ও বৈরীতা নিরসনে ও নিস্পত্তিকরণে সাময়িক ভাবে- সমাজের মিমাংসা শাখা, মিমাংসা সহযোগী, মিমাংসা অফিস, পক্ষ-বিপক্ষ, তর্কিত বিষয়, ক্ষতিকর কর্ম, অবহিতকরণ পত্র, মিমাংসা পত্র , ঘোষণা, পরামর্শ ইত্যাদি রূপ বিকল্পশব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

দাস ও সামন্ততন্ত্রের অনুগমনে গারদ-জেল বা নির্বাসন দন্ডের মাধ্যমে দন্ডিতদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা-যোগ্যতা ও সামাজিক গুণাবলীর সদ্ব্যবহার করার সুযোগ নষ্ট ও অপচয় করছে বুর্জোয়া জুরিস্প্রুডেন্স ও রাষ্ট্রও । আবার দন্ডভোগী কয়েদীদের ভরণ-পোষণ সহ দন্ডাদেশকারী ও দন্ড কার্যকরী বিভাগের কর্মী সহ এতদমর্মে সকল ধরণের ব্যয় নির্বাহার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করে থাকে শ্রমিকশ্রেণী। নীতিগত কারণেই সমাজতন্ত্রীদের অনুরূপ অসভ্যতা ও বোকামি করা সাজে না। বরং-সমাজতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ ক্ষতিকর কর্ম হতে বিরত করা এবং অনুরূপ বিষয়ে পুরানো বদাভ্যাস পরিত্যাগ ও সংশোধনের জন্য শনাক্তকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য,বয়স ও মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তদ্বারা সংঘটিত সামাজিক ক্ষতির পরিমান অনুপাতে বিভিন্ন মেয়াদে তাঁর নিজস্ব দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উপযুক্ত কোন সামাজিক কর্মে দায়িত্ব পালন করার মতো বিহীতাদির মাধ্যমে অতিরিক্ত সমাজিক মূল্য সংযোজন করা যেমন সম্ভব তেমন কয়েদী হিসাবে সমাজের অন্যান্য সভ্যের শ্রমে উৎপাদিত সামগ্রী ভোগ-ব্যবহার করে একদা ক্ষতিকর কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিটিকে পরজীবী হিসাবে বেঁচে থাকতে হবে না হেতু সকলের শ্রমের ও যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম হবে সমাজ। কয়েদখানার প্রয়োজন নাই বলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে জেলখানা কেন্দ্রীক ব্যয়-অপচয় তিরোহিত হবে বিধায় সমাজিক সুযোগ বর্ধিত হওয়ার সুযোগ চক্রাকারে প্রসারিত হবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খুব বেশী সংখ্যক মিমাংসাকর্মী যেমন প্রয়োজন হবে না তেমন বিচারকের সহযোগী আইনজীবী নামীয় পরজীবী বা বিচারিক আদেশ পালনে দন্ডিতকে আটক বা গ্রেফতারের হেতুবাদে পুলিশ সদস্যের প্রয়োজন হবে না।

ভারতের প্রথম ১০কোটি রুপির মালিক মুর্শিদাবাদের ব্যাংকার জগৎশেঠ ও অন্যান্য ব্যবসাদাররা নিজস্ব পুঁজিসহ পুঁজিবাদের প্রসার-বিকাশে প্রতিবন্ধক দিল্লীর বাদশাহীতন্ত্র ও বাদশার গভর্ণর অর্থাৎ বংগীয় নবাবীতন্ত্রকে উৎখাতে সহযোগী শক্তির সন্ধান পেয়েই পারস্পারিক স্বার্থে উপনিবেশিক ব্রিটিশ বেনিয়া, শুরুতে ১২৫ জন শেয়ারহোল্ডারের মোট ৭২,০০০ পাউন্ড পুঁজির স্বত্বাধিকারী 'সুতা-বস্ত্র, লবন-চা,নীল ও

আফিম' ব্যবসায়ী ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত যোগসাজসীভাবে প্রথমে বংগে ও পরবর্তীতে কোম্পানি কর্তৃক ভারত দখল ও কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ফলে-ব্রিটিশ পুঁজির তাপে-উত্তাপে বা সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় ও সহযোগে এবং তাবে বা নিয়ন্ত্রণে পরিপুষ্ট ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ঠিক পুঁজির চরিত্রমতোই স্বীয় পুঁজির সঞ্চালন সুযোগ নিশ্চিতকরণের সুবিধা ও প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী বিরোধে জড়িয়ে পড়ে একদা অভিভাবক বৃটিশ পুঁজিপতিশ্রেণীর সাথেই। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে পরিবর্তিত বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ-সুবিধায় ভারত বিভক্তি সমেত তথাকথিত স্বাধীনতার অনুমোদন পায় ভারত-পাকিস্তান। কিন্ত, স্বাধীনতার বলি স্বরূপ প্রধানত পাঞ্জাব ও বংগে এবং আংশিকভাবে দিল্লীতে সংঘটিত হয় ভয়ানক রকমের হত্যা-খুন, লুন্ঠন ইত্যকার জঘন্য-নারকীয় বর্বরতার শিকার হয় অসংখ্য নিরীহ মানুষ।

এসব নারকীয় হত্যাযজ্ঞের আশু উপলক্ষ্য -ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত "দ্বিজাতি তত্ত্ব" বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তান অটুট থাকত রূপ কষ্ট কল্পিত ধারণাপুষ্ট ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার যুক্তিযুক্ত রূপ ফতোয়ার অন্ধানুগমনে শ্রেণীস্বার্থান্ধতায় সংকীর্ণবোধ প্রসূত এবং কৃষিজীবীদের 'ব্রিটিশ-জমিদার' বিরোধী আন্দোলনের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার ও ভুলে গিয়ে তথাকথিত "প্রজাস্বার্থ" রক্ষক ব্রিটিশ বন্দনায় আপ্লুত অধ্যাপক কবীর চৌধুরীসহ ঢাকার একদল বুদ্ধিজীবী ও সরকারী গবেষক যাঁদের কেউ কেউ লেনিনবাদী সমাজতন্ত্রী বা পুঁজিবাদ বিরোধী তাঁদের কর্তৃক প্রণীত নভেম্বর-১৯৮১ সালে ঢাকা হতে প্রকাশিত "বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার কুমিল্লা", পাতা -৩৬, এ যে ভাবে কেবলমাত্র "পশ্চিম পাকিস্তানী স্বার্থান্বেষী নেতাদের ষড়যন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের কবলে" পড়ে "পকিস্তান সৃষ্টির কার্যকর শক্তি ", " দ্বিজাতি তত্ত্বের যে-আদর্শ " তা "বাস্তবায়িত হতে পারেনি" হেতু স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল রূপ বক্তব্য -বিবরণ দ্বারা, "সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি" সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-১০, বাংলাদেশের সংবিধান হতে সামরিক ক্ষমতাবলে বিলোপকারী স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের সমর্থনে ও সরকারী ভাষ্যে ইতিহাস রচনা করেছেন।

যদিচ, দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং এর প্রবক্তা অথচ তা প্রতিষ্ঠায় কেবল অনীহাই নয় বরং পাকিস্তানের জন্মলংগ্নেই পাকিস্তানকে হিন্দু-মুসলিম সকল জাতির রাষ্ট্র ঘোষণার মাধ্যমে কার্যত পাকিস্তানী মুসলিম জনগণের সহিত প্রতারণাকারী বিশ্বাসঘাতক এবং পিতা-পুত্রীর বৈবাহিক বিষয়ে দ্বিচারিতার হেতুবাদে ব্যক্তিজীবনেও নীতিভ্রষ্ট পিতাকে বিশ্বাস করে নাই বলে পাকিস্তানের " জনক" মোহাম্মদ আলী জিন্নার একমাত্র কন্যা ডায়না স্বপুত্রক পাকিস্তানে নয়, থেকেছে বটে ভারতের গুজরাটে। কিন্তু- জন্মসূত্রে শিয়া ও রাজনীতি সূত্রে পাকিস্তানী সুন্নিদের অভিভাবক হলেও শিক্ষা-দীক্ষায় ও মদ্যপানে চ্যাম্পিয়ন ইংরেজ সাহেব বনা ধর্ম ব্যবসায়ী জিন্নার প্রতি বিশ্বাস অটুট রেখেছেন ধর্ম নিরপেক্ষতার দাবীদার অধ্যাপক চৌধুরীরা। অত:পর, চৌধুরীদের রচিত সরকারী ইতিহাস দ্বারা তত্ত্ব ও তথ্য যেমন বিকৃত হয়েছে তেমন প্রকৃত পক্ষে তা মোটেই ইতিহাস সম্মত ইতিহাস নয়।

বরং এবং কার্যত, টাটা-বিড়লা ও গোয়েংকাদের সাথে প্রতিযোগিতায় অক্ষম আদমজী-বাওয়ানী প্রমুখ পুঁজিপতি ধর্মের জিকির তুলে পাকিস্তান সৃষ্টি করলেও পুঁজির জন্মসূত্র

অধিকতর পুঁজির সঞ্চয়ন-বিকাশ সাধনে সঞ্চালন ও কেন্দ্রীভবনে একদিকে যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি করে ও মজুরি দাসত্বের প্রসার ঘটায় অন্যদিকে নিত্যই পুঁজিপতিশ্রেণী আন্ত :বিরোধে লিপ্ত হয় বিধায় পাকিস্তানী পুঁজিপতি শ্রেণী ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বৃটিশ রানীর শাসনাধীনে থাকলেও কেবলমাত্র সামরিক শক্তি বলে শ্রমজীবী মানুষকে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে দমন-পীড়ন করে অধিকতর হারে শ্রম শোষণের পন্থাকেই উৎকৃষ্ট গণ্য করায় ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে জারী হয় সামরিক শাসন। পাকিস্তানের পুর্ব অংশের মুসলিম জমিদার যারা মুলত ১৯০৬ সালে ইংরেজের সমর্থনে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের জমিদারী ১৯৫০ সালে ক্ষতিপুরণের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করে।

ফলে- একদা জমিদারপুত্রগণ প্রচুর নগদ অর্থ পেয়ে শহরবাসী হয়ে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের কারবার বা অনুরুপ কারবারের ব্রোকার তথা ইন্ডেটিং বিজনেসে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে।

আবার - দেশভাগের কারণে ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দু জনসাধারণের সম্পত্তি দখল করে নেয় মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সুবিধাভোগীরা। পাকিস্তান সরকার উভয় প্রকার পরজীবী গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতায় " শত্রু সম্পত্তি আইন" করা সহ শিল্প ও বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে রপ্তানীকারকদেরকে বিশাল মাত্রায় আর্থিক সুবিধা প্রদানে বোনাস ভাউছার ইত্যকার নানান স্কীম চালু করে। ফলে-পূর্ব পাকিস্তানের নব্য ধনীকশ্রেণী রাষ্ট্রীয় নানান সুযোগ-সুবিধায় একদিকে যেমন বিত্তবৈভবের মালিক হয় অন্যদিকে তাদের সন্তানরাও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।

কিন্তু, পাকিস্তানী ২২ পরিবার খ্যাত পুঁজিপতিশ্রেণীর নিরঙ্কুশ আধিপত্যের নিকট আবেদন-নিবেদন করেও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হয় উঠতি বাংগালী বুর্জোয়াশ্রেণী। এমনকি সরকারী চাকুরীতেও সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে সুযোগ না পাওয়া বা অনুরুপ সুযোগ না পাওয়ার আশংকায় পূর্ব পাকিস্তানের ধনীকশ্রেণীর সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরোধ-বৈরীতা দিনে দিনে তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে। উল্লেখিত বাংগালী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে পাকিস্তান মুসলিম লীগ হতে বেরিয়ে আসা আওয়ামী লীগ শ্রমিক-কৃষক সহ শ্রমজীবী জনগণের নিত্যকার শোষণ-যন্ত্রণা ও দু:খ-দুর্দশাকে পুঁজি করে মুলত উঠতি ধনীক শ্রেণীর সুবিধা হাসিলে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে। ভারত ভেংগে পাকিস্তান বানালে বাংগালী মুসলমান কৃষক-মজুরের সকল দু:খের চিরাবসানের আশ্বাসে মুসলিম লীগে ভোট দিয়ে পাকিস্তান বানানো দরিদ্র জনগোষ্ঠী ভয়ানক রকমে আশা হত হয়ে এবার আওয়ামী লীগের " জয় বাংলা" শ্লোগানে সামিল হয়ে পশ্চিমা পুঁজিপতিদের শাসন-শোষণ হতে মুক্তির স্বপ্ন দেখতে লাগল। অনুরুপ অবস্থার পরিণতি বিষয়ে শংকিত পাকিস্তানী বুর্জোয়াশ্রেণী পরোক্ষ সেনা শাসনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সেনা শাসনের দ্বারস্ত হয় এবং পাকিস্তানে ১৯৬৯ সালে আবারো সামরিক আইন জারী হয়।

পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ৩০ মার্চ,১৯৭০ সালে জারীকৃত পাকিস্তানের জন্য একটি সাময়িক সংবিধান প্রণয়নার্থে এল.এফ.ও অর্থাৎ লিগ্যাল

ফ্রেম ওয়ার্ডার-পি.ও. নং-২, ১৯৭০ এর অনুচ্ছেদ-২,৪,১২,১৪,২০,২১,২২ এর সম্মিলিত পাঠের নির্গলিতার্থ হচ্ছে- ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের স্বাধীনতা-জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখন্ডতা সংরক্ষণ ও নিশ্চয়তা বিধান কল্পে কোরান ও সুন্নাহ ভিত্তিক একটি সাময়িক সংবিধান প্রণয়নার্থে নির্বাচিত ৩০০ সহ ১৩ জন মনোনীত মহিলা সদস্য সমেত ৩১৩ জন প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচিত সংবিধান সভার অধিবেশন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আহুত হবে এবং ইসলামী নীতি-আদর্শ ভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে উল্লেখিত প্রণীতব্য সংবিধান দ্বারা কোরান-সুন্নাহার পরিপন্থী কোন আইন বা বিধান অনুমোদন করা যাবে না এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধান হইবেন একজন মুসলিম।

লেনিনবাদী তবে মাও চিন্তাধারার অনুগামী " কমিউনিষ্ট" পার্টির নেতা-কর্মী পরিবেষ্টিত ন্যাপ ভাসানী ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিগত অবস্থানের সহিত বৈরীতার যুক্তিতে উল্লেখিত এল.এফ.ও মেনে এবং তদনিমিত্তে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি। ফলে- পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় নাই। ভোটের ফলাফল-কাষ্টিং ভোট-৬৩%, মোট ৩০০ আসনের জাতীয় সংসদে-আওয়ামী লীগ-১৬০ এবং পিপলস পার্টি-৮১ টি আসন লাভ করে। ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ কোরান-সুন্নাহ ভিত্তিক পাকিস্তানের অখন্ডতা ও সংহতি রক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ট আসন লাভ করা সত্ত্বেও পাকিস্তানী বুর্জোয়া শ্রেণী বিশেষত ২২ পরিবার ভিত্তিক সিন্ডিকেট পীড়িত বাংগালী বুর্জোয়াদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানে সম্মত হওয়ার পরিবর্তে সেনা শক্তির জোরে নির্বাচনের রায় বানচালে লিপ্ত হয়।

লেনিনের কৌশলে যথারীতি প্রথমে সংসদ অধিবেশন আহবানে টাল-বাহানা এবং শেষত নির্ধারিত তারিখে সংসদ আহবান-অনুষ্ঠান না করে পুঁজির জন্মগত স্বভাবমতো চালাকি ও চাতুরীর কৌশলে আলাপ-আলোচনার ছুতায় ঐ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রয়োজনীয় সেনা শক্তির সমাবেশ ঘটায় । পাকিস্তানী সেনা শাসক -১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গভীর রাতে নিরস্ত্র বাংগালীদের উপর ইতিহাসের ভয়াবহতম বর্বর গণহত্যা সংঘটিত করে। ১৭ এপ্রিল-১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ- বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। কিন্তু, আক্রান্ত জনগণ পাকিস্তানী হার্মাদ বাহিনীকে প্রতিহত ও প্রতিরোধে স্বশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করতে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। তবে, আওয়ামী লীগে যেমন যুদ্ধাবস্থায়ও বহু পাকিস্তান পন্থী সাংসদ বা মন্ত্রীও কেউ কেউ ছিল তেমন পীড়িত বাংগালী বুর্জোয়া শ্রেণীর বহুজন শান্তির নামে বাংলাদেশের বিপক্ষে অর্থাৎ পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনীর স্বপক্ষে শান্তি কমিটি সহ নানান কমিটি গঠন করে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্যে দেড় কোটির মতো মানুষ ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেও দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে শিক্ষা-দীক্ষা সহ নানান সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত অনেকেই দ্বিজাতি তত্ত্বের মহত্ব ভুলতে পারেনি বলে সাধের দ্বিজাতির তত্ত্বের পাকিস্তান ভেংগে যাওয়ার দু:খ-কষ্ট ভুলতে না পারা অধ্যাপক কবীর চৌধুরীদের মতো বহু বুদ্ধিজীবী খোদ রাজধানী ঢাকায় দিনাতিপাত করেছিল।

তন্মধ্যে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে এদের কয়েকজনকে পাকিস্তানীদের দোষর রাজাকার-আল বদর বাহিনী হত্যা করে। সুযোগ-সন্ধানী উঠতি বাংগালী বুর্জোয়াশ্রেণী সুযোগ পাওয়ামাত্রই পাকিস্তানের আদর্শ তথা কোরান-সুন্নাহর নামে যে রাজনীতি করেছিল সেই ধর্মীয় রাজনীতি যেমন বাংলাদেশ সামরিক ক্ষমতাবলে পুরোদমে চালু করেছে তেমন লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষ যারা কোন প্রকার লোভ-প্রলোভন বা পেশাগত সুযোগ-সুবিধা নয় কেবলই হানাদার মুক্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠায় জীবন দিয়েছে বা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করেছে সেই সকল শ্রমজীবী মানুষের ত্যাগ-

তিতীক্ষাকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য অতীব কৌশলে ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় ভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যা দিবস পালন-উদযাপনের সমধিক বিহীতাদি করলেও শ্রমজীবী মানুষের মধ্য হতে যারা জীবন দিয়েছিল তাদের স্মরণে একটি দিবস পালন-উদযাপন করে না। যদিচ, "মুক্তিযুদ্ধে" অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শ্রমজীবীরাই ছিল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ট।

তছাড়া-১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালনের যে রীতি বাংলাদেশে চালু আছে ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ দ্বারা তা কি যথাযথভাবে নিশ্চিত হয় ? বিশেষত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মুলে যেহেতু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তান " একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে, " সেহেতু অন্যায় যুদ্ধকারী পাকিস্তানের পরাজয় ও বাংলাদেশের বিজয় নিশ্চিত করণার্থে প্রচলিত প্রথা ও রীতি-নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হওয়াই বিধান । কিন্তু অনুরূপ চুক্তি না হয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ও ভারতের দুই কমান্ডারের স্বাক্ষরে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। উল্লেখিত চুক্তিপত্রের প্রথম প্যারায় বর্ণিত আছে- " The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all pakistan Armed Forces in BANGLADESH to Lieutenant General JAGAJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Cheif of the Indian and BANGLADESH Forces in the Eastern Theatre."
এবং ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম উক্ত চুক্তিপত্রের ২য় প্যারায় চুক্তিপত্রের অর্থ, ব্যাখ্যা বা আত্মসমর্পনের শর্ত বিষয়ে জেনারেল ওরোরার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং ৩য় প্যারায় জেনেভা কনভেনশন মতো পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের নিরাপত্তা প্রদানে জেনারেল ওরোরার নিশ্চয়তা প্রদানের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে।

অত:পর, পরাজিত পাকিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব স্বীকার ও অন্যায় যুদ্ধের জন্য দায়-দায়িত্ব কবুল ও তদার্থে দন্ড প্রদান এবং যুদ্ধবন্দীরা বিজয়ী বাংলাদেশের হেফাজতে থাকা ও তাদের নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশের দায়-দায়িত্ব বিষয়ে আদৌ কোন বক্তব্য বিবৃত ও স্বীকৃত হলো কি ? বাংলাদেশতো ভারতের অংগ রাষ্ট্র নয় যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে " অন্যায় যুদ্ধকারী" পরাজিত পাকিস্তানীরা ভারতের সেনাপতির হেফাজতে বর্ণিত চুক্তিপত্র মতো থাকবে। এমনকি, উক্ত চুক্তিপত্রে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রও কি স্বীকৃত ও বিবৃত হয়েছে ? অথবা, বাংলাদেশ যে বিজয়ী পক্ষ তাও কি বর্ণিত হয়েছে? অথবা, বাংলাদেশ সরকারের কোন প্রতিনিধি কি উক্ত চুক্তিপত্রে সহি-স্বাক্ষর করেছে? অথবা, যুদ্ধটি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, না কি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে তাও কি বর্ণিত হয়েছে ? পুঁজিরই প্রতিযোগিতা ও বৈরীতায় পাকিস্তানের শত্রু ভারত মিত্র হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষ নিয়েছে বলে ভারতের জেনারেল ওরোরা কি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ বাহিনীর অধিনায়কত্ব লাভ করতে পারে? সেনা অধিনায়কত্ব ভারতের, আর স্বাধীন-সার্বভৌম হচ্ছে বাংলাদেশ তাও কি যুক্তিসংগত? আত্ম সমর্পন বিষয়ে ব্যাখ্যা বা শর্তাবলী বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে ভারতের জেনারেল, আর বিজয়ী হলো বাংলাদেশ? উক্ত চুক্তি- ভারতীয় পুঁজির নিকট আত্ম সমর্পন না কি দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রতি মোহগ্রস্ততা তা নিশ্চিত করতে পারতেন যারা তাঁরা এখন আর বেঁচে নাই। তবে, দু'টিরই আধিপত্য বাংলাদেশে আছে বলেই আমদানী বাণিজ্যে ২০০৮ সালেও ভারত যেমন বাংলাদেশের ২ নম্বর পার্টনার তেমন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম এখন " ইসলাম।"

তবে,পশ্চিমবংগ, আসাম ও ত্রিপুরার সহ অন্যান্য অঞ্চলের বাংগালীদের জন্ম ও 'জনকের' পরিচয় নিশ্চিত না করে কেবলই বাংলাদেশের বাংগালীদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবীদারকেই অন্তত সংখ্যাগতভাবে ভুল বা ব্যাকরণগতভাবে ভ্রান্ত এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তি হওয়া সত্ত্বেও কেবলই দলীয় আধিপত্য নিশ্চিতিতে দল বিশেষ কর্তৃক ঘোষিত কথিত জাতির 'জনক', বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁর নিজ জীবনের সাধ পূর্ণ হওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও যদি স্বয়ং সন্তুষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন তবে উল্লেখিত জনক তথা বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান হতে দেশে ফিরে –১১ জানুয়ারী, ১৯৭২ সালে জারীকৃত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ – "যেহেতু উক্ত ঘোষণায় উল্লিখিত অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ যুদ্ধ এখন শেষ হয়েছে; " না লিখে– এমনকি, শেখ মুজিবের উক্ত আদেশ বা ঘোষণামুলে ১১ জানুয়ারী,১৯৭২সালে যুদ্ধ শেষ হওয়া নয় বরং ১৬ ডিসেম্বর,১৯৭১ সালের ঢাকা চুক্তি মুলে 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ যুদ্ধকারীদের পরাজয় নিশ্চিত করে স্বাধীন বাংলাদেশ বিজয় লাভ করেছে' রূপ বাক্য বা বক্তব্য লিখতে পারতেন।

অত:পর, জয়–পরাজয় ও বিজয় এবং স্বাধীনতা ও পরাধীনতা বা যুদ্ধ সমাপ্তি বিষয়ে সম্পাদিত কয়েকটি ঐতিহাসিক চুক্তি নজির হিসাবে উল্লেখ করা হলো:–
(ক) নেদারল্যান্ড ও স্পেনের ১৬৪৮ সালের চুক্তি:– স্পেন সাম্রাজ্যের অধীনতা হতে স্বাধীনতা লাভে নেদারল্যান্ড ১৫৬৮ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধ শুরুর দীর্ঘ ৮০ বছর পর উক্ত চুক্তি মুলে স্পেন নেদারল্যান্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করা সহ যুদ্ধের সমাপ্তি ও পরস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কবুল করে।

(খ) ১৭৮৩ সালের প্যারিস চুক্তি:– ইংলন্ডের কলোনী যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ রাজা কর্তৃক সামরিকভাবে আক্রান্ত হয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করে। শত্রুর শত্রু মিত্র এই ফর্মুলায় ইংলন্ডের জাত শত্রু স্পেন ও ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ নেয়। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ১৭৮৩ সালের উক্ত প্যারিস চুক্তিমতো যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র স্পেন–ফ্রান্স যুক্তরাজ্যের সাথে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি সম্পাদন করে যুদ্ধের ক্ষয়–ক্ষতি পূরণে যুক্তরাজ্যকে বাধ্য করেছিল।

(গ) আমেরিকান ইন্ডিয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রের ১৭৭৮ সালের চুক্তি: – ইউরোপীয়েরা জবর–দখল করেছিল আমেরিকা। কিন্তু খোদ ইউরোপীয় আমেরিকানরা যখন ইংলন্ড হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যুদ্ধ শুরু করে তখন যুক্তরাষ্ট্রের দেলওয়ারী ষ্টেটের নেটিভ আমেরিকানরা কলোনীয়াল বৃটিশকে পরাভূত ও বিতাড়িত করা সহজ বিবেচনায় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে কলোনীয়াল ইউরোপীয় যারা জর্জ ওয়াশিংটনের কমান্ডশীপে ও স্বাধীনতার ঘোষণা মুলে যুদ্ধ করছে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে সেই " স্বাধীনতাপন্থী" যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু, উন্নত যুদ্ধাস্ত্র, উন্নত প্রশিক্ষণ ও আধুনিক সামরিক কৌশলে অভিজ্ঞ এবং অধিকতর সংখ্যক সেনা সম্বলিত জর্জ বাহিনীর নিকট পরাজিত হয় আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা। অর্থাৎ স্বাধীনতাপন্থী জর্জদের নিকট নতুন করে পরাজিত ও পরাধীন হল ন্যাটিভ আমেরিকানরা নিজ ভুমিতেই। তদমর্মেই সম্পাদিত হয়েছিল উক্ত চুক্তি।

(ঘ) ১৭৬৩ সালের প্যারিস চুক্তি:- যুক্তরাজ্য ও পূর্তগীজের নেতৃত্বাধীন জোটের সাথে ফ্রান্স ও স্পেনের জোটের সপ্তবর্ষী যুদ্ধে আরো বহু দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। বিজয় লাভ করেছিল যুক্তরাজ্য-পূর্তগীজ জোট। যুদ্ধের সমাপ্তি ও যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ ও প্রদানে ফ্রান্স-স্পেনকে যুক্তরাজ্যের সহিত উল্লেখিত চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছিল। এ চুক্তিতে অংশীদার ছিল যুদ্ধকারী সকল পক্ষ। বিবরণও ছিল বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট।

(ঙ) ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তি:-উক্ত চুক্তির মাধ্যমে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয় । ৪৪০ অনুচ্ছেদের দীর্ঘ এ চুক্তিতে বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের শর্তে স্বাক্ষর করেছিল পরাজিত জার্মানী। যুদ্ধাপরাধী ও যুদ্ধাপরাধের বিচার এবং পরাজিত জার্মানীর দন্ড ইত্যকার যাবতীয় বিষয়াদি সমেত লীগ অব নেশন্স প্রতিষ্ঠা ইত্যকার বৈশ্বিক বিষয়াদি উক্ত চুক্তিপত্রে পরিস্কারভাবে বিবৃত ছিল।

(চ)১৯৪৫ সালের বার্লিন চুক্তি:-উক্ত চুক্তিমূলে ২য় বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। বিজয়ী যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত পরাজিত জার্মানীর উক্ত চুক্তিপত্র দ্বারা জার্মানীর উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা সহ কোন দেশ কত পরিমান ক্ষয়-ক্ষতি জার্মানীর নিকট হতে পাবে তাও সুবিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়।পক্ষভুক্ত অন্যান্যরাও চুক্তিটি অনুমোদন করে।
/
(ছ)তাসখন্ড ডিক্লারেশন:-১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ উক্ত ঘোষণা মূলে সমাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু, "বিজয়ী বাংলাদেশ" স্বাক্ষরকারী নয় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালের ঢাকার চুক্তিপত্রে। কাজেই ঢাকা চুক্তি-যুদ্ধ ও যুদ্ধের সমাপ্তি বা যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ে বর্ণিত চুক্তিসমূহসহ আরো অসংখ্য চুক্তি বিষয়ে অজ্ঞতা না কি দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রীতি সমেত ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর নিকট কার্যত পুঁজিবাদের নিকট অধীনতা, পরাধীনতা ও গোলামী মানসিকতা জাত দাসত্ব অথবা, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ঘোষণা বা "মুক্তিযুদ্ধে" অংশগ্রহণকারী নিহত-আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা?

অথচ, উপরোক্ত নজির মোতাবেক যদি বাংলাদেশ সরকার " অন্যায় যুদ্ধের" যাবতীয় দায় ও ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ে অন্যায়কারী পাকিস্তানকে উপযুক্ত দায় বহনে যেমন বাধ্য করতে সক্ষম হতো তেমন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধকারী সকলের বিচার ও যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা লাভ করতো । তবেইতো বাংলাদেশ সত্যি সত্যি বিজয়ী হিসাবে পাকাপোক্ত দলিল মূলে স্বীকৃত ও বিবেচিত হতে পারতো।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র,১০ এপ্রিল-১৯৭১, এ প্রদত্ত "সাম্য ও মানবিক মর্যাদা"র অংগীকারে অর্থাৎ 'অন্যায্য-অসাম্য ও অমর্যাদার' পাকিস্তানী পুঁজিকেন্দ্রীক ব্যবস্থার অবসানে "মুক্তিযুদ্ধ" সংঘটিত হয়েছে বলেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ও সাম্যবাদের লক্ষ্যে তথাকথিত সমাজতন্ত্রের বর্ণিত অনুচ্ছেদ সংযোজনে যেমন বাধ্য হয়েছিল অত্র সংবিধান প্রণেতাগণ তেমন ১৬ ডিসেম্বর,১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী -খুনি ও বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের নির্দেশদাতা অর্থাৎ ১৯৭১ সালের যুদ্ধের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তদাতা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহীতা বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত

গ্রহীতাগণের সহযোগি বা তদমর্মে নির্বাহীগণ ব্যতীত স্বাধীন বাংলাদেশে আর কারো বিচার বা দন্ড বিধানের অবকাশ ও সুযোগ ঐতিহাসিক কারণেই ছিল না। বা স্বাধীন দেশের উপযুক্ত মানুষ হিসাবে দায়িত্ব পালনে শ্রমজীবী সকল মানুষ সমানুপাতিক সুযোগ লাভ ও প্রত্যেকে তেমন সুযোগ পাওয়াটা মানবিক মর্যাদার অংগীকারের সহিত সাযুজ্যপূর্ণ বলে অতিতে যারা দন্ডিত হয়েছিল তাদের দন্ড রদ-রহিত ও বাতিল বা মওকুফ হওয়া ও করাটা, স্বাধীনতার বোধে আবশ্যিক,অপরিহার্য ও অনিবার্য ছিল ।

অথবা অতীতের বিচারাধীন মামলা সমুহ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নিস্পত্তি বা সমাপ্ত হয়েছিল বলে ঐ সকল মামলা সচল থাকার অবকাশ ছিল না। এমনকি পুর্বতন শ্রেণীবিরোধার্থক ব্যবস্থা হতে উদ্ভুত বৈরীতা নিরসনে সৃষ্ট প্রাচীন ধারণার জুরিস্প্রুডেন্স বা তদানুরূপ দন্ড বা তদার্থে সৃষ্ট বিচার বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বা জজ -জাষ্ট্রিস ইত্যাদি নব্য "স্বাধীন" ও "শোষণমুক্ত" বাংলাদেশে পুন:স্থাপন বা পুন: প্রতিষ্ঠার সুযোগ ছিল না। অথবা পুর্বতন মালিকানা সম্পর্কের অবসান কল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠাকরণে "জাতীয়করণ" সম্পর্কিত ঘোষণার মাধ্যমে সৃষ্ট রাষ্ট্রায়ত্তখাতের আধিক্য ও কর্তৃত্ব সুরক্ষায়- সমবায় ও ব্যক্তি মালিকানাকে ২য় ও ৩য় শ্রেণীভুক্ত মালিকানা গণ্যে আইনি সীমায় সীমিতকরণ ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া গঠিত রাষ্ট্রায়ত্তখাত অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে বলে অনুরূপ নীতি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রায়ত্তখাত সৃষ্টি বা জাতীয়করণ সম্পর্কিত পুর্বাপর প্রণীত সকল আইন সমূহ হেফাজতকরণে মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ-৪৭ দ্বারা উক্তরূপ রাষ্ট্রিক মালিকানার জাতীয় সম্পত্তিকে প্রত্যেকের মৌলিক অধিকারভুক্ত গণ্যে উক্তরূপ সম্পত্তি সংরক্ষণ বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান কল্পে অনুরূপ আইন হতে উদ্ভুত নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিচারের অযোগ্য মর্মে অনুচ্ছেদ-১০২ (৩) দ্বারা এতদ্বিষয়াদিকে হাইকোর্টের এখতিয়ারমুক্ত করা হয়েছে এবং ইতোপুর্বে প্রণীত জাতীয়করণ বিষয়ক আইন সমূহ সাংবিধানিক আইন হিসাবে অত্র সংবিধানের " প্রথম তফসিল" ভুক্ত হয়েছে বিধায় উক্ত জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি কেন্দ্রীক ইত:পুর্বেকার বিরোধ-বৈরীতা ইত্যাদির স্বাভাবিক মৃত্যু বা নিস্পত্তি হয়েছে হেতু দেশের মোট শিল্পের ৯০% জাতীয়করণকৃত শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যক্তিমালিকানাজাত বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার যেমন সুযোগ নাই তেমন অনুচ্ছেদ-৮ হতে অনুচ্ছেদ ২৫ পর্যন্ত নীতিমালা প্রয়োগ করা হলে যুক্তিসংগত ও স্বাভাবিক কারণেই জনগণের মধ্যেকার মিমাংসাযোগ্য বিরোধ-বৈরীতা ইত্যাদি মিমাংসার জন্য "আদালত" খুব গুরুত্বপুর্ণ রাষ্ট্রিক শাখা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

কিন্তু, বিচার বিভাগ সহ উপরোক্ত বিষয়ে গণতান্ত্রিকতো নয়ই এমনকি স্বাধীন রাষ্ট্রের উপযোগী বিহীতাদি যে সম্পাদিত হয়নি তাতো ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়েছে। সম্ভবত 'বাঘ-শিয়াল ও শকুন' এই জন্তুত্রয়ীর সম্মিলিত চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের রাজা-বাদশা বনার খোয়াব ও দ্রুত সম্পত্তিবান হওয়ার খায়েশে গণসম্পদ লুন্ঠনে তর সইছিল না বলে রাজকীয় ঐতিহ্যসহ রাজকীয় ব্যবস্থার অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের সোনাতনী মুল্যবোধ ও মধ্য যুগীয় জবরদস্তির রীতি-নীতি ও প্রথা এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ১৭৭৭ সালের চার্টার অনুযায়ী কলকাতায় স্থাপিত সুপ্রিম কোর্ট সহ পরবর্তী

কালে ব্রিটিশ রাজের বানানো বিবিধ আইন সহ রাজকীয় বিচার বিভাগ এবং জবরদখলকারী পাকিস্তানের অগণতন্ত্রী সংবিধান ও সেনাতন্ত্রের হুকমতে চালিত ও অধীনস্থ বিচার বিভাগের ধারাবাহিকতা রক্ষাসহ ভারতীয় সংবিধানের অনুগমনে বাংলাদেশের সংবিধানে ষষ্ঠভাগে- "বিচার বিভাগ" বহাল ও ক্ষমতা-এখতিয়ার ইত্যাদি অনুচ্ছেদ ৯৪ হতে ১১৬ পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ -৯৫(৩) দ্বারা অনুরূপ বহাল করণ জায়েজ করা হয়েছে।

সম্ভবত, রাজকীয় মোহাচ্ছন্নতায় ও বিলাসীতায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি তথা পুলিশ -সেনাবাহিনী ও কর্ম বিভাগের সদস্যগণকে রাজাজ্ঞা মান্যে বাধ্যকরণে বা নির্বাহী বিভাগের বশংবদ বাহিনী ও সদস্য বানাতে, সংসদ কর্তৃক ভিন্নরূপ আইন প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল অধিকার অস্বীকৃতকরণ বিষয়ক অনুচ্ছেদ ১১৭ দ্বারা সুপ্রিমকোর্টের এখতিয়ার যেমন সীমিত করা হয়েছে তেমন কেবলমাত্র পেশাজনিত কারণে বর্ণিত কর্মীগণ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭,৩১ ও ৩২ মূলে প্রাপ্য সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে । তাছাড়া-বিশেষ ট্রাইবুনাল আদেশ-১৯৭২ অর্থাৎ পি.ও. ৫০ এবং পি.ও. ৮ অত্র সংবিধানের প্রথম তফসিল ভুক্ত অনুচ্ছেদ -৪৭ গণ্যে কার্যকারতা বহাল রাখায় অনুরূপ আইন মৌলিক অধিকার হিসাবে নির্ণিত হয়েছে হেতু মৌলিক অধিকার, অনুচ্ছেদ-২৬ সহ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ গুরুত্বহীন ও অকার্যকর গণ্য হয়েছে। যদিচ, বুর্জোয়া গণতন্ত্রী সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদে -ধর্ম জাযকগণের ফতোয়া দান ও বিচারিক অধিকার বিলোপ করা সহ কেউ যাতে সাংবিধানিক বিচার হতে বঞ্চিত না হয় সেজন্য কোন প্রকার এক্সট্রাঅর্ডিনারী কোর্ট স্থাপন করা যাবে না মর্মে নিশ্চিত করা হয়েছে। তদপুরি, সাধারণভাবে পাকিস্তান আমলের বিচারাধীন মামলাসহ বিচারক বা বিচারপতি সমেত সুপ্রিমকোর্টের আদি এখতিয়ার ও নিম্ন আদালতের ধারাবাহিকতা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ (১৫০ অনুচ্ছেদ) এ ধারা ৬ এর (১) হতে (৭) দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

মতাদর্শ বা মূল্যবোধের মৌলিক পরিবর্তন নয়, কেবল মাত্র কালিক বিবর্তনে আইন-বিধান পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক মর্মে মনু সংহিতায় বিধৃত এই :-" প্রত্যেক যুগের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট অনুযায়ী আইন প্রণীত হবে এবং কলি যুগের আইন অতীতের আইন অপেক্ষ ভিন্ন।" রূপ বক্তব্যও বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ মূর্খামি বা স্বার্থান্ধতা হেতু আমলে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই বহু বছরের গণশোষক-নিপীড়ক ও শাসকদের প্রতিষ্ঠিত বিচার ব্যবস্থাবলীর সম্মিলিত সমষ্টি বা ককটেল বিশেষ বাংলাদেশে বহাল করার মাধ্যমে অত্র সংবিধানে ১ম, ২য় এবং ৩য় ভাগে বিবৃত গণমালিকানাধীন রাষ্ট্রীক ক্ষমতা-কাঠামো, সমষ্ঠিগত ও সম্মিলিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সম্পদের সুষম বন্টন ও গ্রাম-শহরের ফারাক বিলোপকরণসহ প্রত্যেকের সমসুযোগ-সমানাধিকার নিশ্চিতকরণে বৈষম্য-বৈরীতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বিরোধ অবসান ইত্যকার বিষয়াদি প্রকৃতই এবং কার্যত অস্বীকার ও গুরুত্বহীন করা হয়েছে মর্মে বাতাসে উড়ে যাওয়া 'তাল পাতার ছাউনী ও গোলপাতার বেড়া' দ্বারা তৈরীকৃত বহুতলভবনের বেহাল দশার মতো দৈন্যদশা বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক সাংগঠনিক পর্যায়ে বারে বারে সৃষ্টি হওয়ায় গণতন্ত্রতো নয়ই অত্র সংবিধান মূলে নিদেনপক্ষে একটি কার্যকর রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়নি। অথবা পরস্পর বৈরীতাদোষে দুষ্ট

অত্র সংবিধানের প্রথম হতে তৃতীয় ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদগুচ্ছ যেমন যথার্থভাবেই কেবলমাত্র পরস্পরের অসমঞ্জস্যতা ও সাংঘর্ষিকতায় কার্যকর হওয়ার সুযোগ নাই বলেই অত্র সংবিধানের প্রথম ৩ টি ভাগে বর্ণিত সুনীতি সমূহের সহিত সাযুজ্যপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিচার বিভাগ গঠিত হয়নি বিধায় জন্মগত বিভ্রাট ও দোষ-ত্রুটিজনিত সীমাবদ্ধতা না থাকলে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে যথোপযুক্ত ভুমিকা নিশ্চিত করতে সক্ষম হলে স্থগিত অযোগ্য সংবিধান স্থগিতপূর্বক সেনা স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না এবং সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা সংবিধানের বিরোধী বা আইন প্রণয়ন বিষয়ে রাষ্ট্রীক ক্ষমতা বিষয়ক অনুচ্ছেদ-২৬ এর " না" বিরোধী আইন প্রণীত-বহাল হওয়া সহ অনুরূপ অচল-বাতিলযোগ্য আইন-বিধি বাংলাদেশে সচল ও বলবত থাকতো না ।

ট) সি.ই.সি সহ কমিশনারগণের অযোগ্যতা বর্ণিত হলেও তাদের যোগ্যতা বিবৃত না করে কেবলমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভোটার লিষ্ট প্রণয়ন, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ এবং সংবিধান ও আইন দ্বারা নির্ধারিত অপরাপর দায়িত্ব পালনকারী "নির্বাচন কমিশন", "সপ্তমভাগ- নির্বাচন" শিরোনামে অনুচ্ছেদ-১১৮ হতে ১২৬ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতারণা-জালিয়াতি, বুথ দখল-সন্ত্রাস ও কারছুপি-দুর্নীতি না করলে এবং নির্বাচন কমিশন অনিয়ম ইত্যাদি না করে বিধিবদ্ধভাবে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করলে মোটামোটিভাবে অবাধ-সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব নয়। অথচ, প্রধান ধারার রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কুকর্ম আড়াল করার জন্য ইত:মধ্যে "অসাংবিধানিক" তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করা সহ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে দায়ী করাসহ তদানুরূপ দায়িত্ব প্রদান করে থাকে। আবার রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণ বা তদসম্পর্কিত বিধি-বিধান তৈরী করা কমিশনের কর্ম না হলেও অনুরূপ কর্মের জন্য ঢাক-ডোল পিটানো নির্বাচন কমিশন প্রায়ই রাজনৈতিক বিষয় সহ বিভিন্ন বিষয়ে ল'ফুলি আন ল'ফুল কথা-বার্তা বলে থাকে। অনুরূপ কার্যাদির কারণে ইসি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে বিরোধে জড়িয়ে কখনো কখনো স্বদলবলে বা কখনো ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা কেউ কেউ পদত্যাগ করেছেন বা গণক্ষোভে বাড়ি-ঘর পুড়েছে কারো কারো। 'স্বাধীনতার' পর হতে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের প্রতিটি নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে যেমন কালোটাকার বহ্নি উৎসব, জবর-দখল ও কারছুপির পারস্পারিক দোষারোপের বিশ্রি-নোংরা গেইম দেশবাসি লক্ষ্য করেছে তেমন, খোদ কমিশনের বিরুদ্ধে নির্বাহী বিভাগের প্রধান কর্তৃত্বের আজ্ঞাবহতাসহ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। আমেরিকা-কানাডা বা সুইটজারল্যান্ডেও নির্বাচন হয়ে থাকে , কিন্তু ঐ সকল দেশের সংবিধানে এমন বাহুল্যরূপ বা মাতুব্বর ধরণের বা ব্যয়বহুল নির্বাচন কমিশন বর্ণিত হয়নি । অত:পর, ভারতীয় সংবিধানের অনুকরণে 'লাইক কিং মেকার' ধরনের 'হামবড়া' নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশের সংবিধানে-
অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে গণতন্ত্রতো নয়ই এক্ষেত্রেও বুর্জোয়া আমেরিকার নিকটবর্তী হওয়া যায়নি।

ঠ) চীন-ভিয়েতনাম,কিউবা,স্পেন সহ উপরোক্ত প্যারায় বর্ণিত রাষ্ট্র সমূহের সংবিধানে বর্ণিত হয়নি অথচ, বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম ও ৯বম ভাগে- "মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক " এবং " কর্ম বিভাগ" ও "সরকারী কর্ম কমিশন" সংযুক্ত করা হয়েছে।

সম্ভবত, নির্বাহী বিভাগের প্রধান ব্যক্তি বা ক্ষমতাধর অপরাপর ব্যক্তিগণের পছন্দমতো সরকারী কর্মী বাছাই ও নিয়োগ বা অনুরূপ ক্ষেত্রে দলীয় আধিপত্য বজায় এবং রাজা বা রাজ আমত্য রূপ কর্তাব্যক্তিগণের অনিয়ম ও দুর্নীতিকে আড়াল বা সরকারী সিল মোহরে আইন সিদ্ধ করার নিমিত্তে উল্লেখিত পদ-পদবীতে অনুগত-বশংবদ ব্যক্তি বিশেষকে নিয়োগ দানের মাধ্যমে স্থায়ী ব্যবস্থা পাকা পোক্তকরণের প্রয়াশ না হলে ব্যক্তি বিশেষের নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাডারের নাম যুক্ত হওয়া সহ হাল আমলেও সরকারী কর্ম কমিশনের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হতো না। এমনকি লজ্জা-শরমের বালাই না রেখে ডেপুটি কালেক্টর/কমিশনার পদবীর ব্যক্তিবর্গ "জেলা প্রশাসক" সেজে অত্র সংবিধানের -৭,২১,২৬ অনুচ্ছেদগুলোকে উপহাস করছে। তাছাড়া-অত্র সংবিধানে ঘোষিত নীতিমালা মতে- রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় বিভাগ ও দফতর সমুহ বিলীন ও বিলুপ্তকরণের লক্ষ্যে সরকারী কর্ম ও পেশা যেমন গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গণ্য হওয়ার অবকাশ নাই, তেমন অতীতের এ সকল রাষ্ট্রিক বিভাগ-দফতর সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশে পুন:প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ নাই।

আরো উল্লেখ্য- কর ও রাজস্ব আদায় এবং সাম্রাটের হুকুম-নির্দেশ বা আইন বাস্তবায়নে চীনের কিউইন ডাইনেষ্টি (খ্রীষ্ট পুর্ব-২২১-২০৭) ইম্পেরিয়াল ব্যুরোক্রেসি পত্তন করেছিল। জন্মাধিকারে রাজকীয় ব্যুরোক্রেসীতে নিযুক্তির "নাইন র‍্যাংক সিষ্টেমের" পরিবর্তে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে বুরোক্রাসির সদস্য নিয়োগদানের সিষ্টেম চালু করেছিল চীনের সুই ডাইনেষ্টি (খ্রীষ্টাব্দ-৫৮১-৬১৮) । ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন ও ভারতীয় জনগণকে শোষণ-লুণ্ঠনসহ কর-খাজনা আদায়ে "অনারেবল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সিভিল সার্ভিস" (এইছ.ই.আই.সি.এস) পত্তন করেছিল । কোম্পানির ব্যুরোক্রেটিক সিষ্টেম ১৮৫৪ সালে ইউরোপে এবং ১৮৮৩ সালে আমেরিকায় বিস্তৃতিলাভ করেছিল। "ইম্পেরিয়াল সিভিল সার্ভিস অব ইন্ডিয়া" (আই.সি.এস.আই) চালু হয়েছিল ১৮৮৬ সালে। পরবর্তীতে এটি পরিণত হয় "সিভিল সার্ভিস অব ইন্ডিয়া"-য়(আই.সি .এস) । ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ পরবর্তীতে আই.সি. এস বিভক্ত হয়ে "সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান" (সি. এস.পি) হিসাবে পাকিস্তানের ব্যুরোক্রেসি গঠিত হয়।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় যারা "গড সেভ দ্যা ক্যুইন", "জাতীয় সংগীত" গেয়ে রানীর ভৃত্য বা দাস হিসাবে শিক্ষা বা চাকুরী জীবন শুরু করেছিল তারাই অর্থাৎ বেনিয়া-বর্বর ব্রিটিশের গোলাম-সেবক গয়রহ পাকিস্তানী বর্বর শাসক-শোষক গোষ্ঠীর খাজনা-কর আদায়সহ বাজেট বাস্তবায়ন এবং শোষকদের হুকুম-নির্দেশ অমান্যকরণে দন্ডবিধান বা জনগণকে দমন-পীড়নে সৃষ্ট সামরিক-বেসামরিক আইন কার্যকরণে পাকিস্তানী শোষক গোষ্ঠীর অনুসংঘ বা অপরিহার্য গোত্র হিসাবে এবং কর্তার ইচ্ছায় কর্মসাধনে " ইয়েস স্যার" রূপ গোলামী অভ্যাসের জন্মদোষ সমেত সি.এস.পি ভুক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মোতাবেক অসাম্য-অমর্যাদা ও অনাচারের পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের গোলাম যারা-অন্যায্য ও অযৌক্তিকভাবে ধরত্রীর অন্যভূমিকে অশুদ্ধ ও ঘৃণ্য জ্ঞানে "পাক সার জমিন" রূপ পাকিস্তানি জাতিয় সংগীত দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেছিল ঐসকল গোলাম বা অনুরূপ গোলামী মানসিকতার ব্যক্তিগণকে নিয়ে "সাম্য-মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক

সুবিচার সুনিশ্চিতকরণে" সৃষ্ট বাংলাদেশের "কর্ম বিভাগ" গঠিত হওয়ার সুযোগ-অবকাশ নাই বা অনুরূপ গোলামকুল যেমন স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্মী হওয়ার যোগ্য মর্মে গণ্য হতে পারে না তেমন লুণ্ঠন ও গণশোষণে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্ট , ব্রিটিশ রাজের প্রতিপালিত এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ও আজন্ম ঘুষ -দুর্নীতিতে অভ্যস্ত -দক্ষ ও আকণ্ঠ নিমজ্জিত বা দুর্নীতি ও এতদ্বিষয়ে লন্ডনে সাজা প্রাপ্ত আফিমখোর ও সেল্ফ কিলার লর্ড রবার্ট ক্লাইবের যোগ্য উত্তরসূরি পাকিস্তানের গণবিরোধী ব্যুরোক্রেসির কেবলমাত্র নাম পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস"(বি.সি.এস) নামের ব্যুরোক্রেসি বাংলাদেশে প্রতিস্থাপন করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অংগীকারের বরখেলাফ।

তবু,উপরোল্লেখিত অনুচ্ছেদ সমূহ দ্বারা ব্রিটিশ-পাকিস্তানের সৃষ্ট বৈষম্য-বৈরীতার রাষ্ট্রিক "কর্ম বিভাগ" বা ব্যুরোক্রেসি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া-কানাডার মতো ফ্রান্সেও সরকারী ও পাবলিক করপোরেশনে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসাবে গণ্য হলেও ব্রিটিশে একমাত্র রাজকীয় কর্মী ব্যতীত সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত বা চিকিৎসক-শিক্ষক গণ সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসাবে গণ্য নয়। সম্ভবত ব্রিটিশের গোলাম থাকায় ও গোলামি মানসিকতায় এবং আপাত পরিস্থিতির চাপে পড়া পুঁজিবাদী চক্র ব্যক্তিখাতের আবশ্যকতায় রাষ্ট্রায়ত্তখাত বা পাবলিক করপোরেশনকে আখেরে ধ্বংস করার নীল-নকাশার অংশ হিসাবে পরজীবীতার " কর্ম বিভাগ" সম্পর্কিত উপরোক্ত অনুচ্ছেদ দ্বারা পাবলিক করপোরেশন ভুক্ত কর্মীদের গণ্য না করে এমনকি পুঁজিবাদী ফ্রান্সের আদলেও নয়, নেহাতই সাবেক প্রভু ব্রিটিশের অনুকরণে ব্রিটিশ ক্রাউনের কর্মীরূপ সিভিল সাভিস বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অত:পর, কোম্পানীর আমলাতন্ত্র বহাল রাখার দরুন মন্ত্রীমন্ডলীর সরকারী দফতর "সচিবালয়" হিসাবে এখনো সচিবদের ক্ষমতা-কর্তৃত্বের প্রমাণ নিশ্চিত করছে বলে "গণতান্ত্রিক " বাংলাদেশ নয়, এমনকি স্বাধীন বা কার্যকর বাংলাদেশ রাষ্ট্রও প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। পরাধীন আমলের আইন-কানুন এবং বিচার ও কর্ম বিভাগ দ্বারাই যদি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত ও পরিচালিত হতে হয় তবে আর স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে তফাত কোথায় বা পরাধীনতাকে পরাজিত করে স্বাধীনতার যুদ্ধইবা করতে হবে কেন?

তৎসত্ত্বেও, দেশে দেশে লেনিনবাদী ও প্রথাগত বুর্জোয়ারা জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার নামে অনুরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই-যুদ্ধ করে থাকে। কিন্তু, প্রকৃতই এক বৈশ্বিক পুঁজিবাদের বৈশ্বিক কর্তৃত্বে বিশেষত আই.এম.এফীয় জামানায় যে কোন স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র পত্তন করা সম্ভব নয়-তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ও নজির বটে বাংলাদেশ। আরো উল্লেখ্য-স্বাধীনতা পন্থী বুর্জোয়া বা লেনিনবাদীরা যাহাই বলুন না কেন-সমাজতন্ত্র বৈ পুঁজিবাদ কি পুঁজিবাদবাদ বিরোধী কোন ব্যবস্থা বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে? কাজেই, মার্কসরা যে সূত্রায়ন করেছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারই সত্যতা আবারো নিশ্চিত হল। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ পুঁজিবাদ এবং অন্তিম দশায় উপনীত রাষ্ট্র তাদের ক্ষতিকরতা বৈ উপকারীতার অবকাশ রাখেনি, তাই পুঁজিবাদ প্রতিস্থাপনে সমাজতন্ত্রই-যা প্রতিষ্ঠা করবে শ্রমিকশ্রেণী তাহাই উপযুক্ত ব্যবস্থা। অত:পর, সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা বা তদ্রুপ ক্রিয়াদি কেবল ভুয়াই নয়, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা এবং ঠগবাজিও বটে।

ড) মেডিকেল সাইন্সে, শরীরে তাপের পরিবর্তন বিষয়ক "ল'জ অব থারমোডাইনামিক্স" অবশ্যই মান্য করা আবশ্যক বটে লিভিং অর্গানিজম অর্থাৎ জীবন্ত সত্ত্বার , অন্যথায় বিপর্যয়-মৃত্যু অনিবার্য, এটি যেমন সান্টিফিক ল' তেমন, সমাজতন্ত্রের সাফল্য নিশ্চিতকরণে বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নীতিমালা বা তদানুরূপ বিধি অপরিহার্য বটে নচেৎ বিপর্যয় ও বিনাশ নিশ্চিত। সমাজতন্ত্র যে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা নয় একথাই মার্কসরা বহুভাবে বহুবার বলেছেন। তবু, মার্কসবাদের নামে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য ও পরিচিত সোভিয়েট ইউনিয়ন, রুমানিয়া-পূর্ব জার্মানী, আলবেনিয়া-বুলগেরিয়া, পোলান্ড -যোগোস্লাভিয়া , চীন-ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া- কিউবা ইত্যাদি রাষ্ট্র সমূহ কার্যত সমাজতন্ত্র নয় বরং রাষ্ট্র বলেই সমাজতান্ত্রিক নীতিমালাতো নয়ই এমনকি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী জুরুস্প্রুডেন্স উদ্ভাবন-সৃজন-সম্পাদন বা তদানুরূপ উদ্যোগ-আয়োজন করেছিল মর্মে নজির খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব বহাল ও বজায় রেখে শ্রেণীসূত্রে বা শ্রেণী বিভাজন ও শ্রেণী বৈরীতা হতে উদ্ভুত বিরোধ নিস্পন্নকরণ সম্ভব নয় বিধায় অনুরূপ নিস্পন্নের অযোগ্য বিরোধ বা সমাধানের অতীত সমস্যা কেবলমাত্র শ্রেণী বিলোপ- বিনাশের মাধ্যমে নিস্পন্ন করা সম্ভব হেতু সামন্তবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বা শ্রেণীস্বার্থ হতে সৃষ্ট অথচ সমাধান অযোগ্য বিরোধ-সমস্যা, অধিপতি শ্রেণীর অনুকুলে মিমাংসাকরণে বা অধিপতি শ্রেণীর মধ্যকার আন্ত:বিরোধ নিস্পত্তিতে সৃষ্ট অর্থাৎ অতিতের শ্রেণী বৈরীতার স্বার্থে তথা অধিপতিশ্রেণীর অনুকুলে প্রণীত আইন শ্রেণীহীনতার লক্ষ্যে গঠিত "সমাজতান্ত্রিক" সমাজে হেফাজতকরণের সুযোগ-অবকাশ নাই। সুতরাং- ইন্ডো-গ্রীক দখলদারিত্বসহ বৈদিক যুগের ভারত বা পূর্বাপর মোগল-ইংরেজ সহ বিভিন্ন দখলদারের কর্তৃত্বাধীন পরাধীন ভারত ও শেষত ১৬ ডিসেম্বর,১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানে গোত্রপতি,সামন্ত অধিপতি-রাজা ও সম্রাট এবং বেনিয়া শোষক ও স্বৈরাচারী শাসকদের স্বার্থে ও কর্তৃত্বে প্রণীত এবং অতীতের শাসককুল কর্তৃক গণনিপীড়নে ব্যবহৃত বা বাংলাদেশের সম্পদ লুন্ঠন-অপহরণে সৃজিত বা শ্রমজীবী মানুষকে শোষণের অসৎউদ্দেশ্যে চালুকৃত বা " অন্যায় যুদ্ধ"-কারী পাকিস্তানীদের অন্যায়যুদ্ধ প্রতিহতকরণে বা তৎপ্রতিরোধে বা তদ্রুপ যদ্ধাবস্থা হতে মুক্তি পেতে সংঘটিত 'মুক্তিযুদ্ধকে' পরাজিত ও পরাস্তকরণে জারীকৃত বা অনুরূপ হীন উদ্দেশ্যজাত,আদেশ-নির্দেশ, রাজকীয় নিদান, সম্রাটের বিধান বা ইংরেজের সংবিধান-আইন এবং অনুরূপ হেতুবাদে প্রণীত বিধি-বিধান ইত্যাদি একের শেষ, অন্যটির শুরু অর্থাৎ পরাধীনতা ও স্বাধীনতা মধ্যকার অর্থগত-তত্ত্বগত ফারাক, পারস্পারিক বৈপিরিত্য বা বিরোধী সম্পর্কের মৌলিক ও সুস্পষ্ট তফাত ও পার্থক্যের কারণেই স্বাধীন বাংলাদেশে জারী-বহাল রাখার সুযোগ নাই বলেই অতীতের আইন-বিধি হেফাজত করা অবান্তর। সম্ভবত, অস্ত্রধারী মুক্তিযুদ্ধা ও জনগণের মধ্যে গড়ে উঠা সংহতির রূঢ় ও দৃঢ় অবস্থা ও অবস্থানসহ স্বাধীনতার প্রারম্ভিক পরিস্থিতিগত চাপ অগ্রাহ্যকরণে অক্ষম তবে ভীত - সন্ত্রস্ত কিন্তু , চালাক-চতুর বলেই সংবিধান প্রণেতাগণ অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৬ দ্বারা প্রচলিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল মর্মে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।

অথচ, অনুচ্ছেদ-১৪৯ দ্বারা পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদ দ্বয়কে কেবল অস্বীকার ও অকার্যকরই করা হয়নি বরং, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষ সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরতা অব্যাহত থাকিবে," মর্মে চিহ্নিত ও নির্ণিতকরণের মাধ্যমে "সাপেক্ষ" শর্তের বেড়াজালে ও কৌশলে এবং কার্যত সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরতা প্রদান করায় অত্র সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক প্রচলিত আইন চিহ্নিত ও নির্ণিতকরণের প্রয়োজনীয়তা বা অবকাশ প্রায় নি:শেষ করা হয়েছে বলেই এখনো স্বাধীন বাংলাদেশে ১৮৫৭ সালের "সিপাহী বিদ্রোহ" দমন-নির্মূলের পর ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ বিদ্রোহ দেখা দিতে না পারে বা আগাম দমন করা যায় সেজন্য ব্রিটিশরাজের প্রণীত ১৮৫৮ সালের দন্ডবিধিসহ ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমলের প্রায় সকল আইন-বিধি এমনকি নারী- পুরুষের অর্ধেক গণ্যে সম্পদেরও অর্ধেক মালিকানার- "উত্তরাধিকার" বিধি-বিধান বা নারী অবলা ও অরক্ষণীয় বলে সংরক্ষিত থাকতে হবে পুরুষের অধীন রূপ "অভিভাবকত্ব" আইন বা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে বিবাহ-তালাকে কার্যত স্বয়ংসম্পূর্ণ মতামতের অযোগ্য নারী-পুরুষ সকলে বটে, তবে কোন কোন পার্সোনাল ল'মূলে কাগজে পত্রে পুরুষ তালাক প্রদানে সক্ষম হলেও স্ত্রী একদম অযোগ্য আবার কোন কোন পার্সোনাল ল' য়ে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ও সুযোগহীনতায় কার্যত বিবাহের নামে নারীর চিরকালীন দাসত্বের পেশা গ্রহণসহ নানান আইন যেগুলো, "নারী-পুরুষের" বৈষম্যহীনতা মর্মে প্রত্যেকের মধ্যে সমতা স্থাপন সহ নাগরিকগণের সুষমসুযোগের সমান অধিকার বিষয়ক অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৯,২০, ২৭, ২৮,২৯, ৩১ ও ৩২ সহ অন্যান্য বহু অনুচ্ছেদ এর সহিত সাংঘর্ষিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বাতিলযোগ্য- বিবাহ, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার ইত্যাকার প্রচলিত পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আইন সমুহ এখনো বহাল তবিয়্যতে বিদ্যমান,বহাল- সচল ও বলবত হেতু সংবিধানের উল্লেখিত অনুচ্ছেদ সমুহ কেবলমাত্র কাগজী বয়ান হিসাবে আইনী কার্যকারিতাহীনতাসহ নিরর্থক ও সামঞ্জস্যহীনভাবে সংবিধানে স্থিত বা অবস্থান করছে ।

তদপুরি, ব্রিটিশ রাজের আইন ভংগে-অমান্যে সংঘটিত অপরাধের "সহযোগী"-র সংজ্ঞা সর্বাগ্রে নির্ধারণ পূর্বক সরকারী কার্যের অন্যান্য বিষয়ের "সংজ্ঞা" "অনুচ্ছেদ-৩।" দ্বারা নির্ণয় করত,জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট -১৮৬৮ ও ১৮৮৭ এর সংহত ও বর্ধিতকরণ এবং " রিপিলিং এন্ড এমেনডিং এ্যাক্ট- ১৯০৩ দ্বারা সংশোধিত জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট - ১৮৯৭ সালের "অনুচ্ছেদ-২৯। সেভিংস " দ্বারা ব্রিটিশরাজের তৎপূর্বেকার আইন যা কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে প্রণীত হয়েছে সেসকল আইনকে সেইভ বা সংরক্ষণ করা হয়েছে,এমনকি জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট-১৮৯৭এর সহিত সাংঘর্ষিক হলেও।

উল্লেখ্য-১৮৫৭ সালের " সিপাহী বিদ্রোহের" প্রেক্ষিতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমুদয় সম্পদ ব্রিটিশ ক্রাউনের সম্পত্তি গণ্যে রাষ্ট্রীয়করণ এবং কোম্পানির দেওয়ানী বিষয়ক কর্তৃত্ব বিনাশ ও কোম্পানী লিক্যুইডেশন এবং ভারতে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ রাজ কায়েমে প্রণীত "ইন্ডিয়ান গভার্ণমেন্ট এ্যাক্ট-১৮৫৮" জারী করা হয়েছিল বলে ব্রিটিশ রাজকে - ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্টে অনুরূপ সেভিংস ক্লজ সংযুক্ত করতে হয়েছিল তাদের পূর্বাপর শোষণ-লুন্ঠন ও বর্বরতা বজায়-বহাল ও বলবতকরণের নিমিত্তে।

কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত বা পূর্বেকার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী রাষ্ট্র তথা শোষণহীন ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবী ও অংগীকারে সৃষ্ট স্বাধীন এবং একদম নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশে- পূর্বেকার শোষক-প্রভুদের শোষণমূলক ও প্রভুত্ব রক্ষা ও সংরক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রণীত আইন বহাল রাখার আদৌ প্রয়োজন আছে কি ? অথবা যদি প্রভুদের প্রভুত্ব সংরক্ষায় বা শোষণ-আধিপত্য ধারাবাহিকভাবে অটুট ও অক্ষুন্ন রাখার নিমিত্তে প্রণীত আইন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গ্রহণ ও কার্যকর করে তবে বাংলাদেশ কি সদ্য স্বাধীন ও মানবিক মর্যাদার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসাবে নির্ণিত-চিহ্নিত ও গণ্য হতে পারে না কি সাবেক প্রভুদের প্রভুত্বের স্বার্থে সৃষ্ট শোষণমূলক-পীড়নমূলক রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতায় পত্তনকৃত কেবলই সাবেকী রাষ্ট্রের অনুরূপ রাষ্ট্র হিসাবে নিশ্চিত হয়? আসলে রাষ্ট্র মানেই শোষণে-পীড়নে প্রভুদের হাতিয়ার তাই প্রভুত্বহীন মানবিক মর্যাদা বা শোষণ মুক্তির নামে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা বা বিশ্বাসঘাতকতা করা বৈ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ বা অবকাশ নাই। ফলে- প্রকৃতই যাঁরা মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান বা মানুষ মানুষের প্রভু হওয়ার বা তদ্রুপ প্রভুত্বের সমাপ্তির মাধ্যমে শোষণহীন-মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে প্রত্যাশী তাঁরা কখনো রাষ্ট্রের বিলোপ-বিলুপ্তি বৈ স্বাধীনতা-মুক্তি বা মানবিক মর্যাদা ইত্যকার বিষয়াদি প্রতিষ্ঠার ছুতায় রাষ্ট্র গঠন-পত্তন বা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। উপরন্ত নিদেন পক্ষে নবীন ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীকারীরা নিশ্চয়ই সাবেকী রাষ্ট্রের ধারাহিকতার আইন-বিধান রক্ষা বা সংরক্ষা করতে পারেন না ।

অত:পর, কেবলমাত্র স্বাধীন বা নবীন রাষ্ট্রের দাবীতেও বাংলাদেশের সংবিধানে অনুরূপ সেভিংস বা সংরক্ষণমূলক অনুচ্ছেদ সংযোজিত হওয়ার কোন প্রকার অবকাশ না থাকলেও প্রণেতাগণ- শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত তথা পুঁজিবাদী হীন স্বার্থ হাসিলে মুর্শিদাবাদের ব্যাংকার জগৎশেঠসহ ব্রিটিশ রাজের চেলা বা অনুগত দাস বা প্রতারক-প্রবঞ্চক ও ভন্ড অথবা নিদেনপক্ষে নিরেট মুর্খ ও অজ্ঞ না হলে অনুরূপ সেভিংস ক্লজ রূপ অনুচ্ছেদ অত্র সংবিধানে সংযোজিত হতো না।

অথচ, অনুচ্ছেদ-১৫২। ব্যাখ্যা "(২) ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট-ক) সংসদের কোন আইনের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য , এই সংবিধানের ক্ষেত্রে সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে," অত্র সংবিধানে এখনো আছে। অত:পর, উল্লেখিত অনুচ্ছেদ-১৫২ দ্বারা অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭ ও ২৬ সহ সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রিক মূলনীতিমালাকে কেবল অস্বীকার ও অকার্যকর করা হয়নি বরং উল্লেখিত অনুচ্ছেদমূলে অত্র সংবিধান কার্যত কলোনিয়াল ব্রিটিশ কুইনের ভারতীয় সংবিধানের নকল-অনুকরণ কেবল নয় কার্যত ব্রিটিশ কলোনিয়াল রাষ্ট্রিক কাঠামোর ধারাবাহিকতা সমেত বহাল-কার্যকর করার মাধ্যমে গণ প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ নয়, অনুন্য একটি স্বাধীন বা নতুন রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত-নির্ণিত হওয়ার যোগ্য নয়।

ঢ)অন্য গোত্রের সদস্য কর্তৃক কেউ নিহত হলে স্বগোত্রীয়রা হত্যাকারী বা হত্যাকারীগণকে হত্যা করার জন্য একক বা সম্মিলিত ভাবে শপথ গ্রহণ করতেন। খ্রীষ্টের জন্মের ১২০০ বছর পূর্বে পারসিয়ান প্রপেট "জোরাষ্টার" প্রবর্তিত ধর্ম তথা "জোরাসট্রিয়ানিজম" গ্রহণকারীকে গড "মাজাদা " ও প্রপেট "জোরাষ্টারের" প্রতি

আস্থা-বিশ্বাস স্থাপনে "ফেইথ" অব আটিক্যাল মতে শপথ করতে হত। হিব্রু বাইবেল বা টানাকহ্ মতে খ্রীষ্ট পুর্ব অনুন্য ১০০০ সালে জেয়াস কর্তৃক প্রবর্তিত এক ঈশ্বরবাদী ধর্ম "জুডাইজম" এর ১৩ টি মুলনীতির প্রতি আস্থা-বিশ্বাস জ্ঞাপনে শপথ গ্রহণ পুর্বক ইহুদি ধর্মে দীক্ষা নিতে হয়। ব্রিটিশ রানীর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্থ রাখতে জেনারেল ক্লজেজ অব ইন্ডিয়ান এ্যাক্ট -১৮৯৭ এর ধারা-৩ (৩৯) "শপথ" সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

কিন্তু , আইডিয়েল রাজার কর্তব্য হিসাবে ভারতীয় পন্ডিত চানক্য শপথ নামার প্রয়োজন বোধ করেননি বলে তাঁর লিখিত অর্থশাস্ত্র বা চানক্যনীতিতে শপথ অনুচ্ছেদ লিখেননি বা তদীয় পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্র গুপ্ত শপথ গ্রহণ বা শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন বা রাজকীয় অভিষেক ইত্যাদি করেননি । এমন কি মোগল সম্রাট বাবরও শপথ পুর্বক সিংহাসন আরোহন করেননি। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৬৭ সালে বাতিল হওয়া ব্রিটেনের " দি প্রোফেইন ওথস এ্যাক্ট-১৭৪৫" অনুযায়ী ঈশ্বরের নামে নয় শুধুমাত্র ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করে শপথ নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে পুন:পুন নির্বাচিত হয়েও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পর পর তিন বার সংসদ সদস্য হিসাবে আসন লাভ করেননি মুক্তচিন্তার অধিকারী সেক্যিলার বা ইহলৌকিক অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাসী বা পরলৌকিকদের বক্তব্যমতো নাস্তিক "চার্লস ব্রডলাফ"।

তবে চতুর্থবারে নির্বাচিত হয়ে ঈশ্বর বর্জিত শপথ নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আসন গ্রহণ করে ইহলৌকিকতার বা স্যাকুলারিজমের সংসদীয় ইতিহাসে নজির স্থাপন করেছিলেন বলে নীতি নিষ্ঠ চার্লসকে বৃটেনের নয়া স্পীকার সংশোধিত " ওথস এ্যাক্ট ১৮৮৮" এর সংশোধনী কমিটির সদস্য মনোনীত করেছিলেন।

যদিচ, যাহা নাই তাহাতে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপনকারীকে " আস্তিক" বলা আর প্রকৃতই নাই বলে প্রকৃতি বা ট্রুথ তথা সত্যের প্রতি আস্থার কারণেই তদ্রুপ মত পোষণকারীকে আস্তিক বৈ "নাস্তিক" বলাটা যেমন পদার্থ-রসায়ন বিজ্ঞান বা মহাকাশ সহ প্রকৃতি বিজ্ঞানের বরখেলাফ ও অস্বীকৃতি তেমন ভাষা বিষয়ে পরজীবীদের দুরভিসন্ধিমূলক ঘৃণ্য তৎপরতার অংশ সমেত ব্যাকরণের হয় সীমাবদ্ধতা, না হয় ভ্রান্তি-বিচ্যুতি তবে শব্দ বিষয়ে অজ্ঞতা সমেত শব্দের ডেনোটেশন-কনোটেশন বা শব্দার্থের অস্বীকৃতি।

কিন্তু, "অজ্ঞেয়বাদী" তথা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্বে প্রণীত ও এখনো বহাল ভারতীয় সংবিধানে সাসংদ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সহ সংবিধানিক পদাধিকারীগণকে খোদ ইশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করার বিধান অনুচ্ছেদ-৬০,৬৯,৯৯, ১৫৯ সহ **তৃতীয় তফসিলে** লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতের পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বৈদ্যতিক মিডিয়ায় প্রকাশ্যে নিজেকে " নাস্তিক" ঘোষণা করতে গর্ববোধ করলেও রাজ্য বিধান সভার সদস্য ও মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রিক দায়িত্ব পালনে বার বার শপথ গ্রহণ করছেন খোদ ঈশ্বরের নামে বলে, নীতি-নৈতিকতার মানদন্ডে মি: চার্লস উত্তম ব্যক্তি নাকি পন্ডিত নেহেরু ও কমিউনিষ্ট বুদ্ধদেব বাবু ?

এথেন্সের ড্রাকো বা সোলনীয় সংবিধানে যেমন শপথ নামক অনুচ্ছেদ নাই তেমন সোভিয়েট ইউনিয়নের ১৯১৮ বা ১৯২৪ সালের সংবিধানে " শপথ"নামক ক্লজ ছিল না।

তাছাড়া- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২১ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে- " সংবিধান ও আইন মান্য করা" বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য বিধায় সংবিধান রক্ষণ,সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করা কেবলমাত্র কতিপয় সাংবিধানিক পদাধিকারীরূপ রাজ-রাজন্যের মৌরশি দায়িত্ব নয় বরং অনুরূপ দায়িত্ব পালন তথা অত্র সংবিধান সমর্থন-সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করা দেশের প্রত্যেকের সাংবিধানিক দায়িত্ব-কর্তব্য মর্মে সাংবিধানিক পদাধিকারীগণ উক্ত সাংবিধানিক কর্তব্য পালনে অব্যাহতি প্রাপ্ত নয় হেতু গোত্রীয় বিধান ও প্রথার অনুসরণে বা ধর্মীয় বিধানাবলীর বোধে বা ভারতের অনুগমনে - " সংবিধানের রক্ষণ,সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান" করার জন্য অত্র সংবিধানের **তৃতীয় তফসিলভুক্ত** শপথকারীগণ শপথমূলে দ্বিতীয় বার সংবিধানের অধীনস্ত হওয়ার মাধ্যমে কার্যত অনুচ্ছেদ-২১ মোতাবেক সাংবিধানিক কর্তব্য পালনে দায়মুক্ত বিশেষ অধিকার বা প্রাধিকারভুক্ত ব্যক্তি বলে গণ্য হয়েছেন বিধায় শপথ গ্রহণকারী ভি.আই.পি বা ভি.ভি.আই.পিগণ, দেশের আমজনতা হতে অধিকতর ক্ষমতাবান কর্তৃত্ব মর্মে জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের হুকুমের দাসানুদাস গণ্যে যথেচ্ছভাবে ক্রিয়া-কর্ম করাসহ হীন গোষ্ঠী বা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে জাতীয় সংসদকে ব্যবহার করে "গণতন্ত্র "বিরোধী আইন সমূহ বাতিল না করা বা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারকে অস্বীকার-অকার্যকরণের ২য় সহ নানান সংশোধনী ও তদানুরূপ আইন জারী এবং "পরিকল্পিত অর্থনীতি" বিরোধী-বিনাশী "বেসরকারীকরণ আইন-২০০০" বা "আইন কমিশন আইন-১৯৯৬" বা অনুরূপ আইন প্রণয়ন করাসহ বিশ্বব্যাংকের স্বার্থে-শর্তে "মুক্তবাজার অর্থনীতি" সহ নানান নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন হেতু অনুচ্ছেদ-২১ এবং তৃতীয় তফসিল, পরস্পরকে অস্বীকার ও অকার্যকর করছে মর্মে প্রকৃতার্থে ১৯৭২ সালের সংবিধান একটি অকার্যকর কাগজে পুস্তকে পরিণত হয়েছে ।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা, নীতি ও পরবর্তী অংশের পূর্বাপর অনুরূপ অসমঞ্জস্যতা,সাযুজ্যহীনতা ও সাংঘর্ষিকতার মতো সাংবিধানিক নৈরাজ্য, বিশৃংখলা ও অব্যবস্থার সুযোগ বা তদ্রুপ বিধি-ব্যবস্থার জন্যই পাকিস্তানের সংবিধান রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানে শপথকারী ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে স্বীয় শপথ শর্তে ১৬ ডিসেম্বর,১৯৭১, পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্থ থেকে পাকিস্তানের অপর বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান তথা নির্বাহী বিভাগ সহ পাকিস্তানের জল্লাদ বাহিনী ইত্যাদি যেমন "পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টকারী", "ইসলামের দুশমন ". "বিচ্ছন্নতাবাদী" "ভারতীয় অনুচর" এবং "দুস্কৃতিকারী" গণ্যে বাংলাদেশের "মুক্তিযোদ্ধাগণকে"হত্যা, এবং "মুক্তিযোদ্ধার" পরিবার ও পারিবারিকভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তি বা "মুক্তিযুদ্ধ" সমর্থকারী বা "মুক্তিযোদ্ধাদের" আশ্রয়দানকারী বা তদমর্মে সন্দেহভাজনগণের বাড়ী-ঘর ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচারে গণহত্যা,খুন-জখম, রাহাজানি করাসহ বাংলাদেশের জনগণের সম্পত্তি এবং সম্পত্তিবৎ নারীকে "গনিমাতে মাল" গণ্যে ভোগ-ব্যবহারের ফতোয়ায় লুণ্ঠন-অপরহণ,পাশবিক নির্যাতন করা সহ ইতিহাসের জঘন্য অপরাধ সংঘটন করার মাধ্যমে "ইসলামিক প্রজাতান্ত্রিক পাকিস্তানের অখন্ডতা ও সংহতি

রক্ষায়" আইনী দায়িত্ব পালন করেছিল ঠিক তেমনই পাকিস্তানের পক্ষে বিচারিক দায়িত্ব পালনের সুবাদে কার্যত পাকিস্তানের জল্লাদবাহিনীর সকল বর্বরতার দোষর ও সহযোগিতাকারী হিসাবে প্রকৃতার্থে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছেন বলেই ১৯৭১ সালে ঢাকা হাইকোর্টে দায়িত্ব পালনকারী বিচারপতিগণ কার্যতই পাকিস্তানী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানে না গিয়ে বা সেক্যিলার অর্থাৎ ইহলৌকিকতার বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে অপারগতা বা অক্ষমতা প্রকাশ না করে প্রকৃতার্থেই যেমন বিচারিক কার্যের অযোগ্যতা নিশ্চিত করেছেন তেমন নিজেদেরকেও অবিচারিক সাব্যস্ত করেছেন বিধায় উল্লেখিত বিচারকগণ কোনক্রমেই বিচারিকতো নয়ই এমনকি কোন ধরণের সাংবিধানিক পদের অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীন বাংলাদেশের হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে বহাল থেকে অনুরূপ অযোগ্য-অক্ষম ব্যক্তিগণ প্রকৃতার্থেই পাকিস্তানী হিসাবেই অনুতাপহীনভাবে ও দ্বিচারিতামূলে অত্র সংবিধান সংরক্ষণ,সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানের শপথ নিলেও ১৯৭৩ সালে প্রণীত অথচ, অনুচ্ছেদ-২৬ মতে সাংবিধানিক বাধ্যতামূলক "না" মান্যে বাতিলযোগ্য ১ম ও ২য় সংশোধনী বাতিল না করা বা ১৯৭৫ সালে অত্র সংবিধানকে সংরক্ষণ বা সংবিধানের নিরাপত্তা বিধান না করে বিপরীতে একদিকে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত করার চরম স্বৈরতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারিতার ৪র্থ সংশোধনীর প্রতি অুনসমর্থন অন্যদিকে অসাংবিধানিক সেনা শাসন ও সামরিক শাসককে অসাংবিধানিকভাবে সমর্থন-সহযোগিতা করা সহ বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী এবং সংবিধান ভংগ ও অস্বীকার এবং অকার্যকরী করার সেনাশাসনের কেবল সহযোগিতা ও সমর্থনই নয়, উপরন্ত সেনা কর্তৃত্ব বা তদানুরূপ নির্বাহী দায়িত্ব বিচারিক দায়িত্ব নয় বলে অনুরূপ অবিচারিক পদ গ্রহণ অর্থাৎ সেনা শাসকের দায়িত্ব পালন করে ঐ সময়কার বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি পুনরপি প্রমাণ করেছিলেন তিনি যতোই বাংলাদেশের সংবিধান রক্ষণ-সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধানের শপথ গ্রহণ করুন না কেন কার্যত তদানুনরূপ করতে নয় বরং তিনি অনুরূপ শপথ গ্রহণ করেছেন কেবলই ইহলৌকিক স্বার্থে অর্থাৎ অধ:পতিত বুর্জোয়া শ্রেণীর ততোধিক অধ:পতিত সদস্য হিসাবে ব্যক্তিগত হীন স্বার্থ হাসিলে বিধায় তিনি বা তাঁর মতো অপরাপর বিচারপতিগণ অনুরূপ শপথ গ্রহণ ও ভংগের দায়সহ তদমর্মে দ্বিচারী বলেই তাঁরা মুলত, পাকিস্তানী ধারাবাহিকতার স্বৈর ও সেনা শাসনপন্থী ও রক্ষক বলে মুজিবীয় সমাজতন্ত্রীতো নয়ই, নুন্যতম গণতন্ত্রীও নয়, এমনকি,সেক্যিলার বাংলাদেশ পন্থীও নয় হেতু সংবিধানে সংযোজিত উক্তরূপ শপথ কেবলই স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল মাত্র।

তাছাড়া- ইসলামী রিপাবলিক পাকিস্তানের বিচারপতিই যদি সেক্যিলার অর্থাৎ ইহলৌকিক বা গণতান্ত্রিক বা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিচারপতির দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পাদন করার যোগ্য ও সক্ষম হন তবে পরলৌকিকতা বা ধর্মবাদী পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরাধীনতা হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রয়োজন-আবশ্যকতা থাকে কি? ইসলামী পাকিস্তানের বিচার ব্যবস্থা ও বিচার বোধ বা বিচারিক বিধি- সমাজতন্ত্রেতো অবান্তর এমনকি ইহলৌকিকতার গণতন্ত্রেই সন্দেহাতীতভাবে অচল বা বৈরী হলে নিদেনপক্ষে বাংলাদেশ স্বাধীন বা নতুন রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হলে বাংলাদেশে পাকিস্তানী বিচারপতি সহ পাকিস্তানী বিচার বা বিচারিক বোধ-বিধি বহাল বা কার্যকর থাকার সুযোগ-অবকাশ নাই। তবু যদি বাংলাদেশে তা থাকে তবে স্বাধীনতা ও পরাধীনতায় কোন ধরণের তফাত

থাকে কি ? অথবা পরাধীনতার রাষ্ট্রিক বিচারিক নিয়ম-নীতি ও রীতি ইত্যাদি এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের বিচারিক নিয়ম-নীতি ও রীতি ইত্যাদি একই হতে পারে কি? অথবা যদি, পূর্বাপার একই বিচারপতি উভয়ক্ষেত্রেই "আইনানুগ ন্যায় বিচার" করতে যোগ্য হয় তবে ধর্মীয় আইন ও ইহলোকিক গণতান্ত্রিক আইন কি একই কাতারভুক্ত গণ্য হয় না? অথবা, বৈষয়িক স্বার্থ ভিন্ন প্রকৃতই ধর্মীয় আইন ও বিধি-বিধানের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য থাকতো তবে কি ইসলামী রিপাবলিক পাকিস্তানের বিচারপতি গয়রহ " সেক্যিলার" এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের বিচার বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারতেন ? স্বাধীনতা ও পরাধীনতা বা ধর্মীয় বিধান ও হইলৌকিকতার রীতি-নীতি, বা রাজকীয় আচার-আচরণ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, বা সামন্তীয় তথা দাসোচিত মুল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ, বা রাজকীয় প্রথা-ঐতিহ্য ও সাধারণতান্ত্রিক চাল-চলন, বা রাজার অংশ গণ্যে লর্ড ও প্রজাতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের জনসেবক , বা মানুষকে অমর্যাদাকরণের রাজকীয় বর্বর বিধি ও মানুষকে আইনী মর্যাদা প্রদানের গণতান্ত্রিক বিধান ইত্যকার বিষয়াদি কি এক ও অভিন্ন অথবা একই প্রকৃতি ও একই ধরণের?

যদি একই না হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন প্রকারের হয় বা একের পতন ও অপরের যাত্রা শুরু হয় বা সম্পূর্ণত ভিন্নার্থবোধক ও ভিন্ন অর্থ প্রকাশক হয় তবে বৈদিক ভারত বা মোগল ভারত বা বৃটিশ ভারত বা পাকিস্তানের বিচারিক বোধ-বিধি, রীতি-নীতি, প্রথা-ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, ধরন-ধারণ অতি অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হবে। অত:পর, পাকিস্তানী সংবিধান মুলে ন্যায় বিচারকারী বিচারক সাংবিধানিক স্যাকুলার বা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান মুলেই বাংলাদেশের ন্যায় বিচারকারী বিচারক হওয়ার যোগ্য নয়, উপযুক্ত নয়।

উপরন্ত, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সহয়তাকারী ও সহযোগী হিসাবে দন্ডযোগ্য অপরাধী এমনকি বাংলাদেশের নাগরিকত্বের উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে না। কাজেই, জন্মসুত্রেই প্রতারণা ও দুর্নীতির সেরা নীতি "রাজনীতি"-র সহোদর বিচার বিভাগ দুর্নীতি ও প্রতারণার দায়ে দায়ী হবে না তাতো হতে পারে না। এমনকি 'বিচার' শব্দটাই যে অবিচারিক বা বিচারপতি ও বিচারাধীন ব্যক্তি রূপ সম্পর্ক যে মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী সম্পর্ক তাও কি আজো তথাকথিত গণতন্ত্রী বা স্বাধীনতা পন্থী বা কথিত সমাজতন্ত্রীরা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন ?

প্রকৃতার্থে, বিচার ও বিচারপতি শব্দ যতদিন মানবজাতি পরিত্যাগ করতে পারবে না ততোদিন মানবজাতি মুলতই মর্যাদাবান 'মানুষ' হিসাবে গণ্য হতে পারবে না। কারণ-মানুষ কর্তৃক মানুষকে অধীন বা পরাধীন করার জন্যই দাসতন্ত্রে আইন-বিচার চালু হয়ে সামন্ততন্ত্রের ভূমি দাসত্বে ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মজুরি দাসত্বের কালেও আইন-বিচার বহাল তবিয়্যতে বহাল আছে। অত:পর, ব্যক্তি বা কর্তৃত্ব বিশেষের আনুগত্য-অধীনতা মান্যকরণে অর্থাৎ অনুরূপ অধীনতামূলক কর্তৃত্ব অস্বীকারকারীকে দন্ডপ্রদানের মাধ্যমে অপরাপর সকলকে দন্ডদানকারী কর্তৃত্ব বা ব্যক্তি বিশেষের হকুম তামিলকারী তথা মুক্তচিন্ত হীন বা মস্তিষ্কহীন কেবলই রক্তমাংসের মানবিক যন্ত্র বিশেষ রূপে কোনক্রমে জীবন ধারণে বাধ্য করার জন্যই যে, আইন-বিচার ও বিচার বিভাগের পত্তন ও বিদ্যমানতা, তা-জারী রেখে একদিকে কতিপয় ব্যক্তি যেমন প্রভু তুল্য আর অবশিষ্টরা দাসতুল্য হেতু

দাসত্বের জীবন মানবিক মর্যাদার নয় এবং অনুরূপ দাস-প্রভুর সম্পর্ক বহাল রেখে মানুষের স্বাধীনতা যেমন অর্জিত হতে পারে না তেমন মানুষের মুক্তি বা মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

অর্থাৎ মানব জাতির প্রত্যেক মানুষ যতক্ষণ না নিজেই নিজের সকল কাজের ও সামাজিক কার্যাদির সম্পর্কাদি নিজেই নির্দিষ্ট ও নির্ধারণ করতে না পারবে বা নিজের সহ 'অপরের ক্ষতি হতে পারে' এমন সকল ক্ষতিকর কর্ম হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে না পারবে ততোক্ষণ স্বীয় মানবিক মর্যাদা নির্ণয়করণ ও সংরক্ষণে তথা মানবিক মর্যাদা অর্জনে অপরাগ ব্যক্তি বিশেষসহ মানবজাতি স্বীয় মানবিক বোধ-বুদ্ধির বিকাশ সাধনে উপযুক্ত না হওয়ার কারণে অমর্যাদাকর ব্যক্তির দায় বহন করার জন্যই সমগ্র মানবজাতি মানবিক অমর্যাদার অভিশাপ হতে মুক্ত হতে পারে না হেতু মানবজাতির মানবিক মর্যাদা নিশ্চিতকল্পে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সকল ধরণের অধীনতামূলক কর্তৃত্ব ও কর্তৃপক্ষ সমেত তদানুরূপ সকল প্রথা-ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ইত্যকার বিষয়াদির বিলোপ সাধন। তবেই এবং একমাত্র তবেই মুক্ত মানব জাতি মানবিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে পারবে ।

অত:পর, পাকবাহিনীর সহায়ক পাকিস্তানী বিচারপতিগণ- ধর্ম বা আইনানুগ ন্যায় বিচারিক বোধ নয়, কেবলই পেশাগত স্বার্থান্ধতা ও বৈষয়িক-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা হাসিলের জন্যই কোন প্রকার অনুতাপহীনভাবে "স্বাধীন" বাংলাদেশের বিচারপতি হিসাবে মূলত প্রতারণামুলে শপথ নিয়েছেন। ফলে- পাকিস্তানী সংবিধান পুন:প্রবর্তনে অর্থাৎ পাকিস্তানী কায়দায় সেনাশাসনের মাধ্যমে সংবিধান স্থগিত করে সেনাশাসকের কর্তৃত্বে অত্র সংবিধানে পাকিস্তানী ভাবধারা অনুপ্রবেশের যাবতীয় দুস্কর্মে কেবল সহযোগীতা করা নয়, বরং সক্রিয়- সহায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন খোদ বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারাপতি স্বয়ং। কাজেই, অনুরূপ বিচারপতি বা বিচারকগণ তাঁদেরই আইনে শপথ ভংগের দায়ে দন্ডযোগ্য অপরাধী অর্থাৎ "পারজুয়ারী"।

অত:পর, অপরাপর শপথকারীগণ যদি " পারজুয়ারী" না হয়ে স্ব-স্ব পদের শপথ রক্ষা করতেন তবে, বাংলাদেশে অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৭,২৬ সহ অন্যান্য বহু অনুচ্ছেদের সহিত সাংঘর্ষিক বা বিরোধী "জরুরী আইন" সম্পর্কিত ২য় সংশোধনী বা বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪ বা অপরাপর বিশেষত- ৪র্থ,৫ম,৭ম ,৮ম ,১১তম, ১২তম ও ১৩ তম সংশোধনী ইত্যাদি জারী-বহাল ও বলবত থাকতো না বা আইন দ্বারা সীমিত ও ৩য়শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিমালিকানা অসীম-অনিয়ন্ত্রিত হওয়া ও দেশের প্রধান বা প্রায় একমাত্র খাত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করাসহ তদমূলে বৈদেশিক পুঁজি ওয়ালা-চাকুরীজীবীগণ বাংলাদেশে অবস্থান করে খবরদারী-নজরদারী করতে পারতো না বা পরিকল্পিত অর্থনীতি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ সমূহ এখনো অত্র সংবিধানে বহাল থাকা অবস্থায় দুর্নীতি-শোষণ ও লুণ্ঠনে চ্যাম্পিয়ন- রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বের মুক্তবাজার অর্থনীতি বাংলাদেশে চালু ও বলবত থাকতে পারতো না।

কিন্তু, বাস্তবতা হলো মুক্তবাজার অর্থনীতিই বাংলাদেশে কার্যকর আছে অর্থাৎ শপথকারীরা শপথের মর্যাদা রক্ষা করেনি । কারণ - শপথকারীরা পুঁজিবাদের সেবক এবং পুঁজির চরিত্রমতোই তাঁরা যেমন আইন করে আইন ভংগের জন্য তেমন শপথও করে শপথ না রাখার জন্যই বলেই তাঁরা নীতিগত ভাবে যেমন আন্তরিক ও সৎ দাবী করতে পারে না নিজ নিজ শপথের প্রতি তেমন তাঁরা স্বার্থান্ধ-ভন্ড ও সংকীর্ণ মানসিকতার বলেই পরলৌকিক নয়, কেবলই জাগতিক সুখ ভোগের হেতুবাদে নিজ নিজ পরজীবীতার পেশার গোলামী অটুট ও অক্ষুন্ন রাখতে গিয়ে হালের বিশ্ব শাসক দি ফান্ড অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের দাসানুদাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেদেরকে বিক্রি করাই শ্রেয়তর গণ্য করে।

অনুচ্ছেদ-৭ মতে বাংলাদেশের জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হলে সাংবিধানিক পদাধিকারীগণ নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য পালন-সম্পাদনে নির্দিষ্ট শর্তাদি দ্বারা নিযুক্ত ও নির্বাচিত এবং বিনিময়ে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণকারী বটে। অত:পর, জনগণের নিকট রাষ্ট্রিয় কোন বিষয় গোপন করা নয়, বরং সকল বিষয় স্ববিস্তারে,সঠিকভাবে ও যথাযথসময়ে অবহিত ও জ্ঞাত করবেন বা অনুরূপ বিষয়ে জবাবদিহী করতে বাধ্য বটে জনকরভোগী " গণসেবকগণ" ।

অথচ, সাংবিধানিক পদাধিকারীগণকে প্রজাতন্ত্রের মালিক গণ্যে রাষ্টিক বিষয়াদি কেবলমাত্র তাদের অধীন বা তাদের জ্ঞাত বিষয় হিসাবে অন্যদের নিকট রাষ্ট্রিক বিষয়াদি প্রকাশ না করার নিমিত্তে "(খ)" ফরমে "গোপনতার শপথ" উল্লেখিত তৃতীয় তফসিলে নির্ণিত ও চিহ্নিত হয়েছে। অত:পর, প্রজাতন্ত্রের মালিক কে? জনগণ না, উল্লেখিত সাংবিধানিক পদাধিকারীগণ? সংবিধানমুলে প্রজাতন্ত্রের স্বত্বাধিকারী জনগণের ভাল-মন্দ, জনগণ নিজেরা বুঝবেন না, জানবেন না , বুঝবেন ও জানবেন কেবল জনকরভোগী পদাধিকারিগণ ? জনগণ ও ৩য় তফসিলভুক্ত সাংবিধানিক কর্তৃত্বের মধ্যে পারস্পারিক অবিশ্বাস-সন্দেহ, বিরোধীতা-বৈরীতা এবং একাধিপত্যের কর্তৃত্বমূলক ও নৈরাজ্যজনক সম্পর্ক স্থাপনকারী উপরোক্ত "(ক) ও (খ)" ফরমের "শপথ " কার্যত শপথকারীগণকে সেবক নয় , জনগণের প্রভু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে বিধায় অনুরূপ গোপনীয়তার হেতুবাদে সৃষ্ট সামন্তবাদী রাজকীয় মনোবৃত্তি ও কর্তৃত্ব প্রসূত রাষ্ট্রকে স্বীয় দখলাধীন ও মালিকানাধীন সম্পত্তি গণ্যে অহমিকা-গোয়ার্তুমি, স্বজনপ্রীতি-দলবাজি, অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদিতে যুক্ত,জড়িত ও নিমগ্ন হওয়ার কারণে স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও কেবলমাত্র কতিপয় ব্যক্তি, কল্পনাতীতভাবে বা সাধারণ্যে অবিশ্বাস্য পরিমাণ বিত্ত-বৈভবের কথিত মালিক বনা এবং অত্র সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২০ এর নির্দেশনা অমান্য ও লংঘন করে উক্তরূপ "অনোপার্জিত" অর্থে নিজের মতোই অপরাপর মানুষকে ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য গণ্যে মানবিক মুক্তির বা মানবিক মর্যাদার মানুষ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিসহ জনসাধারণের স্বাধীনতার আকাংখা ও বোধ দুষণে,বিকৃত রুচি-সংস্কৃতি সহ পশু সুলব ভোগবাদী ঘৃণ্য জীবন যাপন করে এবং সম্পদ বা মূল্য সৃষ্টি এবং সম্পদের মালিকানা অর্জন বা দখল বেদখল তথা জীবন-জগৎ বিষয়ে ভাগ্য নির্ভর অন্ধত্বের কুপমন্ডুকতায় শ্রমিকশ্রেণীকে নিক্ষিপ্তকরণের অসৎ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ জনগণের বিশাল অংশের উপর অনৈতিক ও অযৌক্তিক আধিপত্য বিস্তার-প্রসারে ব্যাপক দান-

খয়রাত প্রদান ও স্মরণীয়-বরণীয় হওয়ার মোহে ব্যক্তিবিশেষের নামে শিক্ষা সহ নানান প্রতিষ্ঠান বানিয়ে দিয়ে তথাকথিত মহান ও করিৎকর্মা কীর্তিমান ব্যক্তি বা অভিজাত শ্রেণীর সদস্য সাজার চেষ্টা-অপচেষ্টা করলেও দেশের সংখ্যাধিক্য জনগণ দ্রারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করছে। এবং মৌলিক অধিকার বিযুক্ত হয়ে কোন মতে বেঁচে-বর্তে আছে বলেই কতিপয় অনির্বাচিত ব্যক্তির শাসনে পিষ্ট হওয়া ও অনুরূপ অনির্বাচিত,জনসম্পর্কহীন ও জবাবদিহীতে অযোগ্য ব্যক্তিগণের তথাকথিত শান্তিময় শাসনামলে -বাজারে ঘাটতি না থাকলেও অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ছুতায় কৃত্রিমভাবে নিত্য পণ্যদাম বৃদ্ধিকারী প্রকাশ্যে গণপকেট কাটা বা গণছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীগণ যেমন মিছিল-সমাবেশের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে পারে না ঠিক তেমনই বকেয়া মজুরীর চাওয়ার হেতুবাদে গার্মেন্টসসহ প্রাইভেট সেক্টরতো বটেই এমনকি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকগণকেও সরকারী বাহিনীর গুলিতে মরতে হয় বা অসাংবিধানিক জরুরী আইন ভংগের দায়ে মামলা-মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়ে জেলবাসী হতে হয় ।

অথচ,গোপনীয়তা মুক্ত রাষ্ট্রিক কাঠামো বিনির্মাণে "ফ্রিডম অব প্রেস এ্যাক্ট" সাংবিধানিক আইন হিসাবে ১৫৪৪ সালে সুইডেনে প্রবর্তিত হয় এবং ১৭৬৬ সালে উহা দুটি পৃথক আইন যথা-" ফ্রিডম অব প্রেস এ্যাক্ট" এবং " ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এ্যাক্ট" হিসাবে কার্যকারতা পায়। আইন দুটিতে - সরকারী সকল তথ্য ও দলিলাদি পাওয়ার -জানার অবাধ অধিকার জনগণের প্রত্যেকের আছে মর্মে সরকারী দলিল ও তথ্যাদি পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। আইন দুটি দ্বারা সরকারের দুর্নীতি হ্রাসকরণ এবং সরকারী কর্মকর্তাগণের জনগণের প্রতি বৈষম্যমূলক বা সমতাহীন আচরণ রহিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। সুইডেন কিন্তু সংবিধানমূলে বাংলাদেশের মত "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্র নয়, বরং এখনো রানীই সাংবিধানিক প্রধান বলে কাগজে-কলমে সুইডেন, রানীর অধীনস্ত রাষ্ট্র । অত:পর, উল্লেখিত অনুচ্ছেদ মূলে গণতান্ত্রিক নয় এমনকি, সুইডেনের নিকটবর্তীও নয়। তবে একদম জোরাষ্টিমিজমের বা জুডাইজমের অনুবর্তী বটে বাংলাদেশ ।

ন) গোত্রপ্রধান-গোষ্ঠিপতি ও ল্যান্ড লর্ডদের কর্তৃত্বমূলক ফিউডাল প্রথা ও বিধানাদি পশ্চিম পাকিস্তানে বহুক্ষেত্রে প্রায় অটুট রেখেই ব্রিটিশের সৃষ্ট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রিক অবস্থান বজায় রেখে সিয়াটো-সেন্টো চুক্তিভুক্ত হওয়া সহ আরো বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত আনুগত্যে যুক্তরাষ্ট্রের দোষর পাকিস্তান, জনকরের অর্থে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে স্থাপিত শিল্প-কারখানা গুলো আরো নানাবিদ সুযোগ-সুবিধা সমেত কতিপয় ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা সহ প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রিক পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে বৈশ্বিক পুঁজির সহযোগী একটি পুঁজিপতি শ্রেণী লালন-পালন করেছিল । হোসেন শহীদ সোরাওয়ার্দ্দির নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনা শাসনের অংশীদার হয়েও পাকিস্তানী বিগ বুর্জোয়াদের সমর্থন লাভে শেষত ব্যর্থ হয়ে বৈরীতায় লিপ্ত তবে, সেনা কর্মকর্তা সহ পাবলিক সার্ভিসে জনসংখ্যার হারে বাংগালী শিক্ষিতদেরকে নিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সহ ব্যাংকিং সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে ঢাকার হিস্যা ও কর্তৃত্ব নিশ্চিতকরণের দাবীনামা সম্বলিত " ৬ দফার" কল্যাণে পূর্ব পাকিস্তানের উঠতি বুর্জোয়া তথা ধনীক-বণিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিভূ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সিয়াটো চুক্তির পক্ষভুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগ ভেংগে নাপের জন্ম দেওয়া পুজিবাদী আওয়ামী লীগ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও তাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ২৫মার্চ,১৯৭১ সালে ঢাকায় নির্বিচার গণহত্যা সংঘটিত করে। যদিও পাকিস্তানের সেনা শাসক খোদ ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করেছিল। পাকিস্তানের ক্ষমতা প্রাপ্তির মোহে ও আশায় আলোচনার বিভিন্ন পর্বে "অগ্রগতি" হয়েছে বলে স্বয়ং শেখ মুজিব দাবী করেছিলেন। তবে, পাকিস্তানীদের স্বশস্ত্র হামলা-আক্রমন মোকাবেলা ও প্রতিরোধে বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণ স্বশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১০ এপ্রিল-১৯৭১ এর স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র দ্বারা যুদ্ধের প্রেক্ষিত ও অংগীকার ঘোষিত হয়। ঐ ঘোষণা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহম্মদের প্রধানমন্ত্রীত্বে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়।

পুঁজির স্বার্থেই যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানীদের সক্রিয় সমর্থন-সহযোগীতা করা সহ "মুক্তিযুদ্ধ" নি:শেষকরণে " সপ্তম নৌবহর" প্রেরণ করেছিল। আমেরিকার প্রতিপক্ষ সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থনপুষ্ট ভারত সরকারের সাবির্ক সহযোগিতা ও সমর্থনও কিন্তু পুঁজিবাদী স্বার্থমুক্ত ছিল না। বাংলাদেশ সরকারের বাইরে অবস্থান করেও বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বশস্ত্র বাহিনী গঠন ও "মুক্তিযুদ্ধে" অংশ গ্রহণ করলেও ১৭এপ্রিল-১৯৭১ সালে গঠিত সরকার স্বীয় কর্তৃত্বে সরকারী মুক্তিবাহিনী গঠনসহ সরকারী কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় কাঠামো -দফতর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী বাংগালীদের কেউ কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেওয়ার পূর্বেই ধৃত হয়ে কোর্টমার্শালে মৃত্যদন্ড সহ বিভিন্ন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হওয়ার মতো ভয়ানক বিপদের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান হতে পালিয়ে এসে মুক্তিবাহিনীভুক্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিল,তন্মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছেন বা পংগুত্ব বরণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিল্প শ্রমিকসহ প্রধানত গ্রামীণ কৃষিজীবী মেহনতি মানুষ হলেও পুলিশ বিভাগসহ সরকারী বিভিন্ন বিভাগের লোকজন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে মুক্তিবাহিনীসহ বিভিন্ন বিভাগ-দফতরে যোগ দিয়েছিলেন। ১৭ এপ্রিলের সরকার, পাকিস্তান পন্থী দলীয় নেতা-সাংসদের নানান ষড়যন্ত্র -চক্রান্ত সত্ত্বেও অবরুদ্ধ দেশবাসীর সমর্থন ও আস্থা অর্জন, অনুকুল বিশ্বজনমত গড়ে তোলা ও আন্তর্জাতিক সমর্থন-সহযোগীতা লাভ, এবং দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন সহ অনুরূপ রাষ্ট্রিক দায়িত্ব নির্বাহ করেছিল। অত:পর, অশ্রমিকশ্রেণীর দল পুঁজিবাদী আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার ঘোষণা অনুয়ায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেকের কর্মকে রাষ্ট্রিক কার্য গণ্যে প্রত্যেকের কার্যক্রমকে সমন্বিত ও পরিচালনা করার নিমিত্তে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পত্তন করা বৈ পরিত্যাক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুন:র্বহাল করা নয় বরং নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পত্তনে অত্র সংবিধান প্রণীত হওয়াই এতদ্বমর্মে আবশ্যক ও স্বাধীনতার দাবীদার আওয়ামী লীগের করণীয় ও কর্তব্য ছিল।

কিন্ত, প্রকৃত সত্য হচ্ছে-এমন একটি স্বাধীন বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন-পত্তন করার সুযোগ যেমন পুঁজিবাদের বিশ্ব প্রভু বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের রাজত্বে নাই তেমন মার্কসদের আমলেই পুঁজিবাদী সমাজ যেমন বৃদ্ধ হয়েছিল তেমন পুঁজির পাহারাদার রাষ্ট্রও ব্যভিচারী ও সাম্রাজ্যবাদী অবস্থায় অর্থাৎ চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছিল বলেই বার্ধক্যের

জরাজীর্ণতায় অতিশয় বৃদ্ধ পুঁজিবাদী সমাজের যেমন অনিবার্য ধ্বংসের কবল হতে কোনমতে টিকে থাকতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে বিশ্বব্যাংক ইত্যাদি জাতীয় বৈশ্বিক সিন্ডিকেট তেমন অনুরূপ বার্ধক্যের হেতুবাদের জেরবার সংকটাপন্ন-মরণাপন্ন পুঁজিবাদের কারণেই অন্তিম দশায় উপনীত রাষ্ট্র কার্যত অকার্যকর হওয়ার হেতুবাদে নিজস্ব সীমানায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রক্ষা ও সংরক্ষায় অক্ষম-অযোগ্য রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা সমেত খোদ ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র দেহতত্ত্বের নিদান মতোই নানান রোগব্যাধি সমেত নানান অংশ-অবশ-বিবশ হওয়ার মতো অবস্থায় উপনীত হয়েছে বলেই অনুরূপ মৃতবৎ রাষ্ট্র ভেংগে-চুরে খান খান হয়ে কেবলই ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়েও কেবলই কবরস্তকারীর অভাবে অমন কদাকার রূপে আভির্ভূত হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক রূপ আবিস্কার করেছিল ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউন- ৩০শে মে,১৮৭১ সালে; "ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ" নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন কার্ল মার্কস। মার্কসের ঐ পুস্তকের মুখবন্ধে ১৮ মার্চ, ১৮৯১ সালে ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস জানিয়েছেন-প্রলেতারিয় একনায়কত্ব দেখতে হলে প্যারি কমিউনের প্রতি চোখ ফেরাতে হবে। অত:পর, প্রলেতারিয় একনায়কত্ব বা সমাজতন্ত্র কি রূপ ব্যবস্থা তা জানার জন্য আমরাও প্যারী কমিউনের প্রতি মনোযোগী হওয়াটাই যৌক্তিক নয় কি ? ঐ ভূমিকায় এ্যাংগেলস লিখেছেন -১৮ মার্চ ১৮৭১ সালে প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণী ও সমগ্র প্যারিস একদিকে এবং অন্যদিকে ভার্সাইতে অবস্থিত ফরাসী সরকারের মধ্যে গৃহ যুদ্ধ ঘোষিত হল। "২৬ শে মার্চ প্যারিস কমিউন নির্বাচিত হয় আর ২৮ শে মার্চ ঘোষিত হল কমিউনের শাসন। জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি সে পর্যন্ত শাসন কাজ চালিয়েছে , এবার তারা প্যারিসের কলংকিত 'সুনীতি রক্ষা দলটি' ভেংগে দেবার আদেশ দিয়ে তারপর পদত্যাগ পত্র পেশ করল কমিউনের কাছে। ২০ শে মার্চ তারিখে সরকারী সৈন্যদলভুক্তি ও স্থায়ী সেনাবাহিনী নাকচ করল কমিউন।" এবং " কমিউনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বিদেশীদের নির্বাচন পাকা করা হল সেই তারিখেই, কারণ-'কমিউনের পতাকা বিশ্ব প্রজাতন্ত্রের পতাকা' । "

একই নিবন্ধে তিনি আরো লিখেছেন- " ক্ষমতায় একবার এসেই শ্রমিক শ্রেণী পুরানো শাসনযন্ত্র দিয়ে কাজ চালাতে পারবে না, যে আধিপত্য শ্রমিকশ্রেণী সদ্য জয় করে নিয়েছে তাকে আবার হারাতে না হলে একদিকে যেমন উচ্ছেদ করে দিতে হবে সকল সাবেকী নিপীড়ন যন্ত্রকে, এতকাল যা তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার অন্যদিকে তেমনই আত্মরক্ষা করতে হবে নিজেদের প্রতিনিধি ও সরকারী পদাভিষিক্তদের হাত থেকেও- এই বিধান ঘোষণা করে যে, বিনা ব্যতিক্রমে এদের প্রতিজনকে যে কোনমুহূর্তে প্রত্যাহার করা যাবে।" এবং তিনি আরো লিখেছেন -" স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই,নেই স্থায়ী পদ ও পেনশনের অধিকার সম্বলিত আমলাতন্ত্র।" এবং " ভূতপূর্ব সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই যেটা অনিবার্য রূপান্তর, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র সংস্থাগুলির সমাজের সেবক থেকে সমাজের প্রভুতে এই রূপান্তরের বিরুদ্ধে কমিউন দুটি অব্যর্থ অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। প্রথমত, কমিউন প্রশাসনিক , বিচার ও শিক্ষা সম্পর্কিত সকল পদ পূর্ণ করল সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের মারফত, এবং এই নির্বাচক মন্ডলী কর্তৃক যে কোন সময়ে তাদের প্রত্যাহার করার অধিকার সহ। দ্বিতীয়ত , অন্যান্য

শ্রমিকেরা যে বেতন পায় , উচ্চ নিম্ন নির্বিশেষে সকল কর্মচারীর পক্ষেই সেই বেতন ধার্য হল। কমিউনের দেওয়া সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৬,০০০ ফ্রাঁ।"

অর্থাৎ স্থায়ী সেনা-পুলিশ বাহিনী সহ পুরুনো রাষ্ট্র যন্ত্রটাই বিলুপ্ত করেছিল বিশ্ব সাধারণতান্ত্রিক প্যারী কমিউন। বিচার ও শিক্ষা সহ সমাজের সকল পদ-পদবী ও কাঠামোতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ও প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে সকলকেই নির্বাচিত হতে হতো এবং আর্থিক ভাবে কেউই শ্রমিকশ্রেণীর জীবন ধারণের উপরের জীবনমান লাভে সুযোগহীন।

এতদ্বিষয়ে "ফ্রান্সে গৃহ যুদ্ধ " রচনায় মার্কস বিভিন্ন প্যারায় লিখেছেন- " শ্রমজীবী মানুষের ১৮ ই মার্চের গৌরবমন্ডিত বিপ্লব প্যারিসের উপর তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল অস্থায়ী সরকার। " এবং " কিন্তু স্রেফ তৈরী রাষ্ট্র যন্ত্রটাকে দখল করেই নিজের কাজে তা লাগাতে পারে না শ্রমিক শ্রেণী।" এবং " কমিউনের প্রথম আদেশ ছিল স্থায়ী সৈন্যদলের অবলুপ্তি , তার স্থানে সশস্ত্র জনবলের প্রতিষ্ঠা। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শহরের বিভিন্ন পল্লী থেকে নির্বাচিত , নির্বাচকমন্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল ও স্বল্পমেয়াদে প্রত্যাহার যোগ্য পৌর প্রতিনিধিদের নিয়েই কমিউন গঠিত হয়েছিল। ----পার্লামেন্টারী সংস্থা না হয়ে কমিউনকে হতে হল একটি কাজের সংস্থা , একই সংগে কার্যনির্বাহক ও আইন প্রণয়নী সংস্থা। পুলিশকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ার না রেখে , তার রাজনৈতিক প্রকৃতির সবটাকে অবিলম্বে ঘুচিয়ে দিয়ে , তাকে রূপান্তরিত করা হল কমিউনের কাছে দায়ী ও যে কোন সময় প্রত্যাহার যোগ্য তার সংস্থা রূপে। প্রশাসনের অপর সকল শাখার কর্মকর্তাদের বেলাতেও একই ব্যবস্থা হয়। কমিউনের সদস্যগণ থেকে শুরু করে নিচে পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সরকারী কাজ চালাতে হল শ্রমজীবীদের মজুরীতে। রাষ্ট্রের বড় বড় হোমরা-চোমরাদের বিলুপ্তির সংগে সংগে তাদের কায়েমী স্বত্ব ও প্রাপ্য ভাতা ইত্যাদিও হল বিলুপ্ত। সরকারী কর্মভার এখন আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে রইল না। শুধু পৌর শাসন নয়, এ যাবৎ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত উদ্যোগই অর্পিত হল কমিউনের হাতে।" এবং " উপরতলা থেকে নিয়োগ এর চাইতে কমিউনের আদর্শের অধিকতর পরিপন্থী আরকিছুই হতে পারে না।" এবং " সমাজের অন্য কর্মচারীদের মতনই ম্যাজিস্ট্রেট ও জজেরাও হয়ে উঠল নির্বাচিত , দায়িত্বশীল এবং প্রত্যাহার্য। " এবং " মিতব্যয়ী শাসন-বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির এই ধ্বনিকে কমিউন বাস্তবে রূপায়িত করেছিল স্থায়ী সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্র -এই দুইটি সর্বাধিক ব্যয়বহুল ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে।" এবং " কমিউন কৃতকার্যের বিবরণ ও বক্তব্যাদি প্রকাশ করত, নিজেদের সমস্ত ত্রটির কথা জানাত জনসাধারণকে।"

অত:পর, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত উক্তরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক রূপ হিসাবে উল্লেখপূর্বক অনুরূপ ব্যবস্থাকে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কার ও ব্যাখ্যাকারীদ্বয় বলেই কার্যতই এবং প্রকৃতই অনুরূপ ব্যবস্থার সমাজ ছাড়া রাষ্ট্র বিশেষকে সমাজতন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করার সুযোগ নাই। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র কোন রাষ্ট্র নয়,স্রেফ সমাজ। কাজেই, সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করার প্রত্যয় ও প্রত্যাশা সংবিধান প্রণেতাগণের থাকলে বা সত্যি

সত্যি সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁরা আন্তরিক হলে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে অনুরূপ রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিতকরণের নিমিত্তে প্যারী কমিউন বা তদানুরূপ সংবিধান প্রণয়ন করাইতো খন্ড কালের নব্য সমাজতন্ত্রী আওয়ামী লীগের কর্তব্য কর্ম ছিল।

কিন্তু, পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত পুঁজিবাদীদের বিরোধের প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা তদ্রুপ সমাজ নয় , বরং একটি নতুন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জন্ম নিতে বা গঠিত হতে পারে বটে। অথচ, পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রকে ভয় পায় বলে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত করার জন্যই অন্তত ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই লেনিনদের নজিরে পুঁজিবাদীরা নিজ নিজ রাষ্ট্রকে "সমাজতান্ত্রিক" রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করাই শ্রেয়তর গণ্য করছে। আজন্ম পুঁজিবাদী, বিশ্বমোড়ল যুক্তরাষ্ট্রের অনুগামী ও ধনীকশ্রেণীর সেবক আওয়ামী লীগও বাংলাদেশের শ্রমজীবী-মুক্তিকামী জনগণকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করতেই সমাজতন্ত্রের প্রতি বৈরীতাপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অত্র সংবিধান রাজনৈতিক জালিয়াতি ও প্রতারণামূলে প্রণয়ন করেছিল।

কেবলমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণীর সহিত শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধের ফলশ্রুতিতে সমাজতন্ত্র জন্ম নিতে পারে বিধায় শ্রমিক শ্রেণী বৈ অন্যকোন শ্রেণীর পক্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় বা ব্যক্তিমালিকানার স্বার্থ ভিত্তিক কোন শ্রেণী বা পুঁজিপতি শ্রেণীর এটি কর্ম নয় । আওয়ামী লীগও শ্রমিকশ্রেণীর দল নয় বলেই সমাজতন্ত্রের জন্মদাতা পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানাকে দলীয় স্বার্থে রক্ষা ও বিকাশে "মুক্তিযুদ্ধের" অর্জন ও ফসল হতে শ্রমজীবীগণকে বঞ্চিত করার হীনউদ্দেশ্য পূরণের দুরভিসন্ধিতে -"মুক্তিযুদ্ধ" ও "মুক্তিযোদ্ধাগণকে" ঠকানো ও প্রতারিত করার নিমিত্তে সেনাবাহিনীতে চালুকৃত তবে, মানবিকতার পরিপন্থী -ঘৃণ্য ব্যাটসম্যান প্রথাসহ এতদ্বিষয়ক ব্রিটিশ-পাকিস্তানী অসভ্যতার অগণতান্ত্রিক আইন-নিয়ম ইত্যাদি এবং ১৮৬০ সালের পুলিশ রেগুলেশন বহাল রাখা সহ পাকিস্তানী ধারাবাহিকতার প্রথাগত সেনা ও পুলিশ বাহিনী সংরক্ষণ এবং সাধারণভাবে চাকুরীর ধারাবাহিকতা-জেষ্ঠ্যতা ইত্যাদি রক্ষাসহ এতদ্বিভাগে কর্মরতদের আত্মীকরণ করে সরকারের কর্তৃত্বাধীন মুক্তিবাহিনীভুক্ত অপরাপর সদস্যগণকে অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক ও শ্রমজীবিগণের মধ্য হতে আগত তথা অপেশাদার যুদ্ধাগণকে যাঁরা ছিল সরকারী মুক্তিবাহিনীর প্রায় ৯২% জন সহ বেসরকারীভাবে ক্রিয়াশীল সকল মুক্তিযুদ্ধাকে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগই পূর্বেকার পেশাগত যুদ্ধা ও সরকারী পোষাক হীন মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি ও কার্যকর করে সর্বাগ্রে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অস্বীকার ও অকার্যকর করার প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধা সহ মুক্তিযুদ্ধের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল বলেই মেয়াদোত্তীর্ণে অস্ত্রধারী "মুক্তিযোদ্ধাগণ" সরকারী বিধানে দুস্কৃতিকারী হিসাবে গণ্য ও চিহ্নিত হয়েছে।

অথচ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে নিরাপদ জীবন আচারকারী সহ পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর অফিসার যারা -২৬ মার্চ, ১৯৭১ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যুদ্ধবাজ সামরিক জান্তার হুকুম-নির্দেশ মতো পাকিস্তান রক্ষায়,মুক্তিযোদ্ধা সহ বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী মার্শাল ল', কার্ফু বা সান্ধ্য আইন, ও এতদসংক্রান্ত হুকুম বা অন্যান্য আইন ভংগ-অমান্য করার দায়ে মামলা দায়ের, গ্রেফতার, তদন্তানুষ্ঠন ও বিচারের নিমিত্তে চার্জশীট প্রদান করা সহ পাকিস্তানী খুনিবাহিনীর দোষর হিসাবে

সন্দেহভাজন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার অজুহাতে বহুব্যক্তিকে আটক-গ্রেফতার, নিপীড়ন-নির্যাতন ও বাড়ী-ঘরে অগ্নি সংযোগ করাসহ বাংলাদেশ বিরোধী নানান দুস্কর্মে যুক্ত-জড়িত ছিল; অনুরূপ দুস্কর্ম জায়েজীকরণে বিচার বিভাগের পাকিস্তানী বিচার কর্তাগণ পুলিশী মামলায় ধৃত-চার্জশীটভুক্তদের কখনো কখনো সামারি ট্রায়ালের নামে নানান দন্ড প্রদান করেছিল বা পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশের অনিবার্য বিরোধ হতে পূর্বাপর সৃষ্ট বিরোধীয় বিষয় সমূহ পাকিস্তানীদের পক্ষে নিস্পত্তি করেছিল ।

এবং অন্যান্য বিভাগ-শাখার কর্তাগণও সক্রিয়ভাবে বা নানান অযুক্তি-কুযুক্তির আড়ালে সেবা করেছে বটে পাকিস্তানী খুনি বাহিনীর। জেলা-মহকুমা বা থানা পর্যায়ের কর্মকর্তা বিশেষ কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কর্মচারীদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলামুলক শাস্তি বা দন্ডবিধান সহ নানান রকম হেনস্তা-গঞ্জনা করা বা মুক্তিযুদ্ধাদের পরিবারবর্গ বা সমর্থিতগণকে অসন্মান-অপমান করা বা নিশ্চিত পরাজয় যে নিশ্চারিত, তা না বুঝে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী কর্মচারীদের নির্বুদ্ধিতায় চৌদ্দ গোষ্ঠী ধরে শাপ-শাপন্তকরণে পাশবিক আনন্দ পাওয়া বহু কর্মকর্তা স্ব-স্ব পরিবার সমেত সেনা-পুলিশ বেষ্টিত নিরাপদ জীবন-যাপন করাসহ পূর্ব পাকিস্তানের দুষ্ট আমলাতন্ত্রের শীর্ষ ছাঁইরা তাদের চুতর মগজ খাটিয়ে চৌকুশ বুদ্ধি দিয়ে উত্তম সেবা করেছিল, প্রভুগণ্যে ব্যাপক গণহত্যা সহ মুক্তিযোদ্ধা হত্যাকরীদের।

সুতরাং-অনুরূপ সকলেই বাংলাদেশ বিরোধী এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী সামরিক জান্তার দোষর হিসাবে দোষী । তৎসত্ত্বেও, অনুন্য স্ব-স্ব দায়-দোষের স্বস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও নিদেনপক্ষে অনুতাপ ছাড়াই বা তদানুরূপ বিহীতাদি না করার সরকারী উদ্যোগ-আয়োজন ছাড়াই কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রায় সকল- সচিব, উপ-সহকারী ও যুগ্ন সচিব বা অনুরূপ পদ-পদবীর আমলাকর্তা, পাবলিক সেক্টর বা করপোরেশনের সেক্রেটারী, পুলিশ কর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং বিচারপতি-বিচারকর্তাগণ স্বীয় বিভাগ-শাখায় স্ব স্ব পদে বহাল থাকলেন এবং তদনিমিত্তে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-০৯, ১৯৭২ , আদেশ নং-৭৯, ১৯৭২ সহ তদানুরূপ কতিপয় আইন জারী করা হয়। উল্লেখিত আইন সমূহের উদ্দেশ্য-বিধেয় এবং সূত্র -গোত্র বা ঠিকুজি ছিল বৃটিশ-পাকিস্তান।

অন্যের সম্পদ নিজ দখলীভুক্তকরণে চুরি,ডাকাতি, দুস্যতা, রাহাজানি, প্রতারণা, জালিয়াতি , মিথ্যাচার, অপহরণ, আটক, খুন-জখম, ঘুষ-বখশিশ, অনিয়ম-দুর্নীতি ইত্যাদিকে মৃত্যুদন্ড, বিভিন্ন মেয়াদী কারাদন্ড ও জরিমানা সমেত শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে -"১৮৬০ সালের দন্ডবিধি" এবং তদনিমিত্তে অভিযুক্তগণকে আদালতে সোপর্দ্দকরণে কর্তৃত্ব মর্মে " পুলিশ রেগুলেশন-১৮৬০" এবং বিচারকর্তাগণ কর্তৃক উক্তরূপ দোষে দুষ্টগণকে সাজা প্রদানে "ফৌজদারী কার্যবিধি-১৮৯৮" জারী করার মাধ্যমে " ন্যাটিভ ডগদেরকে" মস্তিষ্কহীন,বিবেকহীন, মেরুদন্ডহীন অনুগতভৃত্য ও পোষাকুকুর হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে "বিদ্রোহ " শব্দ যাতে ভবিষ্যতে ভারতে উচ্ছারিত হতে না পারে সেরূপ বিহীত নিশ্চিতকরণের হেতুবাদে উল্লেখিত আইন সমূহ প্রণয়ন-বহাল ও কার্যকর করেছিল ১৮৫৭সালের সিপাহী বিদ্রোহের শত্রুপক্ষ ব্রিটিশ রাজ।

অথচ, ব্যবসার নিমিত্তে দিল্লীর মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের প্রদত্ত সনদপত্রকে-তঞ্চকতা, প্রতারণা ও জালিয়াতিমূলে ব্যবহার করে বৈদেশিক বাণিজ্যের "কর বা শুল্ক" বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কর ফাঁকি দেওয়া সহ অন্যান্য বদমতলবে মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজকে যথাযথ পরিমান শুল্ক ও কর প্রদান না করে নবাবের সহিত উদ্দেশ্যপূর্ণ বিরোধ ও বৈরীতা সৃষ্টি এবং তদ্রুপ বদমতলব হাসিলে মীর জাফর-জগৎ শেঠদেরকে বখশিশ-ঘুষ প্রদান ও অধিকতর মুনাফা-ক্ষমতা ইত্যাদির লোভ-প্রলোভণে বশীকরণ সমেত প্রভুভক্ত কুকুর তূল্য গণ্যে নিজ দল ভুক্ত করে চীন দেশে "আফিম চোরাকারবারী" ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত,খুন-জখম ও জবরদস্তিমূলে ১৭৫৭ সালে বংগ দখল করেছিল। তারা নবাবকেও হত্যা করেছিল। শুধু অন্যের সম্পদ নয়, বরং সম্পদ উৎপাদনকারী মানুষজনকেও পদানত-অধীনস্ত করা সহ খোদ দেশটাকে জবর দখল করার মাধ্যমে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন-অপহরণ সহ দুনিয়ার বহু দেশে অনুরূপ দুস্কর্ম করেছিল বলেই ভাগ্যান্বেষী,লোভী ও প্রতারক যুবকসহ ইংল্যান্ডের রানী ও লর্ডসহ অন্যান্যদের সম্পদ ও সমৃদ্ধি, বৃদ্ধির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে ইংরেজ রাজত্ব তথা উপনিবেশ প্রসারিত হয়েছিল। অর্থাৎ দুনিয়ায় যতরকম কুকর্ম-দুস্কর্ম মানুষ সম্পাদন করতে পারে সেই সব দুস্কর্মই যেমন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তেমন বৃটিশ রাজ করেছিল। সর্বপুরি, অপরের দেশ দখল করে গায়ের জোরে উপনিবেশের জনগণকে ব্যক্তি বিশেষের ধন-সম্পদ চুরি-অপহরণের দায়ে অভিযুক্ত করে দোষী গণ্যে দন্ড দানের বিচার পদ্ধতি সমেত তাবৎ বিষয়াদিই চরম দুস্কর্ম তাওতো নিশ্চিত। অত:পর, সম্পদ আত্মসাৎ, ক্ষতি সাধন, আঘাত প্রদান, হত্যা-খুন করা ও অপরাধের সহযোগিতা করা ও সহযোগীকে আশ্রয় দান সহ অপরাধের এমনতরো সংজ্ঞাযুক্ত অপরাধী ব্রিটিশরাজের প্রণীত দন্ড বিধির বিধান মতেও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীইতো তৎকালে বাংলাদেশ ও ভারতের ক্ষেত্রে সর্বাধিক দন্ডযোগ্য অপরাধী। তদার্থে বাদ যেতে পারে না ভারত শাসন আইন -১৮৫৮ জারী কারী খোদ বৃটিশ রাজ।

কাজেই, ইতিহাসের জঘন্য অপরাধ সংঘটনকারী ইংরেজ যে, স্বীয় অপরাধ চিরস্থায়ী করণে- তাদেরই সৃষ্ট ও লালিত-পালিত জমিদার-জোতদার ও ধনিক-বণিক এবং হুকুমের গোলাম আমলাকুল সহ ব্রিটিশ রাজের অপহরণকৃত সম্পদ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় তদাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তি-গোষ্ঠী কর্তৃক অনুরূপ লুণ্ঠন রহিতকরণ বা ব্রিটিশ-ভারতে উক্তরূপ সম্পদ শালী অপরাধীকুলের তাবৎ লুণ্ঠিত সম্পদ ভারতীয় অপরাপর বা মুক্তিকামী মানুষজন কর্তৃক যেন বেদখল বা বেহাত হতে না পারে তা নিশ্চিতকরণে উল্লেখিত দন্ডবিধি সহ বিচার বিধি বা রেগুলেশন সহ পুলিশ বাহিনী সহ বিচার বিভাগ সৃষ্টি করেছিল বলে ঐ সকল আইন-বিধি এবং বাহিনী ও বিভাগ বহাল রাখার হেতুবাদে কার্যত বৃটিশ উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো বহাল রেখেছিল ব্রিটিশের ভাবাদর্শিক সন্তান, পরস্পরের মসজিদে বোমা হামলা করা সহ শিয়াদের সহিত স্থায়ী মতদ্বৈতায় লিপ্ত পাকিস্তানী সুন্নি মুসলিমদেরও "জনক", "শিয়া" সম্প্রদায় ভুক্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তান। নিদেন পক্ষে, বৃটিশ কলোনীয়াল রাষ্ট্রের খোল-নলচেও বদল করেনি , পাকিস্তান । অত:পর, আওয়ামী লীগ সরকার - সদ্য স্বাধীন নতুন রাষ্ট্র পত্তন বা গঠন নয়, দ্বিখন্ডিত পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তান অংশের রাষ্ট্রিক কাঠামো 'এজ ইট ইজ' বা যেমন ছিল তেমন বহাল করেছিল বলেই প্রজাতন্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত সচিব বিশেষ ২০০৭

সালে প্রকাশ্যে গলা উঁচিয়ে ১৯৭১ সালকে "গোলামালের" বছর এবং " গৃহযুদ্ধ" বলতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত না হয়ে গর্ব বোধ করলেও সরকার বা বিচার বিভাগের পক্ষ হতে স্যুয়োমুটোভাবে তাকে দোষী গণ্যে বিহীত করা হয়নি ।

তদপুরি, সামরিক জান্তার রাজনৈতিক হাতিয়ার ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানীয় সরকার কাঠামো বজায় ও বলবত রাখা হয়। অথচ, উত্তর ইউরোপীয় ভাইকিং অর্থাৎ জলদস্যুদের পুর্বসুরী "নরম্যান্ডি ডিউক উইলিয়ম" ১০৬৬ সালে ইংল্যান্ডের " কিং হারোল্ড-২"কে পরাস্ত করে ভূমি ও পদবী প্রদানের যুদ্ধপুর্ব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে "লন্ডন সিটি করপোরেশন" এবং শহর ও গ্রামে ফিউডাল সিষ্টেমের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিকল্পনা মতো ব্রিটিশ রাজার প্রদত্ত ১৬৮৭ সালের চার্টার মতো ১৬৮৮ সালে মাদ্রাজ এবং ১৭২৬ সালে কলকাতা সিটি করপোরেশনে পরিণত হয়। দি টাউন ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট-১৮৩৬ অনুযায়ী ভারতে মিউনিসিপালিটি হিসাবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রসারিত হয় এবং ভারতের ভাইসরয় লর্ড রিপন স্থানীয় সরকারকে "রাজনৈতিক হাতিয়ার" হিসাবে ব্যবহার করার জন্য চেয়ারম্যান নিয়োগ ইত্যাদি সহ এতদসম্পর্কিত আইনের সংশোধন করে। খ্রীষ্ট পুর্ব ৭০০-৩০০ সালে "১৬ মহাজনপদের" আমলে হরিয়ানা, হিমাচল ও উত্তর প্রদেশ সহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামিণ রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে "পঞ্চায়েত" ছিল।

উল্লেখিত রাজনৈতিক সংগঠন বা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পত্তন করা হয়েছিল জনগণের উপর যুদ্ধবাজ, দস্যু ,লুটেরা ও রাজা বা শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করার মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীর জন্ম হেতু জন্মদোষ তথা শোষণ-পীড়ন স্থায়ীকরণের দুরভিসন্ধিতে। জেনারেল আয়ুব স্বীয় সামরিক শাসনকে বেসামরিক ছদ্মাবরণে দীর্ঘস্থায়ীকরণে "বেসিক ডেমোক্রেসি"-র নামে " ইউনিয়ন পরিষদকে" নির্বাহী বিভাগের সর্ব নিম্ন ইউনিট গণ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করেছিল । উল্লেখিত স্থানীয় পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য সমন্বয়ে " নির্বাচক মন্ডলী" গঠন করে উক্ত বেসিক ডেমোক্রেটদের ভোটের সুবাদে ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল আয়ুব। আয়ুবী স্বৈরতন্ত্রের সর্বনিম্ন হুইল ও অংশীদার গণ্যে পুর্ব পাকিস্তানের ইউ.পি চেয়ারম্যানগণের অধিকাংশই গণবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে ১৯৬৯-৭০ সালে গণআন্দোলনের স্থানীয় টার্গেটে পরিণত হয়ে কেউ কেউ গণপিটুনিতে নিহত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউ.পি চেয়ারম্যান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল বলে প্রমাণ নাই, বরং মুসলিম লীগের কর্মী-সমর্থক বা পাকিস্তানী সামরিক জান্তার সহযোগী হিসাবে রাজাকার-আলবদর বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগী সংগঠন "শান্তি কমিটি" গঠন ও নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। পাকিস্তান আমলের নির্বাচিত চেয়ারম্যান সমেত ইউনিয়ন কাউন্সিল কেবলমাত্র বাংলাদেশের জন্মকালীন বৈরীতার কারণেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সরকারের কোন কাঠামো হিসাবে বিবেচিত-গণ্য হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত না হলেও উক্তরূপ স্থানীয় সরকার বজায় রাখা হয়েছিল।

ভারতীয় মিথ ইত্যাদি হতে জানা যায় বনবাস শেষে "কিং রামের"স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনকালীন উৎসব উদযাপনে বিপুল সংখ্যক দাস-দাসীদেরকে উপঢৌকন হিসাবে

প্রদানের নিমিত্তে মাত্রারিক্ত চাহিদা বৃদ্ধির হেতুবাদে বয়স্ক দাসগণের মাথায়-মুখে রং মেখে কমবয়সী ও কর্মোপযোগী সাজিয়ে চালাকি বা জালিয়াতিপুর্বক দাস ব্যবসায়ীগণ বিপুল মুনাফা অর্জন করেছিল। অনুরূপ, লেনিনদের দুস্কর্ম না জানলেও সাধারণভাবে সকল প্রকার শোষণ-পীড়ন ও বঞ্চনামুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা মর্মে বিশ্বময় যেমন,তেমন বাংলাদেশেও সমাজতন্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা- জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও প্রসারিত হওয়ায় বিশেষত, মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানীদের হামলা-আক্রমনে " থাক ভিক্ষা , কুত্তা সমালানোর" মতো সম্পত্তি নয়, জীবন বাঁচাতে কতিপয় ভি.আই.পিরা ছাড়া সাধারণ মানের ধনী-গরীব সবাই একত্রে পালিয়েছিল, উদ্বাস্তু হয়েছিল বা উপবাস থেকেছিল বা যার নিকট যেটুকু খাবার ছিল বা সরকারী-বেসরকারী ও স্থানীয় কারো নিকট হতে যেটুক খাবার পেয়েছিল তা, সবাই মিলে-মিশে খেয়েছিল বা একই বাহনে যাতায়ত,সমবেতভাবে একই স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ ও নিশি-নিদ্রা যাপন এবং একই ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেছিল বা পরস্পরের সুখ-দুখের ভাগ পরস্পর ভাগ করে নিয়েছিল এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলে যুদ্ধের জয়-পরাজয়,জন্ম-জন্মান্তরের নৃশংস-হিংস্র, অসভ্য ও অভিশপ্ত যুদ্ধের হেতুবাদ-কারণ এবং যুদ্ধের হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ,নিষ্ঠুরতা-বর্বরতার জঘন্য সব বিবরণ ও অনুরূপ ভয়ানক-ভয়ংকর যুদ্ধবাজ, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধের অভিশাপ হতে মানবজাতির চিরস্থায়ী মুক্তি লাভ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, চলমান ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়ানক বোমাবাজির "মাইলাম" বিভিষিকা সহ দুনিয়াময় সংঘটিত ইতোপুর্বেকার যুদ্ধ বিষয়ক জঘন্য ইতিহাস-মিথ,আলোচনা-সমালোচনা এবং বিজয়ী বাংলাদেশকে তো বটেই ভবিষ্যত প্রজন্মকেও হিংস্র-উৎন্মত্ত ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ বা যুদ্ধাবস্থা এবং পরমানু অস্ত্র সহ সকল প্রকার যুদ্ধাস্ত্র হতে মুক্তকরণে - এ যাবৎকালের সকল যুদ্ধের কারণ স্বরূপ ধরত্রী ও সম্পদ তা, হোক ভূমি-গরু ,দাস ও নারীর দখল-বেদখল এবং উৎপাদন উপকরণের মালিকানা বা কর্তৃত্ব লাভ-বজায় রাখার অভিশপ্ত ব্যক্তিমালিকানা তথা সামন্ত ও পুঁজিবাদ মুক্ত "সাম্য-মানবিক মর্যাদার" সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণে বিদ্যমান দুর্বিসহ-অভিশপ্ত যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থার অবসান ও অনুরূপ যুদ্ধের পুনাগর্মনকে প্রতিহতকরণে সর্ব যুদ্ধের আকর ব্যক্তিমালিকানা তথা বর্তমান কালের পুঁজিবাদ বাংলাদেশে পুন:স্থাপনের অবকাশ না দেওয়ার স্বপ্নিল মোহে বিভোর ছিল বলেই দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত জনসমষ্ঠির মধ্যে কেবলমাত্র রাজাকার, আল বদর বা পাকিস্তান পন্থী ছাড়া অন্য কেউ অনিবাসী-পালাতক জনগোষ্ঠীর কোন সম্পদ লুন্ঠন করে নাই। তবে, আওয়ামী রাজনৈতিকদের কতিপয়ের মার্কিন-পাকিস্তান প্রীতি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হারানোর ভয় বা কারো কারো কর্তৃত্বমুলক অনাচারী-দুর্বীনিত জীবন-যাপন ইত্যাদির হেতুবাদে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে নানান ধরণের কোন্দল-দলাদলি, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ইত্যাদি রূপ কুকর্মাদি ছিল এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডলে অনুরূপ কুকর্ম বা দুস্কর্ম সংঘটিত হলেও সাধারণভাবে ধর্মীয় আবরণের পুঁজিবাদী পাকিস্তান বিরোধী সকল মানুষ পরস্পরের সহিত পারস্পারিক সুসম্পর্ক রক্ষা ও সকলে সকলকে এমনকি কেউ কেউ স্বীয় জীবন বিপন্ন করে হলেও অন্যকে বিপদ মুক্ত করতে আবশ্যকীয় সহযোগীতা করার মাধ্যমে কার্যত এক ধরণের সামাজিক বোধ আবিষ্ট বা অজ্ঞতা বশত লেনিনীয় সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়েছিল গরীব মানুষতো বটেই সাধারণভাবে বহু স্বল্প বিত্তবান মানুষও, যদিও যখন-তখন মত-বোল পাল্টাত তাঁরা ।

অতপর, যুদ্ধ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে ও বিপরীতে সামাজিক মালিকানা ও মানবিকবোধের সামাজিকতার প্রতি ঝোঁক ও পক্ষপাতিত্ব জন্ম নিয়েছিল জনসাধারণ্যে এবং খুন-হত্যা, লুণ্ঠন ও অধিকর্তা বনার খোয়াবে প্রথাগত সৈনিক বা যুদ্ধা নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য তথা পাকিস্তানী দখলদার-যুদ্ধাদের হিংস্রতা-বর্বরতা অর্থাৎ নির্বিচার গণহত্যা-লুণ্ঠন, অপহরণ-নিপীড়ন, নির্যাতন-হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের রাহুদশা হতে নিস্কৃতি ও মুক্তি লাভে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও বিনা বেতনে, সৈনিকের স্বীকৃত ড্রেস বিহীন, বিনা অস্ত্রে, ও বিনা পদ-পদবীতে এবং ব্যক্তিগত লোভ-মোহ বা স্বার্থ পরিত্যাগ করে কেবলই বিপন্ন ও অবরুদ্ধ জনগণকে দখলমুক্ত করতে স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের স্নেহ-মমতা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যুক্ত বিরোধীতা বা সম্মতি দানের অক্ষমতাকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে রাতের আঁধারে পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধা হয়েছিল বলেই যুদ্ধকালীন জীবন ধারা ও যুদ্ধাদের শ্রেণীভিত্তির হেতুবাদে সংগত কারণেই সামাজিকতা-মানবিকতা প্রকারন্তরে লেনিনীয় সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক মুল্যবোধের প্রতি জোঁক ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক অংশের মধ্যে বলেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য হতে বিস্তৃত-বিকশিত হওয়া অনুরূপ ধরণের গণমতামত বা কথিত বামপন্থা আওয়ামী নেতৃত্বের জন্য বিপজ্জনক ছিল বলেই উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দিতে রাম রাজত্বের ব্যবসায়ীদের নীতি-কৌশল অনুসরণে একদা লেনিনীয় সমাজতন্ত্র বিরোধী আওয়ামী লীগ সরকার- স্বাধীনতার ঘোষণা ও অংগীকার মতো না হোক অন্তত নতুন-স্বাধীন রাষ্ট্র বিনির্মাণের পরিবর্তে বাংলাদেশে বহালকৃত পাকিস্তানী রাষ্ট্রিক কাঠামোর বেহালদশা দুরীকরণে অধিকতর কৌশল ও চাতুরালীতে গণবিরোধী পুরাতন রাষ্ট্রিক কাঠামো ইত্যাদিকে শক্তিশালী ও সংহতকরণে প্রয়োজনীয় মর্মে পুরাতন মুল্যবোধের কৌশলী নবীকরণে -"ধর্মনিরপেক্ষতার" বিকৃতি সাধন করে, অনৈতিকভাবে রাষ্ট্রকে ধর্মের পৃষ্ঠপোষক গণ্যে অপরাপর ধর্মকে অগ্রাহ্য করে মাত্র ৪টি ধর্মকে রাষ্টিয় অনুষ্ঠানাদি ও রাষ্ট্রীয় টি.ভি-বেতারের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে বয়ান করার রীতি চালু করে থাকলেও নেতৃত্বের সাবেকী ধ্যান-ধারণামতো কার্যত,একটি অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রিক পক্ষপাতিত্ব নিশ্চিত করার হেতুবাদে ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য "ইসলামিক ফাউন্ডেশন" জাতীয় কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করেনি বা এম.পি.ও ভুক্ত মাদ্রাসার বেতান-ভাতা ও আনুসাংগিক সুযোগ-সুবিধা যেমন প্রদান করা হয়েছিল তেমন ধরনের সুবিধাদি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের প্রদান করা হয়নি বা পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান ভূ-স্বামি, ১৯৭০-৭১ সালে শেখ মুজিবের প্রধান প্রতিপক্ষ -প্রতিদ্বন্দ্বি ও মার্চে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও প্রতিবন্ধক মর্মে ইয়াহিয়ার অন্যায় যুদ্ধের ইন্দনদাতা, ষড়যন্ত্র-চক্রান্তকারী ও সহযোগী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেড.এ. ভুট্টোর সহিত শেখ মুজিবের কোলাকোলির সম্পর্কের সুবাদে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ "ও .আই. সি"র সদস্য হওয়ার মতো বিষয়াদিসহ পুরানো রাষ্ট্রের সকল বিভাগ-শাখা,দপ্তর ইত্যাদি এমনকি খোদ সাবেক চেয়ারম্যান সমেত ইউনিয়ন পরিষদকে বহাল রেখে - " নতুন বোতলে পুরানো মদ" নয়, একদম পুরানো মদ পুরানো বোতলে ভরে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের লেবেল সাঁটিয়ে সহজ-সরল জনগণকে বোকা বানিয়ে ধোঁকা দিয়ে ঐ পুরানো বোতলের মাথায় "আংটির উপর নমুনা" স্বরূপ, ক্লাইভ-কর্ণওয়ালিস বা জিন্নাহ-আয়ুবের পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমানকে কর্ক হিসাবে প্রতিস্থাপন করেছিল বলেই ১৭ এপ্রিলের সরকারের নেতৃত্বদানকারীগণের

কর্তৃত্ব খর্ব করে এবং পশ্চিম বংগ, ত্রিপুরাসহ অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাংলা ভাষী বা বাংগালীদের 'জনক' স্থির না করে বা তদনিমিত্তে সংখ্যা তত্ত্ব সমেত জাত-জাতি সম্পর্কিত তত্ত্ব বেমালুম ভুলে ও ইতিহাস অস্বীকার করে "রামরাজত্বের" পূর্বসূরীদের ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত ও চালুকৃত গোত্রের আদি পিতার মোড়কে "জনক" সৃষ্টি তবে, হিটলারী ক্ষমতাতন্ত্রের অনুকরণে কেবলমাত্র "জনক" শেখ মুজিবুর রহমানের একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্বের সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল বলেই শেখ মুজিবের সরকারের সহিত বিপরীত ও ভিন্ন মতের বা মুক্তিযুদ্ধ পন্থী রাজনীতিক-পেশাজীবী সহ প্রত্যাশিত সামাজিক জীবনের রংগিন স্বপ্নভংগ হওয়া ভুক্তভোগী জনগণের বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় ও সরকারের সহিত উল্লেখিত জনগোষ্ঠী অনিবার্য বিরোধীতা ও বৈরীতয় লিপ্ত হওয়ার হেতুবাদে মুক্তিযুদ্ধকারী জনগোষ্ঠী নানান ভাগে বিভক্ত হয়েছিল বলে সুবিধা হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বর,১৯৭১ সালে আপাত, পরাজিত শক্তির ।

তদপুরি , পাকিস্তানের যাবতীয় দুস্কর্মের দোষর শাহ্ আজিজ-সবুর খানসহ পরাজিতরা কেউ কেউ প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সহানুভূতি-সহযোগীতা পেয়েছিল বাংলাদেশের খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের এমন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ২৬মার্চ -২০০৮ সালে, দৈনিক "প্রথম আলোতে"। অনুরূপ শ্রেণী প্রীতি ও শ্রেণী স্বার্থে শেখ মুজিবুর রহমানের "সাধারণ ক্ষমা" ঘোষণার মাধ্যমে মুসলিম লীগ-জামাতি নেতা তথা পাকিস্তান পন্থীদেরকে অর্থাৎ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে "অন্যায়" যুদ্ধকারীদেরকে যুদ্ধকালীন লুণ্ঠিত অর্থ বিত্ত সহ অর্থনৈতিক-সামাজিক কার্যক্রম সংঘটন- সংগঠন ও পরিচালনার সুযোগ প্রদান করে সমাজে পুনর্বাসন করা হলেও কল্পিত সমাজতন্ত্রী "সর্বহারা পাটির" নেতা সিরাজ সিকদারকে বিনা বিচার হত্যা করা সহ অন্য অনেকের সাথে এমনকি একদা আওয়ামী লীগ ভুক্ত কিন্তু বাংলাদেশ আমলে সমাজতন্ত্রের নামে সরকারের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করার দায়ে বহু মুক্তিকামী ও বিরুদ্ধপক্ষকে হত্যা-কয়েদ করেছিল শেখ মুজিব সরকার।

উপর্যপুরি, সরকারের অনুরূপ নীতি -কৌশল বজায় থাকা সহ মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক সামরিক ফরমান বলে মুক্তিযুদ্ধের "মুক্তিকে" নির্বাসন দন্ড প্রদান এবং অনুরূপ মুক্তি প্রত্যাশার দায়ে মুক্তিকামী জনতার জরিমানা স্বরূপ অত্র সংবিধান হতে "সমাজতন্ত্র" বিষয়ক অনুচ্ছেদ বিলীন বা কবরস্থকরণ ও গুরত্বহীন ভাবে বা কালির হরফে লিখিত থাকা " ধর্মনিরপেক্ষতাকে" মুছে ফেলার মাধ্যমে " বিসমিল্লাহ" সমেত পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানের "ইসলামি প্রজাতান্ত্রিক" নীতি ইত্যাদি অত্র সংবিধানে অসাংবিধানিকভাবে প্রতিস্থাপন করে অনুরূপ সংবিধান সংরক্ষণে তথা মুক্তিকামী জনগণকে প্রদত্ত উল্লেখিত দ্বিবিধ দন্ড কার্যকরণে-উপযুক্ত আধিকারিক হিসাবে ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাগণকে যথারীতি "অভ্যান্তরীণ গোলযোগ", " পাকিস্তানের দুশমন" " ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী " ও "দুস্কৃতিকারী" ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করে মুসলমানদের ইসলামি পাকিস্তান রক্ষার অপচেষ্টায় নিয়োজিত শাহ্ আজিজকে স্বীয় প্রধানমন্ত্রী করেছিল ।

অনুরূপ কারণে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে কেবলমাত্র "স্বাধীনতার" যুদ্ধ মর্মে "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" নতুনভাবে রচনা করার সুবাদে কার্যত সেনা শাসনের ঐতিহ্যবাহী পাকিস্তানী

রাজনীতি সহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক কাঠামো পোক্তকরণে শেখ মুজিবের অসমাপ্ত কর্ম সমাপ্ত করেছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান । অবশ্য,১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ "স্বাধীনতার ঘোষণা" স্বকণ্ঠে প্রচার করে এই মেজর জিয়াই শেখ মুজিবকে জাতির জনক হওয়ার পারম্ভিক ভিত্তি দিয়েছিল। প্রথমাবদি অনুরূপ অনুকুল অবস্থার সুযোগ এবং রাষ্ট্রিক সকল পর্যায়ে স্বপদে বহাল থাকা পাকিস্তানী পুলিশ-বিচার বিভাগ ও আমলাতন্ত্রের কর্মকর্তাগণ পেশাগত বদস্বভাব গুণে- ইয়ার-বন্ধু তুল্যে সাবেক পাকিস্তান সেবকদের সেবা করতে ভুলে নাই বলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তি মর্মে স্বীয় ভয়ানক পরিণতি বিষয়ে আশংকিত হয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করলেও উক্তরূপ অনুকুল পরিবেশ-পরিস্থিতির সুযোগে পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসার পূর্বতক লন্ডনসহ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে "পূর্ব পাকিস্তান পুনরোদ্ধার কমিটি"গঠন ও তদমর্মে আন্দোলন করা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভে সফল হয়েছে ধর্মব্যবসায়ী গোলাম আযম বা তাঁরই আমিরালীতে পরিচালিত পাকিস্তান রক্ষক ও তালেবান পন্থী দলের অপরাপর নেতারা বিশেষত,আল-বদর বাহিনীর কমান্ডার ও কান্ডারীরা বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাওয়ার হেতুবাদ- মূলত এবং কার্যতই, বাংলাদেশ জন্মলগ্নেই পরাজিত ও পরাভূত হয়েছিল তারই অফিসিয়াল বা আনুষ্ঠানিক নির্মাতা তবে, পুঁজিবাদী চক্রভুক্ত আওয়ামী রাজনৈতিক কলা-কুশলিবদের নিকট হেতু অত্র সংবিধানের প্রথম ও চতুর্থ তফসিলে পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামো রূপ রাষ্ট্র পত্তনে ব্রিটিশের রেখে যাওয়া ডাইসের ঠিক-ঠাক ফর্মেট মতো ১৯৭২ সালে প্রণীত এতদসম্পর্কিত আইন সমুহ ধারাবাহিকতা সহ সাংবিধানিক আইন হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে বিধায় উক্ত তফসিল দ্বয়ের সহিত সংবিধানের প্রথম,দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অনেকগুলো অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্যহীনতা ও বৈরীতার হেতুবাদে প্রবর্তনকালীন হতে অত্র সংবিধান একটি অকার্যকর -গুরুত্বহীন পুস্তক বিশেষ মাত্র। সুতরাং, এটি, এমনকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসাবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয়।

ত) অনুচ্ছেদ-৭, এ বলা হয়েছে - " জনগণ সকল ক্ষমতার মালিক " এবং " জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন" অথচ-
(১) রাষ্ট্র পরিচালনায় শুধুমাত্র ভোটাধিকার প্রয়োগ ব্যতিত গণপ্রতিনিধিগণকে 'রি-কল' করার এখতিয়ার সহ রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন বা বাতিল করার ক্ষমতা এবং সেমর্মে উপযুক্ত পন্থা ও বিহীতাদি সহ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কার্যকর জনকর্তৃত্ব সুনিশ্চিতকরণে সর্বসাধারণের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। যদিচ, গোত্র প্রথার যুগে এবং এথেন্সের প্রথম যুগে জনগণের " জনসভা" গোত্র প্রধান বা "সাচেম" এবং রাষ্ট্রিক পদাধিকারীদের পদচ্যুত বা প্রত্যাহৃত করতে পারতো। প্যারী কমিউনের ডিক্রি মতো গণপ্রতিনিধিগণও জনসাধারণের প্রতিপক্ষ হতে পারে বলেই গণপ্রতিনিধিগণের স্বল্প মেয়াদে দায়িত্ব পালনের বিধান ও যেকোন সময় প্রতিনিধিগণকে প্রত্যাহার করার ক্ষমতা-এখতিয়ার জনসাধারণের ছিল অর্থাৎ " রি-কল" করার ক্ষমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভোটারগণের সর্বময় কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা হয়েছিল বলেই অনুরূপ "রি-কল" করার অনুচ্ছেদ হীন অত্র সংবিধান কার্যত গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়; এবং

(২). (ক) অত্র সংবিধান প্রণীত ও গৃহীত হয়েছিল কেবলমাত্র জাতীয় সংসদে তাও আবার যে সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে ইসলামি পাকিস্তানের কোরান-সুন্নাহ ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের জন্য এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচিত হয়েছিল তদ্ভিত্তিতে প্রদেশের আইন প্রণয়ন ও প্রাদেশিক সরকারের নির্বাহী দায়িত্ব পালনের জন্য। সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে জারীকৃত ১১ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ এবং ১৯৭২ সালের ২৩ শে মার্চ "গণপরিষদ আদেশ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২২) দ্বারা পাকিস্তানের সেনা শাসক ইয়াহিয়ার জারীকৃত এল.এফ. ও মতে পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্যগণের সমন্বয়ে, যদি কেউ আইন সংগতভাবে সংসদ সদস্য পদ না হারিয়ে থাকেন ঐ সকল সদস্যকে নিয়ে গঠিত গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান রচনার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

১১ জানুয়ারীর আদেশেই বলা হয়- বাংলাদেশের জনগণের আকাংখা মতো বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত করা হবে। তবে, মুক্তিযুদ্ধ কালীন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সিমি হোসেন কর্তৃক প্রযোজিত " তাজ উদ্দীন: একাকী সারথী" ডক্যুমেন্টরী ফিল্মে প্রদর্শিত হয়েছে যে, ১০ জানুয়ারী ,১৯৭২ সালে পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার পথে বিমানেই - রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার বাংলাদেশ সরকারের স্বয়ং রাষ্ট্রপতি তদীয় সহযোগীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করা উচিৎ? উত্তরে অত্র সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম ব্যক্তি বলেছিলেন সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা।

অত:পর, রাষ্ট্রপতির পছন্দসই তবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা উল্লেখিত ব্যক্তি বিশেষের অভিমতই যে জনগণের পরম অভিপ্রায় তা কি করে পরের দিন অর্থাৎ ১১ জানুয়ারীতেই নিশ্চিত হয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব উল্লেখিত আদেশ প্রদান করেছিলেন? যাঁরা কোরান-সুন্নাহ ভিত্তিক স্বাধীন পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতা নিশ্চিতকরণে ও জাতীয় সংহতি সুসংহতকরণে নির্বাচনে প্রার্থী ও নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তন্মধ্যে নির্বাচিত সকলেই যে বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন না বা কেউ কেউ পাকিস্তান কনফেডারেশনের কাঠামোতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সমাপ্তি করতে চেয়েছিলেন তাওতো জানা ঘটনা।

অথচ, সেই পাকিস্তান পন্থী ধর্মীয় রাজনীতির ছদ্মাবরণে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী ও পুঁজিবাদের সমর্থক-রক্ষক সেই সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তকারী রাজনীতিক বা সাংসদগণ কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির আদেশ বলেই "সমাজতান্ত্রিক" ও "ধর্মনিরপেক্ষ" বা "গণতান্ত্রিক" রাজনীতির ধারক-বাহক ও তদ্রুপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কারিগর তথা সংবিধান প্রণেতার যোগ্য ও উপযুক্ত হতে পারেন? ১৯৭১ সালে পাকিস্তান কনফেডারেশন পন্থী জনৈক ব্যক্তিই ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব হত্যার পর রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগী হিসাবে উল্লেখিত আদেশ সমূহের কার্যকরতা যেমন অস্বীকার করেছিলেন তেমন উক্ত ঘটনাবলী দ্বারা এটিও নিশ্চিত হয়েছে যে, পুঁজিবাদী দুস্কৃতিকারীরা কেবলমাত্র অনুকুল সুযোগের অপেক্ষায় সাময়িকভাবে রাজনৈতিক মুখোশ তথা গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র ইত্যকার জনপ্রিয় রাজনীতির চালাক-চতুর কারিগরও হতে রাজী থাকে ।

তাছাড়া- বাংলাদেশের সাময়িক সরকার কি কেবলমাত্র একটি আদেশ দ্বারাই জনগণের সকল মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করতে বা জনগণের পরম অভিপ্রায় অনুযায়ী সংবিধান প্রণেতা হতে পারে? অথচ, যুদ্ধোত্তরকালে বাংলাদেশের সাময়িক সরকার যদি সত্যি সত্যি গণতন্ত্র বা জনগণের ক্ষমতা ও পরম অভিপ্রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হত তা হলে সংবিধান সভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি স্বরূপ নির্বাচিত সংবিধান সভার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ও সংবিধান প্রণয়নের যাবতীয় সকল দায়-দায়িত্ব প্রদান করতেন তবেই কেবলমাত্র অত্র সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদে বর্ণিত বক্তব্যাংশের যথার্থতা-সত্যতা ও যৌক্তিকতা নিশ্চিত হত। কাজেই, জনগণ নয় ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রসূত প্রস্তুতকৃত বলেই অত্র সংবিধান কার্যতই একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত নয়;

(২). (খ) সদ্য স্বাধীন দেশে সকল পরাধীনতার তথা সাবেকী রাষ্ট্রিক কাঠামো অর্থাৎ বিচার, প্রশাসন, সেনা, পুলিশ ইত্যাদি যা সর্বকালে শ্রমজীবী জনগণকে শোষণ-পীড়ন, নির্যাতন করেছিল সেসকল নির্যাতনকারী অংগ-পতংগের পূর্বেকার কাঠামো-স্থিতি ও অবস্থান ইত্যাদি অটুট-অক্ষুন্ন রাখা সহ তাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাদি অব্যাহত রাখা হবে কিনা , যা অত্র সংবিধানে রাখা হয়েছে সে বিষয়ে রেফারেন্ডাম অর্থাৎ উল্লেখিত সংবিধান বিষয়ে জনমতামত যাচাই-বাছাই করা হয়নি। বরং জনগণের " অভিপ্রায়ের" মালিক-মোক্তার বনে গেলেন বটে জাতীয় সংসদ। এক্ষেত্রেও জনগণ নয় ক্ষমতাধারী মর্মে গণ্য বটে বিশেষ প্রাধিকার ভুক্ত সাংসদ। সাধারণভাবে সকলেই স্বীকার করবেন যে, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনগণ মতামত প্রদানের সুযোগ পেলে কোন অবস্থাতেই বর্ণিতরূপ পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামো এবং ১৬ ডিসেম্বর-১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাক বাহিনীর দোষর কর্মকর্তাগণকে স্বপদে বহাল রাখার বা সাবেকী আইন-বিধানের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সাবেকী সেনা-পুলিশ বাহিনী বহাল রাখার বর্ণিত বিধানাদি কোনক্রমেই সমর্থন করতো না।

জন্মই প্রতারণা , জালিয়াতি ও ধান্ধাবাজির নিমিত্তে বলেই পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বাসঘাকতামূলক চরিত্রমতো বাংলাদেশে ঐ পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন-আওয়ামী লীগ স্বীয় শ্রেণী চরিত্রমতোই স্বীয় স্বার্থ হাসিলে শ্রমজীবী জনগণকে নানান মুখ রোচক প্রতিশ্রুতি দ্বারা মোহাবিষ্ট করে স্বীয় পক্ষভুক্তকরণে এমকি যুদ্ধের ময়দানে জীবন দিতে সদা প্রলুব্ধ করলেও মুক্তিযুদ্ধে কত সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণ নিহত হয়েছে তার তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ বা অনুরূপ কোন পরিসংখ্যান অদ্যাবদি ঐ লুটেরা শ্রেণীর রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাসীন সরকার কারো তরফেই করা হয়নি বলেই এখন আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকাসহ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা ১৯৭১ সালে মোট নিহতের সংখ্যা বলছে মাত্র ৩ লাখ।

অত:পর, জনগণের পরম অভিপ্রায় হিসাবে কেবলমাত্র তখনই বলা যেত যদি-মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা মতো রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি কন্সটিটিউশনাল এসেম্বলী গঠিত হত এবং উক্তরূপ এসেম্বলীতে প্রণীত সংবিধান রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গৃহীত ও কার্যকর হত । কিন্তু

সেরূপ বিহীত-ব্যবস্থা হয়নি। তৎসত্ত্বেও, নিদেনপক্ষে যদি অত্র সংবিধান জনমতামতের ভিত্তিতে কার্যকরী হত এবং তদ্রুপ বিষয় সংবিধানেই নিশ্চিত করা হত। যেমন- রুশিয়ান ফেডারেশনের ১৯৯৩ সালের সংবিধানের ২য় ভাগ , প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- জাতীয় ভিত্তিক রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গৃহীত হওয়ার ফল প্রকাশ হওয়ার মুহূর্ত্ত থেকে সংবিধানটি কার্যকর হবে। যদিচ. মোট ভোটারের মাত্র ৫৪% জন রেফারেন্ডামে অংশ নিয়েছিল এবং প্রদত্ত ভোটের ৫৪% প্রাপ্ত ভোটে সংবিধানটি গৃহীত ও কার্যকরী হয়েছে। অত:পর, ১ এর ডানে শূন্য বসলে ১০ হয় বটে কিন্তু ১ বা শূন্য কোন ক্রমেই ১০ নয়, তেমন গণপ্রতিনিধি মাত্রই জনগণের সকল ক্ষমতা ও অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তির মালিক নয় এবং জনগণের মতামত বা রেফারেন্ডামের মাধ্যমে এটি গৃহীত হয়নি বিধায় অত্র সংবিধান দ্বারা জনগণের "ক্ষমতা "ও " অভিপ্রায় " বিষয়ে অসত্য ও বিকৃত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে হেতু এটি মুক্তিযুদ্ধের অংগীকার বা প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা বিনির্মাণের দলিল নয় বা জনকর্তৃত্বের বা জনক্ষমতার বা গণ অভিপ্রায়ের বা নিদেনপক্ষে জনগণের সংবিধানও নয় ।

থ) ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকরণে-

(১) ১৯৭২ সালের পি.ও-১, পি.ও-২৬, পি.ও-২৭ সহ জাতীয়করণ সম্পর্কিত আইন সমূহ যা অনুচ্ছেদ-৪৭ দ্বারা হেফাজতকৃত এবং প্রথম তফসিলভুক্ত ও অন্যান্য প্রচলিত আইন দ্বারা কার্যত রাষ্টের নির্বাহী বিভাগের প্রধান ব্যক্তির অনুমোদন সাপেক্ষ নীতি নির্ধারণ, ক্রয়-বিক্রয়, নিয়োগ-ছাঁটাই, বেতন-ভাতা সমেত সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ এবং নির্বাহী বিভাগের প্রধান ব্যক্তির সন্তুষ্ঠিসাপেক্ষ অপরাপর নির্বাহী কর্তৃত্বের হুকুম-নির্দেশ পালনকারী পরাশ্রিত-পরজীবী তবে নন ক্যাডার এক অনাভিজাত আমলাগোষ্ঠীর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্তখাত নিয়ন্ত্রণ-পরিচালনার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে বিধায় শ্রমিকগণসহ এ সকল খাতের উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় যুক্ত-জড়িত কাউকে ব্যবস্থাপনায় অংশীদার করা হয়নি হেতু জনগণের নামে সৃজিত ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত খাত কার্যত রাষ্টের মতোই রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বকারী এক ব্যক্তির কর্তৃত্ব মূলে একক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি তূল্য পরিগণিত হয়েছে বিধায় স্বাস্থ্য সম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, উপযুক্ত মজুরী ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি, নিয়োগ-ছাঁটাইতে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের ষ্ট্রাষ্টিবোর্ডে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকরণ সহ উল্লেখিত বিষয়াদিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও শ্রমিকদের যৌথদরকষাকষির জন্য সি.বি.এ কার্যক্রম পরিচালনায় স্বৈরাচারি আয়ুবের আই.আর.ও-১৯৬৯, বাংলাদেশে অসাংবিধানিকভাবে বহাল ও বলবত করা হলেও কার্যত সি.বি.এ কর্মকর্তাদের পি. এফের ষ্ট্রাষ্টিবোর্ডে প্রতিনিধিত্ব করা ব্যতীত অন্য কোন এখতিয়ার-ক্ষমতা না থাকায় প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শ্রমিকগণ রাষ্ট্রিক পুঁজিসহ রাষ্ট্রীয় প্রধান কর্তৃত্বকারী ব্যক্তির হুকুমের দাসে পরিণত হয়েছে হেতু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক নীতিমালার নামে শ্রমিক শ্রেণীর সাথে চরম বেঈমানি-বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বলে নির্বাহী কর্তৃত্বের নীতিহীনতা ও চরম দুর্নীতিতে রাষ্ট্রায়ত্তখাত এখন প্রায় বিলীন ও বিলুপ্ত হয়েছে:

(২) সামাজিক চাহিদার নিরিখে মুনাফাহীন উৎপাদন , লাভহীন বন্টন, দ্রব্যমূল্য ও সেবাখাতের চার্জ নির্ধারণে শ্রমিকশ্রেণী - উৎপাদকগোষ্ঠী ও সেবা প্রদানকারী সহ জনগণের ক্ষমতা-এখতিয়ার ও তদমর্মে উপযুক্ত পন্থা নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করা হয়নি; এবং

(৩) আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা-নীতি প্রণয়ন করা বা না করা বিষয়ক কর্তৃত্ব সুনির্দিষ্ট ও চিহ্নিত নাই বিধায় রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি-বিধান ও নীতি প্রণীত ও বাস্তবায়িত হয়নি বা তেমন হওয়ার সুযোগ উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ও আইন ইত্যাদি দ্বারা রাখা হয়নি বা রাষ্ট্রীক নীতিমালা বিরোধী আইন-নীতি বাতিলকরণে জনগণের কর্তৃত্ব নাই হেতু আওয়ামী লীগ স্বীয় জন্মগত পুঁজিবাদী চরিত্র ও বৈশিষ্ট মতো মুক্তিযুদ্ধ , মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের

সমর্থনকারী জনগণ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি চাতুরালীমুলে প্রবঞ্চণা ও প্রতারণা করেছিল বলেই মুক্তবাজারী বাংলাদেশ এখন পুঁজিওয়ালাদের অবাধ শোষণ-লুণ্ঠনের স্বর্গভূমি ।

অথবা, মুক্তবাজারী পরিস্থিতির চাপে-প্রভাবে খেলা-ধূলা ভুলে বা স্কুল পরিহার করে নগদ টাকার লোভে ৮/১০ বছরের শিশুরাও এখন দস্তরমতো দোকানদার বনছে । যদিও এ কথা সত্যি যে, প্রয়োজন অতিরিক্ত পণ্যে বাজার ভর্তি থাকলেও নিতান্ত চাহিদা মতো খাদ্য বা ভোগ্য পণ্যও ক্রয় করতে পারছে না অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ । দুনিয়ার চিত্রটাও প্রায় অনুরূপই। উল্লেখ্য- চতুর্দিকে থৈ থৈ জল , বাড়ী-ঘর জলে প্লাবিত তবু, পানাহারে বিশুদ্ধ পানি পায় না বলে জলকষ্টে বা জলদূষণে মহামারি ইত্যাদিতে আক্রান্ত-অকালে মৃত্যুবরণ করে থাকে বানভাসী মানুষ। তদ্রুপ, পণ্যের মাত্রাতিরিক্ত প্রাচুর্য ও প্লাবনে পুঁজিবাদ পুন পুন অতি উৎপাদন সংকটে নিমজ্জিত হয় বটে কিন্তু কেবলমাত্র মালিকানার সীমা দ্বারা সকল পণ্য অন্যায়-অন্যায্যভাবে ব্যক্তিবিশেষের এখতিয়ার ও কর্তৃত্বে বন্দী ও গন্ডীবদ্ধ থাকায় পণ্য উৎপাদনকারী শ্রমিকশ্রেণীর সহিত অনুরূপ অনৈতিক, অযৌক্তিক, বৈরী ও নৈরাজ্যিক মালিকানা সম্পর্কের কারণে চাহিদার অতিরিক্ত পণ্যের বিপুল সমারোহ ও আধিক্যর মধ্যে বসবাস করেও প্রয়োজনীয় পণ্য ব্যবহারে খোদ পণ্য উৎপাদনকারী শ্রমজীবী মানুষের অক্ষমতার হেতুবাদে প্রতিবছর বিশ্বে মৃত্যুবরণ করছে লাখ লাখ শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধ এবং দেউলিয়া হয় বহু পুঁজিপতি স্বয়ং। অথচ, অনুরূপ দুর্বিসহ জঘন্য অবস্থার মুক্তবাজারী অর্থনীতির অংশীদার হওয়ার জন্য বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ না করলেও অত্র সংবিধানের উক্তরূপ অসমঞ্জস্যতা-স্ববিরোধীতার সুযোগে মুক্তবাজারী রাজনীতিকদের বিশ্বাসঘাতকতায় দু:খজনকভাবে বাংলাদেশ সদস্য বটে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার, বলেই কার্যত,সমাজতান্ত্রিকতো নয়ই বরং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংবিধান হিসাবে এটি কার্যকর নয়।

দ) ঘোষিত লক্ষ্য অর্জন ও গণঅধিকার সংরক্ষণ ও সুনিশ্চিতকরণে-

(১) রাষ্ট্রিক দায়িত্বে সকল মানুষকে একই মানের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা বিশেষত শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিনা খরচে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানার্জনের সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের বিহীত করা হয়নি ;

(২)প্রজাতন্ত্রের নিকট হতে বেতন-ভাতা গ্রহণকারী বৈ, কৃষি উৎপাদন সহ মুল্য সংযোজন কারী ব্যক্তি ও সমাজিক উপযোগিতায় দায়িত্ব পালনকারী ও সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তির সেবা-কর্ম ও শ্রমকে প্রজাতন্ত্রের কর্ম হিসাবে গণ্য করা হয়নি;

(৩) রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে সকলের জন্য চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের বিহীত করা হয়নি;

(৪) সকলের জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশ বান্ধব বসতি নিশ্চিতকরণে বিহীত করা হয়নি;

(৫) গ্রাম-শহরের প্রভেদ দুরীভূতকরণে জনসমষ্টির পুনর্বিন্যাস এবং সকলের জন্য কর্ম সংস্থান সহ অধিকতর উৎপাদন নিশ্চিত ও সামাজিক চাহিদা পূরণে,ঘর- গৃহস্থালী ও ব্যক্তিগত কৃষি কর্মে মজুরী শ্রমিক নিয়োগ না করা সহ বৃহদায়তন শিল্প স্থাপন ও বিকাশে অনুরূপ শিল্পায়নের সহিত কৃষিকে সংযুক্তকরণ ও তদানুরূপ পর্যায়ে উন্নীতকরণে আধুনিক খামার ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও তদানুরূপ নির্দিষ্ট শর্তে সমবায় ভিত্তিক বিলি-বন্টন বা যৌথ ব্যবস্থাপনার জন্য সকল ভূমি জাতীয় সম্পদ গণ্যে ভূমিসহ কারখানা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সেবাখাত ইত্যাদি বিনা ক্ষতিপূরণে জাতীয়করণ করা হয়নি। জাতীয়করণকৃত রাষ্ট্রায়ত্তখাত নিয়ন্ত্রণ -ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি সহ সংশ্লিষ্ট খাতের উৎপাদক বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর নির্বাচিত এবং প্রত্যাহারযোগ্য প্রতিনিধি সমন্বয়ে পরিচালন বোর্ড গঠন বা তদানুরূপ বোর্ড গঠন করার নির্দেশনা নাই;

(৬) সকল ক্ষমতা মালিক গণ্যে রাষ্ট্রীয় সকল বিষয় জনগণকে যথাসময়ে যথাযথভাবে অবহিতকরণ সহ রাষ্ট্রীয় নীতিগত সকল বিষয়ে প্রত্যেকের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধি বিধান করা হয়নি ;
(৭) যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র বিরোধী মনোভংগি প্রসার ও বিকাশে উপযুক্ত সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ সুনিশ্চিতকরণে যথাপোযুক্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা করা হয়নি ;
(৮) পুঁজি ও পুঁজিবাদ বিরোধী বৈশ্বিক লড়াই জোরদারকরণে এবং পুঁজিমুক্ত বিশ্বায়নে শ্রমিকশ্রেণীর বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি স্থাপনে কার্যকর ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণের সুস্পষ্ট বিধি-বিধান নাই বিধায় অত্র সংবিধানের ২য় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রিক লক্ষ্য পূরণ এবং ৩য় ভাগে বর্ণিত জনগণের অধিকার বাস্তবায়ন ও কার্যকরণে কার্যতই সম্ভব নয় হেতু অত্র সংবিধান একটি প্রহসনমূলক দলিল হিসাবে চিহ্নিত না হওয়ার কোন উপযুক্ত কারণ নাই
বলেই এটি, এমনকি গণতান্ত্রিক সংবিধানও নয় ।

ধ) অনুচ্ছেদ -১০ দ্বারা বিবৃত সাম্যবাদী সমাজলাভে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে মর্মে নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। অথচ, খোদ রাষ্ট্র যেমন সাম্যবাদের প্রধান প্রতিবন্ধক তেমন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় চূড়ান্ত করণীয় সম্পর্কে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলোপ সাধন সম্পন্নকরণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের করণীয় সম্পর্কে সাংবিধানিক পন্থা উল্লেখিত নাই। সাম্যবাদ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আছে এমন যে কেউ জানেন যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রেখে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তদপুরি সাম্যবাদ একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা বলে রাষ্ট্রীয় বেষ্টনীভুক্ত সীমানায় সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অতিতে ভূমন্ডলের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাজা-বাদশা বা নৃপতি কর্তৃক দখল-বেদল হতো বটে তবে, পুঁজিবাদ পূর্ব সকল রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বমূলক এমনকি একই ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদির কোনটিই আন্তর্জাতিক চরিত্র বা বৈশ্বিক রূপ লাভ করেনি বা তেমনটা রূপ লাভ করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র স্থানিকতা ও জাতীয়তার গন্ডির মধ্যে সীমিত থেকে গড়ে উঠলেও এবং স্বীয় সীমানাভুক্ত ভূমির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব সুনিশ্চিতকরণের নিমিত্তে " স্বাধীনতা- সার্বভৌমত্ব" রূপ রাজনৈতিক শব্দের প্রচলন করলেও পুঁজির চরিত্রদোষে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নিজেই অপরাপর রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ করে সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্র হিসাবে আভির্ভূত হয়েছিল। কারণ- পুঁজিবাদ স্বীয় পুঁজির বাজার নিশ্চিতকরণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিস্তার সাধনে বিশ্বকে নিজ আদলে গড়ে তোলার চেষ্টায় রত থাকতে বাধ্য না হয়ে পুঁজির সঞ্চয়ন-সঞ্চালন সাধনে সক্ষম নয় হেতু পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম নীতি হিসাবে উপনিবেশ দখল-বিস্তার করতে থাকে পুঁজিপতিশ্রেণী । পুঁজির অনুরূপ অন্ধ স্বার্থ চরিতার্থকরণে ১৮৪০ সালের আফিম যুদ্ধে উপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃক চীনকে পরাভূতকরণের মাধ্যমে পুঁজি তামাম জগতকে গ্রাস-দখল করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে- পুঁজি নিজেই অর্জন করেছিল এক সার্বজনীন বৈশ্বিক চরিত্র।
একইভাবে, পুঁজির সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থাটাও দেশ-জাতির গন্ডীমুক্ত ও বিশ্বজনীন বলেই কমিউনিষ্ট ইস্তাহারে মার্কস-এ্যাংগেলস লিখেছেন-" মেহনতী মানুষের কোন দেশ নাই। " উল্লেখ্য- প্যারী কমিউনের শ্রমমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিল একজন জার্মান শ্রমিক এবং প্যারীসের প্রতিরক্ষাকারীদের নেতৃত্ব পেয়েছিল পোলান্ডের সন্তান। অত:পর, পুঁজিবাদ বিনাশী সমাজতন্ত্রের লড়াই কেবলমাত্র স্থানীয় বা জাতিয় বিষয় নয় বলেই সমাজতন্ত্র কতিপয় বীরের বীরত্বের ফলাফল নয়, নয় ব্যক্তি বিশেষের সদ্দিচ্ছা অথবা কতিপয় ব্যক্তির অনুকুল পরিস্থিতির সুযোগে পত্তনযোগ্য কোন ব্যবস্থা বিশেষ বরং, সমাজতন্ত্র -পুঁজি ও শ্রম বিরোধের অনিবার্য পরিণতি বলেই বিশ্বময় পুঁজির ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ তথা ব্যক্তিমালিকানার রক্ষক-সহায়ক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংরক্ষক বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ সহ তদ্রুপ সকল প্রতিষ্ঠানের বিলোপ বৈ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

অনুরূপ বিষয়ে - মার্চ,১৮৫০ সালে কমিউনিষ্ট লীগের কাছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতিতে মার্কস-এ্যাংগেলস লিখেন-" যতদিন কমবেশী সকল সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি তাদের আধিপত্যের আসন থেকে অপসারিত হচ্ছে; যতদিন না প্রলেতারীয়েত রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করছে এবং শুধু একটি দেশে নয়, পৃথিবীর সব কয়টি প্রধান দেশে প্রলেতারীয় সংঘ এতটা এগিয়ে যাচ্ছে যে, এই সব দেশের পলেতারিয়দের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটবে আর অন্ত:ত প্রধানতম উৎপাদন শক্তিসমূহ প্রলেতারিয়দের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে। আমাদের পক্ষে প্রশ্নটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অদলবদল নয়,ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংস, শ্রেণীবিরোধকে মোলায়েম করা নয়,-শ্রেণীসমূহেরই বিলোপ, বর্তমান সমাজের উন্নতি সাধন নয় -নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠা ।"

সুতরাং- সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কর্তাগণের সূত্রায়ন-তত্ত্ব ও ব্যাখ্যামতো শ্রশোষণহীন-শ্রেণীহীন , রাষ্ট্রীহীন, দারিদ্রহীন ও শাশ্বত শান্তির বৈশ্বিক ব্যবস্থাই সাম্যবাদ বলেই আলোচ্য সংবিধানমূলে গঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রও বিলুপ্ত ও বিলীন হবে রূপ সুস্পষ্ট নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে অত্র সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকবে। অন্যথায়-রাষ্ট্রের নি:শেষ নয় বরং চিরস্থায়ীকরণ নিশ্চিত করার প্রয়াশ হিসাবে তা গণ্য হয়। অত:পর, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শেষ পরিণতিহীন অত্র সংবিধান রাষ্ট্র বিলুপ্তির অনুচ্ছেদহীন লেনিনদের সংবিধানের মতোই সমাজতান্ত্রিক সংবিধান নয়। উপরন্ত - সমাজতন্ত্র বিষয়ে প্রতারক লেনিনদের মতোই ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ছড়ানো সমেত সমাজতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠানোর দরুভিসন্ধিতে তদানুরূপ দুস্কর্মাদি যথারীতি করা হয়েছে।

ন) সংবিধানের আন্ত:বিরোধ,ত্রুটি-বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা, পারস্পারিক সাংঘর্ষিকতা ও বৈরীতা ইত্যাদি নিরসন ও দুরীকরণে অত্র সংবিধান, পরিমার্জন-সংযোজন ও সংশোধনযোগ্য বিধায় সে মর্মে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতায় সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন তয় " সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধিত বা রহিত " করার বিধান লিখিত আছে- ১০ম ভাগ, অনুচ্ছেদ-১৪২ বিধায় **কেবলমাত্র অত্র সর্বিধানের আওতায় গঠিত সংসদ এর আইন বৈ অন্য কোন কর্তত্বের আদেশ, আইন,ফরমান ইত্যাদির সংযোজনী বা তদমর্মে কোন সংশোধনী উল্লেখিত বিধান মতো অত্র সংবিধানের সংশোধনী হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয়। অথবা, "সামরিক আইন " বা সামরিক আইনের আওতায় বা "সামরিক আইন আদেশ" বলে "ফরমান" জারী করার কোন বিধান অত্র সর্বিধানে নাই বা সামরিক আইন জারী করার মাধ্যমে অত্র সংবিধান স্থগিত করার কোন বিধানও অত্র সংবিধানে নাই । অথবা ,সামরিক আইনবলে অত্র সংবিধানকে অকার্যকর করিয়া "সামরিক আইন", " সামরিক আইন আদেশ", "ফরমান" ইত্যাদি জারী করার আদেশ বা অনুরূপ আদেশ বলে অত্র সংবিধানের " রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতি" সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ সহ যেকোন অনুচ্ছেদ বিলোপকরণ, পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপন ইত্যাদি যে, অসার্বিধানিক হেতু অবৈধ, তা স্বয়ং জারীকারক কর্তৃক স্বীকারোক্তিপুর্বক তৎপ্রতিবিধানে অনুরূপ স্বীকারোক্তিযুক্ত বা তদ্রুপ অবৈধ ফরমান ইত্যাদিকে "বৈধকরণের" প্রয়োজনীয়তায় এবং তদ্রুপ হেতুবাদে অত্র সর্বিধানের কোনরূপ সংশোধনী গ্রহণ বা কার্যকর করা যাবে মর্মে অত্র সর্বিধানের এতদসংক্রান্ত অনুচ্ছেদ-১৪২ এ বর্ণিত নাই হেতু অনুরূপ অসার্বিধানিক -সামরিক আইন আদেশ,ফরমান ইত্যাদিকে অত্র সর্বিধানের সংশোধনী হিসাবে গণ্য করার অবকাশ নাই।**

অথচ, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির অজুহাত বা দুরভিসন্ধিমূলে জারীকৃত সামরিক শাসন ইত্যাদিকে বৈধকরণে অত্র সংবিধানে অস্বীকৃত তথাকথিত 'ডক্ট্রিণ অব ন্যাসেসিটি'র দোহাই দিতে পারদর্শী বা গোলামী মানসিকতায় পুষ্ট ও বিদেশী শাসনে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ- যারা স্বার্থান্ধতা-অজ্ঞতা-ভ্রান্তি বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গণপ্রজাতন্ত্রের সংবিধানকে " শাসনতন্ত্র " হিসাবে আখ্যায়িত করতে বা বলতে আহ্লাদিত ও সমধিক পছন্দ করেন, তাঁরা বা ঐরূপ

মানবিক মান-মর্যাদাহীন মুৎসুদ্দিদের প্রভু - জবর দখলকারী উপনিবেশিক ব্রিটিশ সৃষ্ট- "১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট যেরূপ প্রজোয্য" মর্মে হাল আমলের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলভুক্ত " করিপয় ফরমান বৈধকরণ ইত্যাদি" অনুচ্ছেদ- " ৩ক।(১) ১৯৭৫ সালের ২০ শে আগষ্ট এবং ৮ই নভেম্বরের ফরমানসমূহ ও ১৯৭৬ সালের ২৯ শে নভেম্বরের তৃতীয় ফরমান, এবং উহাদের সংশোধনকারী বা সম্পূরক অন্যান্য সকল ফরমান ও আদেশ , অত:পর, যাহা এই অনুচ্ছেদ সমষ্টিগতভাবে উক্ত ফরমানসমূহ বলিয়া উল্লেখিত, এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে উক্ত ফরমানসহ বাতিল ও সামরিক আইন প্রত্যাহার করিবার তারিখে (উভয়দিনসহ) মধ্যে,অত:পর, এই অনুচ্ছেদে উক্ত সময় বলিয়া উল্লেখিত , প্রণীত সকল সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ এবং অন্যান্য আইন বৈধরূপে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে, অথবা উহাদের নিকট, কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।" বলিয়া উক্ত অনুচ্ছেদে বিষয়াদিকে অর্থাৎ উল্লেখিত রূপ ফরমান ইত্যাদি য'দ্বারা অত্র প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের সকল ক্ষমতার মালিক প্রজাগণকে এবং সংবিধানমূলে গঠিত সকল রাষ্ট্রিক অংগ-প্রতংগ বিশেষত বিচার বিভাগসহ আইন-আদালতকে কেবলমাত্র এক সশস্ত্র ব্যক্তির হুকুমের অধীন বা অধীনস্থকরণের মাধ্যমে অকার্যকর করা হয়েছে সেই সকল ফরমানকে অত্র সংবিধানের অংশ গণ্যে বা তদসমর্থনে ১৮৯৭ সালের জেনালে ক্লজেজ এ্যাক্ট যেরূপ প্রযোজ্য উল্লেখিত ক্ষেত্রে সেই রূপ প্রযোজ্য ধরনের বক্তব্য বা ফর্মুলায় অনুচ্ছেদ- ১৫০ এর ৩ক। (৮) দ্বারা " সামরিক আইন, প্রবিধান ও সামরিক আইন আদেশসমূহ , সকলই সংসদের আইন ছিল" বলিয়া অত্র অনুচ্ছেদের দ্বারা অত্র সংবিধান সংশোধন অথবা চতুর্থ তফসিলভুক্ত " ফরমানসমূহ, ইত্যাদির অনুমোদন ও সমর্থন" অনুচ্ছেদ-১৮। দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট হতে ১৯৭৯ সালের ৯ ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে "প্রণীত সকল ফরমান , ফরমান আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন, এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন ধরনের ফরমানের দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন-সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন ও বিলোপসাধন করা হইয়াছে, তাহা " এবং অনরূপ " ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চের ফরমান, ইত্যাদির অনুমোদন ও সমর্থন" নামীয় অনুচ্ছেদ-"১৯(১) ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চেও ফরমান, অত:পর, যাহা এই অনুচ্ছেদে উক্ত ফরমান বলিয়া উল্লেখিত, এবং ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ ও সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬(১৯৮৬ সালের ১ নং আইন) ----উল্লেখিত , প্রণীত অন্যান্য সকল ফরমান, ফরমান আদেশ , প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, সামরিক আইন নির্দেশ, অধ্যাদেশ এবং অন্যান্য আইন এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হইল এবং বৈধভাবে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল , এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।" বলিয়া উক্ত অনুচ্ছেদ-১৯।(৯) দ্বারা ১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট যে রূপ প্রযোজ্য সেরূপ প্রযোজ্য বর্ণনা করিয়া যথারীতি পূর্বোল্লেখিত অনুচ্ছেদ-৩ক।(৮) এর মতোই " সকলই সংসদের আইন ছিল।" অর্থাৎ অত্র সংবিধানের উল্লেখিত অসাংবিধানিক সংশোধনী সমূহকে অত্র সংবিধানেরই অংশ " জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট -১৮৯৭" মূলে সামরিক অধিপতি বিশেষ অত্র অগণতান্ত্রিক সংবিধান মূলেই খোদ সংবিধানকে স্থগিত করে কার্যত বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে ব্যক্তি বিশেষের হুকুম তামিলকারী এক জবরদস্ত দমন-পীড়নমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারছে বা তদানুরূপ কর্মাদিতে সক্ষম ও সফল হয়েছে বলেই অত্র সংবিধান মূলে কার্যত একটি কার্যকর রাষ্ট্রও গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি হেতু উক্ত সংবিধান এমনকি একটি স্বাধীন-সার্বভৌমও বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের উপযুক্ত সংবিধানও নয় ।

তবে, বাংলাদেশ ও চীন এই উভয় রাষ্ট্রের সংবিধান এবং সাংবিধানিক ইতিহাস অন্তত সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে, স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যকার চমকপ্রদ

রাজনৈতিক স্লোগানের আড়ালে বুজোয়াশ্রেণী চালাকি-জালিয়াতি ও জুচ্চোরি দ্বারা যতোই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত এবং বিভ্রান্ত করুক বা তদমর্মে যতো চেষ্টা-অপচেষ্টাই করুক না কেন বা অনুরূপ অপচেষ্টার অংশ হিসাবে যতোই নতুন নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলুক না কেন কার্যত মরণাপন্ন-সংকটাপন্ন পুঁজিবাদ মৃতবৎ রাষ্ট্রের মৃত্যু নিশ্চিত করা বৈ রাষ্ট্রের নবজীবন দান করতে সক্ষম হয়নি। উপরন্ত মহামন্দায় আক্রান্ত পুঁজিবাদের বিনাশ ও মহাদুর্যোগে নিপতিত মৃতবৎ রাষ্ট্রের বিলোপ সাধনের নৈমত্তিক কার্যাদি এখনো অন্য কেউ নয় বরং খোদ পুঁজিবাদ স্বয়ং সম্পাদন করছে।

অত:পর, পুঁজিবাদের পতন ও মরণদশা সমেত অন্তিম কালে রাষ্ট্রের বিলোপ প্রক্রিয়া সহ পুঁজিবাদের অনুরূপ বজ্জাতি-প্রতারণা, জালিয়াতি-জুচ্চোরি যখনই দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী বুঝতে পারবে তখনই শ্রমিকশ্রেণী তদার্থে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান অনুশীলন করবে অর্থাৎ বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণী দেশ-জাতির ভুয়া -মেকি পরিচয় সত্যি সত্যি পরিত্যাগ করে কেবলই মূল্য উৎপন্নকারী হিসাবে নিজস্ব পরিচয় নিশ্চিত করবে এবং কেবলই অনুরূপ পরিচয়ের সকলেই সকলের মুক্তির স্বার্থে বৈশ্বিক ঐক্য-সংহতি ও সংগঠন গড়ে তুলবে এবং অনুরূপ ঐক্য-সংহতি ও সংগঠনের কার্যক্রম শক্তিশালী করার মাধ্যমে অশ্রমিক অথচ শ্রেণী বিনাশী বা শ্রেণী মুক্তি প্রত্যাশী অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষভুক্ত সকলকেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির লক্ষ্যে গঠিত বিশ্ব সমিতিভুক্ত করবে এবং দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী যতো দ্রুত এমন ঐক্য-সংহতি ও সংগঠন গড়ে তুলবে ততোদ্রুত পুঁজিবাদ যেমন কবরস্ত হবে তেমন রাষ্ট্র ইতিহাসের যাদুঘরে ঠাঁই নিবে ।

সুতরাং- দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী অনুরূপ বৈশ্বিক ঐক্য ও সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সমেত পুঁজিবাদী সমাজকে রিপ্লেস করবেই। আর তখনই কেবলমাত্র তখনই কার্যকর হবে প্রকৃত গণতন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।

অত:পর, সমাজতন্ত্রের নামে লেনিন রাশিয়ায় যা করেছে তা যেমন সমাজতন্ত্র নয়, তেমন লেনিনবাদী মাওসেতুং চীনে সমাজতন্ত্রের নামে যে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও তা পুন:পুন ভাংগা ও গড়ার মাধ্যমে যা যা করেছে তার পরিণতিতে-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান শর্ত ব্যক্তিমালিকানা ও রাষ্ট বিলীন ও বিলোপের পরিবর্তে -মৃত্যুপথযাত্রী রাষ্ট্রকে রক্ষার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ও ত ব্যাক্তিমালিকানাকে নাগরিকগণের " অলংঘনীয়" অধিকার হিসাবে নিশ্চিতকরণের অপচেষ্টা সহ চীনকে পুঁজির স্বর্গভূমিতে পরিণত করায় চীনের শ্রমিকশ্রেণীর দুরাবস্থা শেখ মুজিব সহ প্রথাগত বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ অপেক্ষা আরো জঘন্য। কাজেই, উপরোক্ত তথ্য ও বক্তব্য দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের সংবিধান না-সমাজতান্ত্রিক , না-গণতান্ত্রিক, মাওয়ের চীন আরো জঘন্য।